যুগ জিজ্ঞাসার জবাব

১ম খণ্ড

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

যুগ জিজ্ঞাসার জবাব

১ম খণ্ড
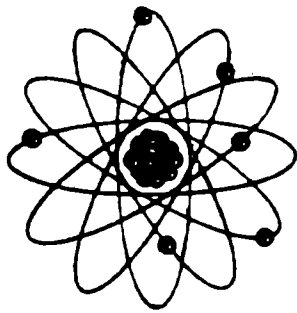
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

অনুবাদ

আবদুস শহীদ নাসিম

শতাব্দী প্রকাশনী

যুগ জিজ্ঞাসার জবাব ১ম খণ্ড

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

অনুবাদ

আবদুস শহীদ নাসিম

শতাব্দী প্রকাশনী

যুগ জিজ্ঞাসার জবাব -১ম খণ্ড
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

অনুবাদ
আবদুস শহীদ নাসিম

শ. প্র. : ৬৪
ISBN : 978-984-645-069-9

প্রকাশক
শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস্ রেলগেইট, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৮৩৩১৮০৩, ০১৭৫৩৪২২২৯৬
ই-মেইল : shotabdipro@yahoo.com.

প্রকাশকাল
প্রথম মুদ্রণ : ডিসেম্বর ১৯৯০ ঈসায়ী
তৃতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ঈসায়ী

মুদ্রণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস

মূল্য : ১২০.০০ টাকা মাত্র

Jug Jiggashar Jabab, By Seyyed Abul A'la Maudoodi, Published by Shotabdi Prokashoni, 491/1 Moghbazar, Dhaka. Phone : 8331803, 01753422296, E-mail: shotabdipro@yahoo.com. First Edition : December 1990,3rd Print : February 2014.

Price Tk. 120.00 Only.

গ্রন্থটি সম্পর্কে দু'টি জরুরী কথা

গ্রন্থটি সম্পর্কে ক'টি কথা বলে নেয়া জরুরী মনে করছি। মাওলানা মওদূদী এবং তাঁর চিন্তাধারাকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই। তাঁর গ্রন্থাবলী বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়ে জাতিসমূহের নিকট পৌঁছেছে এবং সেগুলো তাদের মধ্যে মানসিক ও সামাজিক বিপ্লব সৃষ্টি করছে। তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতাসমূহ এমনকি তাঁর লিখিত চিঠিপত্র পর্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়ে দেশে দেশে পৌঁছেছে। তাঁর সংগীসাথীরা অডিও ক্যাসেট এবং পত্রপত্রিকা থেকেও তাঁর বাণী বক্তব্যসমূহ সংগ্রহ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করছেন। যতোই দিন যাচ্ছে, ততোই বিশ্বের মুসলমানদের নিকট তাঁর অবদান বড় হয়ে ধরা পড়ছে। তাঁর প্রতিটি বাণী ও বক্তব্যই যে কুরআন সুন্নাহ থেকে নিংড়ানো নির্যাস এবং সেগুলো যে মুসলমানদের ব্যক্তি ও সমাজ গঠণে আর আল্লাহর কালেমাকে বিজয়ী করার কাজে খুবই গরুত্বপূর্ণ, তা আজ সূর্যালোকের মতোই সুস্পষ্ট।

তাঁর চিন্তাধারা যেনো একটি সুগ্রথিত কড়ির মালা, আর বর্তমান গ্রন্থটি সে মালারই একটি কড়ি। এটি তাঁর নিজ হাতে লেখা কোনো গ্রন্থ নয়। বরঞ্চ বিভিন্ন সময় প্রদত্ত দারসে কুরআন, দারসে হাদীস এবং বক্তৃতা ও বক্তব্যের পর উপস্থিত শ্রোতাদের পক্ষ থেকে তাঁকে যেসব প্রশ্ন করা হয়েছিল এবং সেসব প্রশ্নের তিনি যে জবাব প্রদান করেছিলেন, সেসব প্রশ্নোত্তরেরই সংকলন। পত্রিকার রিপোর্টারগণ তাদের কলম এবং টেপরেকর্ডারের সাহায্যে এগুলোকে ধরে রাখতেন এবং পত্রিকায় প্রকাশ করতেন। বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলনের সহায়ক দু'টি সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনের বিশেষ কলামে এ প্রশ্নোত্তরগুলো প্রকাশিত হতো। এর একটি হলো সাপ্তাহিক 'এশিয়া' এবং অপরটি 'আইন'।

মধুমাছি যেমন ফুল থেকে মধু আহরণ করে, তেমনি পত্রিকার পাতায় পাতায় চোখ বসিয়ে বসিয়ে এই অনুপম প্রশ্নোত্তরগুলো সংগ্রহ করেছেন জনাব আখতার হিজাযী। এই বিরাট কাজটি যে তাঁকে অত্যন্ত খাঁটুনি খেটে এবং

ধৈর্যসহকারে করতে হয়েছে, তা আর বলারই অপেক্ষা রাখেনা। প্রশ্নোত্তরগুলো সংগৃহীত হবার পর মাওলানার দীর্ঘদিনের সাথী জনাব আসআদ গিলানী অত্যন্ত যত্নসহকারে সেগুলো পর্যালোচনা ও সম্পাদনা করে দেন। তারপরও এতোটুকু কথা থেকেই যায় যে, এগুলো সরাসরি মাওলানার নিজের হাতে লিপিবদ্ধ হয়নি এবং তাঁর জীবদ্দশায় সংকলিত হয়নি। তবে গ্রন্থে মাওলানার মুখনিসৃত ভাষা হুবহু রক্ষিত না হলেও এতে তাঁর বক্তব্য বিষয় পাঠকদের সামনে এসেছে। আর এখন যেহেতু গ্রন্থটির অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে, তখন একথাতো সকলের কাছেই পরিষ্কার যে, অনুবাদে গ্রন্থকারের বক্তব্যই প্রকাশ পায়, ভাষা নয়।

সর্বশেষে বলতে চাই, এগ্রন্থে পাঠকগণ এমন অনেক প্রশ্নের সহজ সুন্দর ও বাস্তব ধর্মী জবাব পেয়ে যাবেন যেসব প্রশ্নের জবাব অনেক বড় বড় গ্রন্থাবলী অধ্যায়ন করেও বের করা কষ্টকর হতো। মাওলানা মওদূদীর বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, প্রশ্নকর্তারা তাঁর নিকট থেকে যে কোনো প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব পেয়ে যেতেন। তাঁর জবাবে তাঁদের মন নিশ্চিন্ত হতো।

আমরা আশাকরি এ গ্রন্থের মাধ্যমে পাঠকগণ সহজ সুন্দরভাবে ইসলামের যুগোপযোগিতা এবং বাস্তবধর্মীতা বুঝতে সক্ষম হবেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে এ গ্রন্থ থেকে উপকৃত হবার তৌফিক দিন। আমীন

আবদুস শহীদ নাসিম
৫ আগস্ট ১৯৯০

বিষয় # *সূচিপত্র* *পৃষ্ঠা*

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা
১৪০.	ওয়াজিব সদাকা ও নফল সদাকা	১০৫
১৪১.	অনুপযুক্ত প্রার্থীকে দান করা	১০৬
১৪২.	ভুল কাজ দেখলে মনে কষ্ট লাগা	১০৬
১৪৩.	দুই এবং তিন তালাকের বিধান	১০৭
১৪৪.	রাগের মাথায় স্ত্রীকে মা বলা	১০৮
১৪৫.	নবীদের নিষ্পাপ হবার তাৎপর্য	১০৮
১৪৬.	রোযার কষ্ট ও বিশেষ দিনের রোযা	১১১
১৪৭.	মান্নতের রোযা	১১২
১৪৮.	মানুষের ফিতরাত	১১২
১৪৯.	মানুষ এবং পার্থিব জীবনের অবিরাম চেষ্টা	১১৩
১৫০.	পানাহারের বস্তুতে মাছি বসলে করণীয়	১১৪
১৫১.	জিব্রাঈলের রিপোর্ট	১১৫
১৫২.	আল্লাহ এবং দৈহিক সত্তা	১১৬
১৫৩.	পৃথিবীর আগুন এবং জাহান্নামের আগুনের পার্থক্য	১১৮
১৫৪.	দাসী প্রসংগ	১১৮
১৫৫.	দাসীর অর্থ	১২০
১৫৬.	মানুষ এবং সুস্থ প্রকৃতি	১২১
১৫৭.	যালিম এবং অবকাশ	১২৩
১৫৮.	নামাযে হাত নাড়াচাড়া করা	১২৩
১৫৯.	জিহাদ কি আত্মরক্ষামূলক হয়ে থাকে না আগ্রাসী	১২৪
১৬০.	ইমামের পিছে সূরা ফাতিহা পড়া	১২৫
১৬১.	এটা ইসলামের ব্যর্থতা নয়	১২৬
১৬২.	ইমাম ও দাড়ি	১২৭
১৬৩.	দাড়ি এবং সামরিক বাহিনীর কমিশন	১২৭
১৬৪.	জামায়াত কর্মীদের দাড়ি	১২৮
১৬৫.	দাড়ির দৈর্ঘ্য বিষয়ক বিতর্ক এবং দীনকে বাঁচিয়ে রাখা	১২৯
১৬৬.	তাকলীগ এবং ফিকাহ্র প্রয়োজনীয়তা	১৩১
১৬৭.	দাতা ও দস্তগীর	১৩৩
১৬৮.	সিনেমা এবং ব্যাংকের চাকুরী	১৩৩

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা
২৫৬.	লোহার আংটি এবং নামায	১৮৫
২৫৭.	দোযখ অস্থায়ী না স্থায়ী	১৮৫
২৫৮.	রাসূলের জানাযা পড়ানো এবং ক্ষমা	১৮৬
২৫৯.	জানাযা এবং ক্ষমা	১৮৬
২৬০.	কুরআন ও শপথ	১৮৬
২৬১.	গায়রে মুহাররমের কফিন	১৮৭
২৬২.	নামায এবং কবর	১৮৭
২৬৩.	মে'রাজ এবং জাহান্নাম	১৮৭
২৬৪.	কুরআন হাদীসের সাথে বিদ্রুপ	১৮৮
২৬৫.	শিশুদের জান্নাত	১৮৮
২৬৬.	পৃথিবীর নেক্কার নারী এবং হুর	১৮৮
২৬৭.	জান্নাত এবং বংশবৃদ্ধি	১৮৯
২৬৮.	পাকা কবরের অসীয়ত	১৮৯
২৬৯.	কবরে লিপি লাগানো	১৮৯
২৭০.	দাফনের পর চল্লিশ কদম	১৯০
২৭১.	তাফসীর সংক্রান্ত একটি অভিযোগের জবাব	১৯০
২৭২.	ভালমন্দের শক্তি	১৯৩
২৭৩.	শয়তানের প্রভাব	১৯৪
২৭৪.	রোগের পুরস্কার	১৯৪
২৭৫.	ইমাম মালিকের মুয়াত্তা	১৯৪
২৭৬.	তাকদীর	১৯৪
২৭৭.	আল্লাহর সুন্নাত	১৯৫
২৭৮.	ভালমন্দের প্রবণতা	১৯৬
২৭৯.	মানুষের পরীক্ষা	১৯৮
২৮০.	ক্বলবে সলীম	১৯৯

দারসে কুরআন ও
দারসে হাদীস প্রভৃতি বৈঠকের
প্রশ্নোত্তর

ফর্মা-২

আল্লাহর দীন এবং মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ আমার নিকট যে কোনো বস্তু এবং যে কোনো সম্পর্কের চাইতে অধিক মূল্যবান। আমি যখন দেখি, কোনো ব্যক্তি জেনে বা না জেনে এর ক্ষতি সাধন করছে, তাকে বাধা দেয়া আমার জন্যে ফরয মনে করি। চাই সে আমার নিকটাত্মীয় হোক, বন্ধু হোক, শিক্ষক হোক কিংবা হোক জাতির কোনো বড় নেতা। — মওলানা মওদূদী

১. ইসলামী বিপ্লব ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতি

প্রশ্নঃ "বর্তমানে আমাদের দেশে গণতন্ত্রের নামে সকল গণতান্ত্রিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানকে দাবিয়ে রাখা হচ্ছে এবং গলা টিপে হত্যা করা হচ্ছে। নাগরিক স্বাধীনতা কেড়ে নেয়া হয়েছে। মৌলিক অধিকার পদদলিত করা হয়েছে। এমতাবস্থায় জামায়াতে ইসলামী শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক পন্থায় কি করে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে? এ মহান উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে কি ভিন্ন কোনো পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে না?"

জবাবঃ আপনি যে পরিবেশের কথা উল্লেখ করেছেন, তা দেখে অনেকের মনেই এসংশয় দেখা দিয়েছে যে, গণতান্ত্রিক পন্থায় দেশে কোনো পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে কিনা? এমতাবস্থায় অনেকে ভাবতে শুরু করেছেন, অগণতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। নিজেদের অজ্ঞতা ও স্বার্থপরতার কারণে আমাদের শাসকরাই জনগণকে এভাবে ভাবতে বাধ্য করেছে। কিন্তু গোটা পরিবেশের এ জটিলতাকে সামনে রেখেও আমরা আমাদের এ মতের উপরই অটল যে, আমরা যে ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে ময়দানে নেমেছি, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোনো পন্থায় তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা। অন্যকোনো পন্থায় বিপ্লব সাধিত হলেও তা স্থায়ী হতে পারে না, টিকে থাকতে পারেনা।

এবিষয়টি ভালভাবে বুঝার জন্যে গণতান্ত্রিক পন্থা বলতে কি বুঝায়, সে জিনিসটাই প্রথমে হৃদয়ংগম করা প্রয়োজন। অগণতান্ত্রিক পন্থার প্রতিকূলে যখন পরিভাষা হিসেবে 'গণতান্ত্রিক পন্থা' ব্যবহার করা হয়, তখন এর অর্থ এই হয় যে, মানুষের জীবন ব্যবস্থার যে পরিবর্তনই আনতে হবে এবং তদস্থলে যে ব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠা উদ্দেশ্য হবে,তা জোর জবরদস্তি করে জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়া যাবেনা। বরঞ্চ সর্বসাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে সন্তুষ্ট করে এর স্বপক্ষে আনতে হবে এবং তাদেরই সক্রীয় সহযোগিতায় অভিপ্রেত জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। জনগণকে বুঝিয়ে স্বপক্ষে আনার পর ভ্রান্ত জীবনব্যবস্থার পরিবর্তে সত্য জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে শুধুমাত্র নির্বাচনের উপর নির্ভর করা জরুরী নয়। দেশে যদি অবাধ ও ইনসাফ ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতি বর্তমান থাকে এবং তা

যদি যথাযথভাবে জগণের মতামত প্রতিফলিত করার জন্যে যথেষ্ট হয়, তবে তার চাইতে উত্তম কিছু হতে পারেনা। কিন্তু যেখানে জনগণের মতামত থাকা সত্ত্বেও নির্বাচনের মাধ্যমে পরিবর্তন আনা অসম্ভব, সেখানে একনায়কদের তাড়িয়ে জনগণের রায় প্রতিষ্ঠার জন্যে ভিন্ন পন্থাও অবলম্বন করা যেতে পারে। আর সে অবস্থায় ভিন্ন পন্থা কার্যকরও হয়ে থাকে। যদি সর্ব শ্রেণীর অধিকাংশ মানুষ এব্যাপারে একমত হয় যে, একনায়কদের মনগড়া ব্যবস্থা কোনো অবস্থাতেই চলতে দেয়া যায়না এবং তদস্থলে সত্য জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তারা সাগ্রহে ও সন্তুষ্টচিত্তে একমত হয়, অভিপ্রেত জীবনব্যবস্থার স্বপক্ষে জনমত যখন এতোটা ব্যাপকতা ও দুর্নিবার রূপ লাভ করে, তখন গণ আন্দোলনের মাধ্যমে অনভিপ্রেত ব্যবস্থাকে উৎখাত করা কোনো ক্রমেই অগণতান্ত্রিক নয়। বরঞ্চ এমতাবস্থায় সেই অনভিপ্রেত ব্যবস্থা কায়েম থাকাটাই অগণতান্ত্রিক।

এ তাৎপর্য ব্যাখ্যার পর একথা বুঝতে কোনো অসুবিধা থাকার কথা নয় যে, ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে গণতান্ত্রিক পন্থার প্রতি কেন আমরা এতোটা গুরুত্বারোপ করি। ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ব্যবস্থা জোর জবরদস্তি করে জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয়া যেতে পারে। যেমনঃ কমিউনিজম। আসলে এ মতাদর্শের প্রতিষ্ঠা জোর জবরদস্তি ছাড়া সম্ভবই নয়। এর নেতারা নিজেরাই ঘোষণা দিয়ে বলেঃ বন্দুকের নল দিয়ে বিপ্লব এসে থাকে।' সাম্রাজ্যবাদী, পুঁজিবাদী, ফ্যাসীবাদী ইত্যাদি ব্যবস্থাও জনমত লাভের মুখাপেক্ষী নয়। জনমতের মুকাবিলা করে এবং জনমতকে দাবিয়েই এগুলো ক্ষমতারোহণ করে।

কিন্তু ইসলাম এধরনের জীবন ব্যবস্থা নয়। ইসলাম সর্বপ্রথম মানুষের অন্তরকে ঈমানের আলোতে উদ্ভাসিত করা জরুরী মনে করে। কারণ সত্যিকার ঈমান ছাড়া কেউই নিষ্ঠার সংগে ইসলামের পথে চলতে পারেনা। অতঃপর জনগণের মধ্যে যথাসাধ্য তার নীতিমালা ও বাস্তবতার যথার্থ উপলব্ধি পয়দা করা জরুরী মনে করে। কারণ এ পন্থা ছাড়া ইসলামের নীতিমালা ও বিধিবিধান চালু ও কার্যকর করা সম্ভবপর নয়। তাছাড়া ইসলাম বিশেষ ও নির্বিশেষ সকলের মানসিকতা, ধ্যানধারণা এবং নৈতিক চরিত্র তার প্রকৃতি অনুযায়ী গড়ে তোলার দাবী করে। কারণ এরূপ না হলে ইসলামের মহান নীতি ও বিধিমালা তার অন্তর্গত ভাবধারা অনুযায়ী কার্যকর হতে পারেনা।

এখানে এ যাবত যা কিছু আলোচনা করলাম, ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার এগুলো পূর্বশর্ত। এর কোনোটিই জোর করে জনগণের মনমগজে বসিয়ে ও চাপিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। এর প্রত্যেকটার জন্যে অবশ্যি প্রয়োজন হচ্ছে প্রচার, প্রশিক্ষণ ও অনুধাবন করানোর যাবতীয় মাধ্যম ব্যবহার করে জনগণের ধ্যান ধারণা ও আকীদা বিশ্বাসের মধ্যে পরিবর্তন আনা। যাতে করে তাদের চিন্তার মানদন্ড পরিবর্তিত হয়ে যায়। তাদের মূল্যবোধে (VALUES) পরিবর্তন আসে। তাদের নৈতিক চরিত্র বদলে যায় এবং তাদের মধ্যে সার্বিক দিক দিয়ে এতোটা পরিবর্তন আসে যেন জাহিলী জীবন ব্যবস্থা তাদের উপর চাপিয়ে দেয়াকে বরদাশত করতে তারা প্রস্তুত না হয়। এটাই হচ্ছে সেই জিনিস যার সম্পর্কে আমরা বলি যে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ছাড়া ইসলাম প্রতিষ্ঠার বিকল্প পথ নেই। একটু চিন্তা করলে বিষয়টা সকলেরই বোধগম্য হতে পারে। ততোক্ষণ পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব নয়, যতোক্ষণ পর্যন্ত না এ উদ্দেশ্যে নিবেদিতপ্রাণ কর্মীগণ সর্বসাধারণের সক্রীয় সাহায্য সহযোগিতা লাভে সক্ষম হবে।

আমার বক্তব্য শুনে হয়তো ভাবছেন, 'পন্থা যদি এটাই হয় তবে তো আমাদের মনযিলে পৌছুতে এখনো সুদীর্ঘ পথ বাকী রয়েছে। আমরা তো এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে।' কিন্তু আমি বলছি, খুব সংকীর্ণ বা খুব উদার ধারণা থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও বাস্তব দৃষ্টিতে আমাদের আজ পর্যন্তকার সার্বিক কাজের পর্যালোচনা করে দেখুন। গণতান্ত্রিক পন্থায় কাজ করে আপনারা বিগত চব্বিশ বছরে শিক্ষিত শ্রেণীর এক বিরাট সংখ্যক লোককে নিজেদের ধ্যান ধারণার স্বপক্ষে আনতে সক্ষম হয়েছেন। এ লোকেরা সমাজ পরিমন্ডলের প্রতিটি ক্ষেত্রে ও স্তরে ছড়িয়ে রয়েছে। যে তরুন সমাজ ভবিষ্যত জীবনের প্রতিটি বিভাগকে পরিচালনা করবে, বাতিল শক্তির শত বিরোধিতা সত্ত্বেও তারা ব্যাপকভাবে ইসলামী ধ্যান ধারণায় গড়ে উঠেছে।

আপনি বলেছেন, গণতান্ত্রিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে টুটি চেপে দাবিয়ে রাখা হচ্ছে। নাগরিক স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার খর্ব করা হয়েছে এমতাবস্থায় কি করে গণতান্ত্রিক পন্থায় কাজ করা সম্ভব?

কিন্তু ইসলামের কাজ করার জন্যে তো কখনো উন্মুক্ত কুসুমাস্তীর্ণ রাজপথ পাওয়া যায়নি। একাজ যখনই হয়েছে, হয়েছে যুলুম নির্যাতনের মুকাবিলা করে,

জগদ্দল পাথর অতিক্রম করে এবং কন্টকাকীর্ণ পথ পাড়ি দিয়ে। ঐ সমস্ত লোক কখনো একাজ করতে পারেনি, যারা এজন্যে জাহিলিয়াতের পতাকাবাহীদের অনুমতি কিংবা তাদের থেকে সুযোগ সুবিধা পাওয়ার আশা পোষণ করে বসেছিল।

আমরা যেসব আদর্শ মনিষীর পদাংক অনুসরণ করছি, তাঁরা তো এর চাইতেও কঠিন পরিবেশে একাজ আঞ্জাম দিয়েছিলেন। তাঁদের সেখানে প্রতিষ্ঠিত ছিলো জংগলের আইন। নাগরিক স্বাধীনতা কিংবা মৌলিক অধিকার তো ছিলো সেখানে অকল্পনীয় ব্যাপার। সে সময় একদিকে তাঁরা পূত নৈতিক চরিত্র, যুক্তিগ্রাহ্য দলিল প্রমাণ এবং মানব স্বভাব আকৃষ্ট করবার মতো নীতিবোধ দ্বারা কাজ করেছিলেন। অপরদিকে এর জবাবে জাহিরিয়াতের পক্ষ থেকে আসছিল পাথর, গালি, মিথ্যা দোষারোপ। সত্যের কালেমা উচ্চারণের সাথে সাথে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো মানুষরূপী হিংস্র পশুর দল। মূলত এজিনিসটাই ছিলো ইসলামের বিজয় এবং জাহিলিয়াতের পরাজয়ের কারণ।

যখন একদল পূত চরিত্রের লোক কোনো যুক্তিগ্রাহ্য প্রাণাকর্ষী বক্তব্য নিয়ে দণ্ডায়মান হন এবং শত বিরোধিতা ও যুলুম নির্যাতনের মুকাবিলায় নিজেদের বক্তব্য প্রচার করে যান, তখন অবশ্যি এর তিনটি পরিণাম দেখা দিতে বাধ্য। এর প্রথমটি হচ্ছে এই যে, এমতাবস্থায় সাহসী, বাহাদুর ও ধীশক্তির অধিকারী লোকেরা প্রকাশ্যভাবে এদাওয়াত কবুল করতে অগ্রসর হয়। এলোকেরা আন্দোলনের জন্যে খুবই মূল্যবান পুঁজি হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় পরিণাম এই দেখা দেয় যে, যালিমদের সৃষ্ট এই ভয়াবহ পরিবেশে ব্যাপক বেশুমার লোক মনে প্রাণে এই দাওয়াতকে কবুল করে নেয়। অবশ্য সম্মুখে অগ্রসর হয়ে এরা আন্দোলনে শরীক হবার কথা ঘোষণা দেয়না। সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে এধরণের লোক সৃষ্টি হয়। চূড়ান্ত পরাজয়ের পূর্ব পর্যন্ত বিরোধী শক্তি টেরই পায়না, যে আন্দোলনকে ন্যাস্তনাবুদ করার জন্যে সে কোমর বেঁধে উঠে পড়ে লেগেছে তার সমর্থক গোষ্ঠী কোথায় কোথায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তার নিজের দলের লোকদের মধ্যেও এ ধরণের লোক সৃষ্টি হতে থাকে এবং সে এ সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেনা।

তৃতীয় ফল যেটা লাভ করা যায়, তাহচ্ছে এই যে, নৈতিক পবিত্রতা, সততা, সত্যবাদিতা এবং দাওয়াতের যুক্তি গ্রাহ্যতা নিজ নিজ প্রকৃতিগত

শক্তিবলে সম্মুখে প্রসারিত হতে থাকে। দুশমনরা এর অনুসরীদের উপর যতো বেশী যুলুম নির্যাতন চালাতে থাকে, ততোই তা প্রত্যেক শরীফ, সৎ ও বিবেকবান লোকের হৃদয়কে নাড়া দিতে থাকে। তার অনুসারীরা যতো বেশী সাহস ও দৃঢ়তার সাথে যুলম নির্যাতন বরদাশত করতে থাকে এবং নিজ সত্য পথ ও নীতি থেকে এক চুল পরিমাণও বিচ্যুত হতে রাজী না হয়, ততোই তাদের মর্যাদা শুধু সর্ব সাধারণের কাছেই নয়, বরঞ্চ স্বয়ং দুশমনদের কাতারেও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। অতঃপর যখন চূড়ান্ত ফায়সালার সময় উপস্থিত হয়, তখন ধীরে ধীরে শত্রুর কঠোরতার সম্মুখে এতোদিন যারা সমর্থক হয়ে চুপ ছিলো, তারা বিভিন্নভাবে তাদের সাহায্য সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত বিরোধিতার ময়দানে শুধু মাত্র ঐ ক'জন লোকই বাকী থাকে, যারা চোখ বন্ধ করে দুশমনী করার জন্যে কসম খেয়ে বসেছে। কিন্তু তখন আর তাদের কোনো সাহায্য সহযোগিতাকারী তো দূরের কথা, এমনকি তাদের মৃত্যুতেও অশ্রু ফেলার মতো কেউ থাকেনা।

বস্তুত যেখানেই যুলুম নির্যাতনের কঠোরতার মুকাবিলায় দাওয়াতে হকের পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং দুর্দম দৃঢ়তার সাথে তা উত্তোলিত রাখা হয়, সেখানে যুলম ও জাহিলিয়াতের বিরুদ্ধে এই তিনটি ফলাফল প্রকাশিত হতে বাধ্য। মূলত দ্বীনে হকের বিজয়ের জন্যে এটাই স্বাভাবিক পন্থা।

সুতরাং গণতান্ত্রিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে দাবিয়ে রাখার, নাগরিক স্বাধীনতা হরণ করার এবং মৌলিক অধিকার খর্ব করার কারণে নিরাশ ও বিচলিত হয়ে পড়ার কোনো কারণ নেই।[১]

২. ইসলামী বিপ্লবের সম্ভাবনা

প্রশ্নঃ মওলানা! গণতান্ত্রিক পদ্ধতি খুবই জটিল। বর্তমান গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলামী বিপ্লব সম্ভব কি?

১. এই প্রশ্নোত্তরটি তরজমানুল কুরআন ভলিউম–৮৩ সংখ্যা–৪ থেকে সংকলন করা হয়েছে। এ গ্রন্থে মওলানার এটি এবং আরো দুয়েকটি লিখিত প্রশ্নোত্তর সংযোজন করা হয়েছে। –অনুবাদক

জবাবঃ আমাদের কাজের জন্যে যে পথ খোলা রয়েছে তা আমরা কেমন করে পরিত্যাগ করতে পারি? ইসলামী বিপ্লব হওয়া বা না হওয়া তো আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তিনি যখন চাইবেন তখন এ বিপ্লবের জন্যে কোনো না কোনো পথ খুলে দেবেন। কিন্তু একথা মনে রাখবেন, সমাজতান্ত্রিক এবং পূঁজিবাদী ব্যবস্থা বেশী দিন ক্ষমতায় থাকতে পারবেনা। এইসব ভ্রান্ত জীবনব্যবস্থা তাদের আদর্শিক ভ্রান্তি এবং আণবিক শক্তির দ্বারাই ধ্বংস হয়ে যাবে। অতপর ইসলাম পূর্ণভাবে বিজয়ী হবে এবং ক্ষমতা গ্রহণ করবে। পৃথিবীর কোনো শক্তি এখন আর ইসলামের গতিরোধ করতে সক্ষম নয়।

৩. ইসলামী বিপ্লব এবং আমরা

প্রশ্নঃ মওলানা! আমার মনে হয় ইসলামী বিপ্লব দেখে যেতে পারবনা।

জবাবঃ আজ যাঁরা ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের জন্যে কাজ করছেন তাঁরা যদি তাঁদের জীবদ্দশায় বিপ্লব ও বিজয় দেখে যেতে না পারেন, তবে তারা আল্লাহর দরবারে ঐসব লোকদের তুলনায় অধিকতর গ্রহণযোগ্য হবেন, যাঁদের জীবদ্দশায় আন্দোলন বিজয়ী হয়েছে। কেননা এসব লোকদের পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতেই আন্দোলন বিজয়ের দিকে এগিয়ে গিয়েছে। আপনাদের প্রচেষ্টার ফলেই বিপ্লব ও বিজয়ের পথ উন্মুক্ত হয়েছে। রাসূলুল্লাহর (সা) যেসব সাথী ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বেই শহীদ হয়েছেন কিংবা মৃত্যুবরণ করেছেন তারা আল্লাহর নিকট অন্যদের তুলনায় অধিকতর গ্রহণযোগ্য ও প্রিয় এবং অন্যদের তুলনায় অনেক বেশী পুরস্কার লাভের হকদার।[১]

৪. ইসলামী বিপ্লবঃ উপরকরণ ও গুণাবলী

প্রশ্নঃ মাওলানা! কোনো দেশে ইসলামী বিপ্লব সাধানের জন্যে কি পরিমাণ উপায় উপকরণ, কতোটা প্রস্তুতি এবং কি কি গুণাবলী প্রয়োজন?

জবাবঃ প্রতিটি দেশের পরিবেশ পরিস্থিতি এক রকম হয়না। তা সত্ত্বেও নীতিগতভাবে একথা বুঝে নিন যে, ইসলামী বিপ্লব সাধনের জন্যে এমন একদল সুসংগঠিত লোকের প্রয়োজন, জ্ঞান ও চরিত্রের দিক থেকে যারা হবে ইসলামের

---

১. এশিয়া লাহোর ১০ জানুয়ারী ১৯৭৮ ইং

প্রাণসত্তা, ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা হবে যাদের জীবনের উদ্দেশ্য এবং এপথে জান, মাল ও সময়ের সর্বপ্রকার কুরানীর জন্যে হবে তারা সম্পূর্ণ প্রস্তুত। কিন্তু এই লোকদের প্রচেষ্টার দ্বারা ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবেই, এমন কোনো গ্যারান্টি নেই। প্রকৃতপক্ষে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা আল্লাহর এক বিরাট নিয়ামত। তিনি যদি এই জাতিকে সে নিয়ামতের উপযুক্ত মনে করেন তবে তিনি এখানে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন। কিন্তু জাতি যাদি তার উপযুক্ত না হয় এবং তারা সৎ লোকের পরিবর্তে অসৎ লোকদের পছন্দ করে, তবে আল্লাহতায়ালা জোর জবরদস্তি করে এ নিয়ামত তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবেননা। অবশ্যি সেইসব লোকদেরকে এই জন্যে পরিপূর্ণ পুরস্কার দান করবেন যারা তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্যে চেষ্টা সংগ্রাম করে।

৫. জটিল পরিবেশে ইসলাম প্রচারের কাজ

প্রশ্নঃ এদেশে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পথে বিরাট বিরাট সমস্যা ও জটিলতার সৃষ্টি করা হচ্ছে। বৈঠকাদি ও জনসভার কাজকে সম্পূর্ণ অসম্ভব বানিয়ে দেয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় একজন কর্মী কিভাবে কাজ করবে?

জবাবঃ জামায়াতে ইসলামী যে বিপ্লব সাধনের চেষ্টা সংগ্রাম চালাচ্ছে, প্রত্যেক কর্মীর উচিত যেখানেই যার সাথে কোনো না কোনো সম্পর্ক স্থাপিত হবে সেখানেই তার নিকট সেই বিপ্লবের দাওয়াত পৌছে দেয়া। বৈঠকাদি ও জনসভার তুলনায় ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে এদাওয়াত অধিকতর কার্যকরভাবে পৌছানো যায়। জামায়াতে ইসলামী যখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখন দীর্ঘদিন যাবত আমরা জনসভা করিনি। ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমেই দাওয়াত সম্প্রসারিত করা হয়েছিল। জামায়াতের কর্মীরা নিজেদের সাথে ইসলামী সাহিত্য রাখতেন, শিক্ষিত লোকজনদের সাথে যোগাযোগ করে সেগুলো পড়তে দিতেন, অন্যদেরকে মৌখিকভাবে বুঝিয়ে স্বমতে আনতেন। আপনারাও মহল্লায় মহল্লায়, অলিতে গলিতে, ঘরে ঘরে, বাসায় বাসায়, রেলে, বাসে, লঞ্চে, স্টীমারে, মোটকথা সর্বত্র ব্যক্তিগত পর্যায়ে দাওয়াতী কাজ করে যান। নিজেদের সাথে ইসলামী সাহিত্য রাখুন, মৌখিকভাবে আলোচনা করে মানুষকে সমর্থক বানান, শিক্ষিতদেরকে বই পড়তে দিন। এ সময় শিক্ষিত ও চিন্তাশীল গোষ্ঠীকে ইসলামী আন্দোলনের সমর্থক বানানোর সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। অতপর এই শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদের উচিত গ্রামে গঞ্জে গিয়ে

জনগণের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করা এবং তাদের নিকট নিজেদের ধ্যান ধারণা তাদের ভাষায় পৌছে দেয়া।

দেশের একটা বড় সংখ্যক শিক্ষিত লোক এখন জামায়াতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। যেসব শিক্ষিত লোকের ইসলামের সাথে সম্পর্ক রয়েছে সাধারণত জামায়াতের সাথেও তাদের সম্পর্ক রয়েছে। আর তারা যেখানেই অবস্থান করুন না কেন, ইসলামী সমাজ গড়ার পরিবেশ তৈরী করছে।[১]

৬. টেলিফোনে বিয়ে

প্রশ্নঃ আমাদের এখানে আজকাল টেলিফোনে বিয়ে হচ্ছে। মেহেরবাণী করে শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে বিয়ের এ রীতি সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

জবাবঃ এ এক অজ্ঞতা ও বোকামী সুলভ কাজ। এমনটি যারা করে, তারা টেলিফোনে আদালতের সাক্ষ্য দেয়ার চেষ্টা করে দেখুক। তখন তারা একাজটার স্বরপ ভালভাবে বুঝতে পারবে। বিয়ে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যার ওপর একজন নারী ও একজন পুরুষের গোটা যিন্দেগীর শান্তি ও স্থিতি নির্ভরশীল। কেবল টেলিফোনের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে একাজ সম্পন্ন করা কিছুতেই বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারেনা। এমন কাজ তো কেবল সে ব্যক্তিই করতে পরে, যার কন্যা বিয়ে দেয়ার জন্যে বর পাওয়া যায়না আর যখনি কোনো বীর পুরুষের প্রাসাদ থেকে টেলিফোন এলো, সাথে সাথেই টেলিফোনে তিনি কন্যাকে তার হাতে সঁপেদিলেন।

মনে রাখতে হবে, শরীয়তের দৃষ্টিতে টেলিফোনের সাক্ষ্য সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং অবৈধ। ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ে বৈধ হবার জন্যে দু'জন ব্যক্তির সম্মুখে 'ইজাব' ও 'কবুল' হওয়া আবশ্যক।

প্রশ্নঃ আপনি বলছেন, টেলিফোনের বিয়ে বৈধ নয়। তাহলে ইতিপূর্বে যারা টেলিফোনে বিয়ে করেছে, তাদের বিয়ে কি নবায়ন করতে হবে, না অন্য কোনো উপায় আছে?

---

১. আইন, ২১শে এপ্রিল ১৯৭৬ ইং

জবাবঃ এব্যাপারে আমি কি বলবো? টেলিফোনের বিয়ের তো কোনো শরয়ী এবং আইনগত মর্যাদা নেই। এটাতো আইন এবং নিয়মনীতি বর্জিত কাজ। এতে সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা এবং দ্বীনী বিষয়ে অনুভূতিহীনতার বহিপ্রকাশ ঘটেছে। বরঞ্চ আমার মনে হয় শুধু অজ্ঞতাই নয়, যারা এমনটি করছে দ্বীনের প্রতি ঘৃণা এবং বিদ্বেষের বশবর্তী হয়েই তারা একাজ করছে। যে ব্যক্তির বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হবার কষ্টটুকু সহ্য হয়না, সে কি বর হওয়ার যোগ্য? কি করে তার কাছে কেউ কন্যা বিয়ে দিতে পারে? যারা এধরনের ছেলেদের কাছে মেয়ে দিতে উদ্যত হয়, তাদের মেয়েরা কি তাদের জন্যে এতোই বোঝা হয়ে পড়েছে যে, তাদেরকে এভাবে ছুঁড়ে ফেলতে হবে?

প্রশ্নকর্তা পুনরায় প্রশ্ন করেনঃ এ পন্থার বিয়েতে কি আত্মীয়তা সফল হয়? জবাবে মওলানা বলেনঃ তাও সফল হতে পারেনা। যারা এভাবে স্বীয় কন্যাদের বিয়ে দেয়, তারা মূলত সফল আত্মীয়তার জন্যে এমনটি করেনা, বরঞ্চ বোকামীর কারণেই এরূপ করে থাকে। এমনও দেখা গেছে, কেউ কেউ ইংল্যান্ডে অবস্থানরত এদেশীয় কোনো লোকের কাছে টেলিফোনে কন্যা বিয়ে দিয়েছেন। অতপর মেয়ে সেখানে গিয়ে দেখল, বরটি আস্ত মূর্খ কিংবা যৎকিঞ্চিত পড়ালেখা করে সেখানে কোনো মিলে শ্রমিকের কাজ করছে। এখন অনন্যোপায় হয়ে মেয়েটি সেখানে বড় কষ্টে দিনাতিপাত করছে।

এসময় অপর একজন বলতে লাগলেনঃ "একটা অন্ধমোহে পড়ে লোকেরা এভাবে ইংল্যান্ডে অবস্থানরত ছেলেদের কাছে মেয়েদের বিয়ে দিচ্ছে। শুধুমাত্র ছেলেটি ইংল্যান্ডে থাকে এ আকর্ষণে তারা এমনটি করছে। আমার জানা মতে এরূপ একটা ঘটনা ঘটেছে। একবার একভদ্রলোক ইংল্যান্ডে অবস্থানরত এক যুবকের কাছে টেলিফোনে তার কন্যাকে বিয়ে দেন। অতপর মেয়ে সেখানে পৌছুলে ছেলে তাকে অপছন্দ করে এবং সাথে সাথেই মেয়েটিকে দেশে পাঠিয়ে দেয়।"

মওলানা বলেনঃ পাশ্চাত্য দেশে যারা 'সোল ম্যারেজ' করে তারাও আদালতে উপস্থিত হয়ে তা করে। আর এসব মুসলমানরা টেলিফোনে বিয়ে করার রীতি চালু করছে। অথচ ইসলামের বৈবাহিক আইন অনুযায়ী 'ইজাব' এবং 'কবুল' অপরিহার্য জরুরী বিষয়। আর ইজাব কবুলের জন্যে সাক্ষীদের সশরীরে

উপস্থিত থাকা আবশ্যক। প্রশ্ন হচ্ছে, টেলিফোনের বিয়েতে এ সাক্ষ্য কিভাবে হবে?[১]

৭. কুরআনকে হিদায়াত না কুরআন থেকে হিদায়াত?

প্রশ্নঃ اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا فَكَفَرُوْا আয়াতাংশটি দ্বারা কেউ কেউ যুক্তি প্রদর্শণ করে যে, নবীকে মানুষ বলা কুফরী। মেহেরবাণী করে এর সঠিক ও প্রকৃত তাৎপর্য বলুন।

জবাবঃ কোনো ব্যক্তি যদি কুরআন থেকে হিদায়াত গ্রহণের পরিবর্তে স্বয়ং কুরআনকেই হিদায়াত করতে শুরু করে, তবে এমন ব্যক্তির পক্ষে কুরআনের যেকোনো আয়াতের যেকোনো অর্থ করা আশ্চর্যের কিছু নয়। কেউ যদি কুরআন মজীদ পড়ে দেখে, তাহলে সে পরিষ্কারভাবে দেখতে ও বুঝতে পারবে যে, আল্লাহতাআলা কুরআন করীমের বহু জায়গায় স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন, মানুষকে হিদায়াত করার জন্যে কেবল মানুষকেই রাসূল বানিয়ে পাঠানো হয়েছে।

৮. অংশীদারিত্বের ব্যবসা এবং আল্লাহর পথে ব্যয়

প্রশ্নঃ কয়েক ব্যক্তি একত্র হয়ে অংশীদারিত্বের ব্যবসা করেন। তাদের একজন এই সমন্বিত সম্পদ থেকে আল্লাহর পথে ব্যয় করেন। এর ফলে তাদের সকলেই কি সওয়াব লাভ করে? তিনি যদি এব্যয় অন্যান্য অংশীদারদের না জানিয়ে করন, তবু কি তিনি সওয়াব লাভ করবেন?

জবাবঃ কেউ যদি ব্যবসায়ের অংশীদারদের না জানিয়ে মূল তহবিল থেকে আল্লাহর পথে ব্যয় করেন এবং তিনি এটা জানেন যে, তার অংশীদাররা এ অর্থ ব্যয়ে সন্তুষ্ট নন, তবে এটা তার ব্যক্তিগত ব্যয়ের হিসাবে লিখে রাখা উচিত। অবশ্য এ ব্যয় যদি সকলের সম্মতিক্রমে হয়, তবে সকল অংশীদারই এর সওয়াবপাবেন।

৯. যাকাত এবং করযে হাসানা

প্রশ্নঃ কোনো যাকাত পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তি যদি যাকাতের টাকা গ্রহণ

---

১. সাপ্তাহিক এশিয়াঃ ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৬৭ ঈসায়ী

করতে না চায়, তবে যাকাতের টাকা তাকে যাকাত হিসেবে না জানিয়ে করযে হাসানা হিসেবে দেয়া যেতে পারে কি? অতপর কোনো এক সময়ে সে যদি এটাকা ফেরত দেয়, তবে তা কিভাবে ব্যয় করা যেতে পারে?

জবাবঃ অনেক দরিদ্র এবং যাকাত পাওয়ার যোগ্যলোক যাকাত নেয়াকে দূষণীয় মনে করেন। আপনি যদি সত্যিকার যাকাত পাবার উপযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে যাকাত প্রদান করতে চান, তবে তাকে যাকাতের টাকাই দেয়া হচ্ছে, তা বলে দেয়া জরুরী নয়।

তিনি যদি আপনার নিকট থেকে করয হিসেবে টাকা চান, তবু আপনি তাকে যাকাতের টাকা প্রদান করতে পারেন। তবে, আপনি ফেরত নেয়ার নিয়্যত রাখবেন না। পরে কোনো এক সুযোগে তাকে বলেদেবেন, আপনি তার করয মাফ করে দিয়েছেন। হ্যাঁ, তার অবস্থার যদি এতোটা উন্নতি হয় যে, তিনি নিজে থেকেই করযের টাকা আপনাকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন, তবে আপনি তা নিয়ে নেবেন এবং অপর কোনো উপযুক্ত ব্যক্তিকে দিয়ে দেবেন।

প্রশ্নঃ স্বামী যদি স্ত্রীকে দান সদকা করার নির্দেশ দেয়, কিন্তু স্ত্রী যদি কৃপণতা করে দান সদকা না করে কিংবা কম করে, তবে এমতাবস্থায় স্বামী কি সওয়াব থেকে মাহরূম হবে?

জবাবঃ নিয়্যতের কারণে স্বামী সওয়াব পাবেন। সাধারণত স্ত্রীরা স্বামীর আয় দেখে ব্যয় করে এবং সামর্থের অধিক অর্থ সম্পদ ব্যয় করেনা। এটা তাদের কৃপণতা নয়, বৈশিষ্ট্য। কর্তা যদি ধনের চাইতে বড় দানবীর হন, তবে বিবিকেও তার অনুসরণ করে ভিটে ছাড়া হতে হবে, এমনটি জরুরী নয়। তারতো সর্বাবস্থায়ই আয় বুঝে ব্যয় করা উচিত।

১০. দুনিয়ার জীবন ঃ অবকাশকাল

প্রশ্নঃ আপনি বলেছেন, হকের বিরোধীতাকারীদের পরিণতি ধ্বংস। কিন্তু যারা ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র মানে তাদের সংখ্যা অন্য সকল লোকদের চাইতে অধিক। তাছাড়া উত্তরোত্তর তাদের সংখ্যা বেড়েই চলছে। তাদের ধ্বংসের পরিণতি প্রলম্বিত হচ্ছে কেন?

জবাবঃ এ পৃথিবীর জীবনকে আল্লাহ তাআলা অবকাশকাল বানিয়েছেন। মানুষ এখানে খুব কমই তার আমলের পূর্ণ পরিণতি ভোগ করে। যারা ভ্রান্তপথে অনেকদূর এগিয়ে গেছে, আল্লাহতাআলা তাদের সুযোগ দেন, যেনো তারা নিজেদের ইচ্ছার স্বাধীনতাকে পূর্ণভাবে ব্যবহার করে নিজেদের জন্যে যেকোনো গন্তব্যস্থল বেছে নিতে পারে। পৃথিবীর জীবনে এসময়টা যতোই দীর্ঘ হোকনা কেন, পরিণতিতে তাদের জন্যে ধ্বংসই রয়েছে।

১১. সূদ ব্যবসা এবং লিখিত প্রমাণ

প্রশ্নঃ কেউ যদি ব্যবসায়ের জন্যে বন্ধু বান্ধবদের থেকে টাকা নেয় এবং লাভ লোকসান নির্ণয় ছাড়াই সততার সাথে বিবেচনা করে প্রত্যেক মাসে তাকে কমবেশী লাভের একটা অংশ প্রদান করে, তাহলে এ লাভ দান ও গ্রহণটা কি সূদের সংজ্ঞায় পড়বে? এ পন্থা যদি বৈধ না হয়, তবে শরীয়ত সম্মত অন্য কি পন্থা আছে? উপরোল্লেখিত ধরনের লেনদেন লিখিতভাবে হওয়ার এবং তার জন্য সাক্ষী বানানোর প্রয়োজন আছে কি?

জবাবঃ যেহেতু লাভের পরিমাণ অনুযায়ী তা কমবেশী হারে গ্রহণ করা হয়, তাই এধরনের লাভ প্রদান এবং গ্রহণ সূদের সংজ্ঞায় পড়েনা। সূদ হচ্ছে সেই জিনিস যা নির্দিষ্ট হারে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে নির্ধারণ করা হয় এবং গ্রহীতাকে লাভ লোকসান উভয় অবস্থাতেই তা পরিশোধ করতে হয়।

শরীয়ত লেখাপড়া ছাড়া কোনো প্রকার লেনদেন করাটাকে সমর্থন করেনা। লিখিত প্রমাণ না থাকলে পরবর্তীতে ঝগড়া বিবাদ হয়ে থাকে এবং কোনো পক্ষের নিকট কোনো প্রমাণ না থাকার কারণে তা বড় আকার ধারণ করে। শরীয়ত মুসলমানদের এই জঞ্জাল থেকে মুক্ত রাখতে চায়।[১]

১২. নেকটাই ক্রুসচিহ্ন

প্রশ্নঃ নেকটাই ক্রুসচিহ্ন, একথাটা কি ঠিক?

জবাবঃ হ্যাঁ, কথাটা ঠিক।

---

১. সাপ্তাহিক এশিয়া লাহোরঃ ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৬৭ ইং

প্রশ্নঃ "কেউ যদি এটাকে ইংরেজদের পোষাক মনে না করে এমনিতেই কখনো কখনো পরে, তবে তাতে দোষ কি?"

জবাবঃ ইংরেজদের পোষাক পরাকে এখন দোষ মনে করা হচ্ছেনা। এটা এখন একটা সাধারণ জিনিসে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ইংরেজরা প্রথম যখন এদেশে আসে, তখন এদেশের লোকেরা তাদের চরমভাবে ঘৃণা করতো। তাদের ছায়া পর্যন্ত মাড়াতোনা, পোষাক পরাতো দূরের কথা, এমনকি তাদেরকে দেখা পর্যন্ত পসন্দ করতো না। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ের ঘটনা। এক মুসলমান এবং এক হিন্দু বণিকের মধ্যে কোনো একটা বিষয় নিয়ে বিবাদ সংঘটিত হয়। বণিকটির বক্তব্য ছিলো সত্য আর মুসলমানটির বক্তব্য ছিলো মিথ্যা। মকদ্দমা দায়ের করা হয় আদালতে। হাকিম ছিলো ইংরেজ। বেনিয়া তার জবানবন্দীতে হাকিমের কাছে বললোঃ "ঘটনাটি আমার প্রতিপক্ষ ব্যক্তির বড় ভাইয়ের নিকট জেনে দেখুন, কে সত্য আর কে মিথ্যা? তিনি যা বলেন, আমি তা মেনে নোবো।" ইংরেজ জজ তার বড় ভাইয়ের নামে সমন পাঠান আদালতে এসে জবানবন্দী দেয়ার জন্যে। তিন বলে পাঠান, আমি সাক্ষী দিতে পারব না। কারণ সাক্ষী দিতে গেলে কাফির ইংরেজের চেহারা দেখতে হবে।

জজ বললো, ঠিক আছে। তিনি যদি কাফিরের চেহারা দেখতে না চান, তবে কাফিরই তার চেহারা দেখবে। অতপর জজ বাদী এবং বিবাদীকে নিয়ে তার বাড়ী যান। তাকে জানানো হয় ইংরেজ মুনসেফ তার জবানবন্দী নেয়ার জন্যে এসেছে। এরা সবাই বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। তিনি দরজার এক পাল্লা খানিকটা খুলে ভিতরে দাঁড়ালেন। ইংরেজের দিকে যেনো দৃষ্টি না পড়ে সে জন্যে নিচের দিকে তাকিয়ে কেবল এতোটুকু কথা বলেই দরজা বন্ধ করে দিলেনঃ "ফিরিংগী! আমার ভাইর বক্তব্য মিথ্যা এবং বেনিয়ার কথা সত্য।"

এখন দেখুন, সে যুগে ইংরেজদের সম্পর্কে এই ছিলো মুসলমানদের দৃষ্টিভংগি। অতপর ধীরে ধীরে এদেশে ইংরেজদের সংস্কৃতি বিজয়ী হতে থাকে। এখনকার অবস্থাতো আপনাদের সামনেই রয়েছে।

১৩. নবী করীম (সা)—এর নামের সাথে صلعم লেখা

প্রশ্নঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামের সাথে লোকেরা

সংক্ষিপ্তকরণের জন্যে "صلعم" লেখে। আবার কেউ কেউ শুধু মাত্র "ص" লেখে। এ সম্পর্কে আপনার মত কি?

জবাবঃ "صلعم" অক্ষরগুলো তো অর্থহীন। নবী পাকের নামের সাথে এমনটি লেখা ঠিক নয়। অবশ্য "ص" (স) লেখা যেতে পারে। কিন্তু সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম লেখাই উত্তম।

১৪. সততা ও সরকারী চাকুরি

প্রশ্নঃ একজন সরকারী কর্মচারী আছেন। তিনি অত্যন্ত সৎ। সততার কারণে অফিস কর্মকর্তাগণ তাকে কাজ দেন না। তিনি কর্মকর্তাদের কাছে কাজ দাবী করেন। কিন্তু তারা তাকে কাজ দেননা। এখন তার করণীয় কি? কর্মহীন বসে থেকে তিনি দারুনভাবে মানসিক যাতনায় ভুগছেন।

জবাবঃ এ ব্যক্তি নির্দোষ এবং তার অফিসারই দোষী। তাকে যদি কাজ দেয়া না হয় তবে কর্মহীন বসে না থেকে কোনো নেক কাজ করাই তার কর্তব্য। যেমন, তিনি কুরআন, হাদীস বা ইসলামী বই অধ্যয়ন করতে পারেন। আসলে সরকারের কর্তব্য হচ্ছে, এমন পরিমাণ কর্মচারী নিয়োগ করা যাদের সকলকে কাজ দেয়া যাবে। নিষ্প্রয়োজনে কর্মচারী নিয়োগ করা ঠিক নয়।

১৫. সিনেমা হল নির্মাণ এবং তওবা

প্রশ্নঃ এক ব্যক্তি সিনেমা হল তৈরী করেছে। অতপর তার মধ্যে খোদাভীতি জাগ্রত হয় এবং তিনি সিনেমা হল বিক্রি করে দেন। এতে কি তার গুণাহ মাফ হয়ে যাবে?

জবাবঃ তার তওবা করা উচিত। কারো ক্ষতি করে থাকলে তার ক্ষতি পূরণ দিয়ে দেবে। যদি ক্ষতিপূরণ করার পথ না থাকে, তাহলে খোদার দরবারে তওবা করবে এবং ভবিষ্যতে এধরনের কাজ থেকে বিরত থাকার শপথ করবে।

১৬. ফজরের নামায এবং সুন্নত

প্রশ্নঃ ফজরের নামাযের জামাত দাঁড়িয়ে গেছে। এমতাবস্থায় সুন্নত পড়া যাবে কি?

জবাবঃ এবিষয়ে তিনটি মত আছেঃ

এক, তখন সুন্নত পড়া যাবে না। ফরযের সালাম ফিরানোর পরপর পড়বে।

দুই, সুন্নত তখন পড়বে না এবং ফরযের সালাম ফিরানোর পরপরও পড়বে না বরঞ্চ সূর্য ওঠার পর পড়বে।

তিন, জামাত দাঁড়িয়ে গেলে সুন্নাত পড়বে না। কেউ ফরযের আগে সুন্নত পড়তে না পারলে ফরযের পরে সুন্নত পড়ার প্রয়োজন নেই।

এ বিষয়ে মতপার্থক্যের কারণ হলো এই যে, নবী করীম (সা) বলেছেন "ফজরের নামায পড়ার পর সূর্যোদয় হওয়া পর্যন্ত আর কোনো নামায নেই।" যারা এ নামাযের অর্থ ফযরের ফরয নামায বুঝেছেন, তারা ফরযের পর সুন্নাত না পড়ার মত অবলম্বন করেছেন। আর যারা ফজরের নামাযের অর্থ ফরয এবং সুন্নাত দুটোই বুঝেছেন, তাদের মতে ফরযের পর সুন্নাত পড়ায় কোনো অসুবিধা নেই। আসলে উভয় মতই সঠিক। যে মতের উপর যার আস্থা জন্মে তিনি সেটাই অবলম্বন করতে পারেন। এনিয়ে ঝগড়া বিবাদ করা ঠিক নয়।

১৭. হযরত আদম (আঃ) এর আগে মানব অস্তিত্ব

প্রশ্নঃ হযরত আদম (আঃ)-এর আগে কোনো মানব অস্তিত্ব ছিল কি?

জবাবঃ হযরত আদম (আঃ)-এর পূর্বে কোনো মানুষের অস্তিত্ব ছিল বলে প্রমাণ নেই। বিবর্তনবাদীরা এরূপ ধারণা অনুমান করে থাকে। তাদের মতে প্রথমত এমন ধরনের কোনো মানুষ ছিল যাদের লেজ ছিল। অতপর তাদের লেজ অদৃশ্য হয়ে যায়। কুরআন মজীদ মানব সূচনা হযরত আদম (আঃ) থেকে হয়েছে বলে ঘোষণা দেয়। তার পূর্বে কোনো মানব অস্তিত্ব ছিল না। [১]

১৮. জামায়াতে ইসলামী এবং দাওয়াত ও তাবলীগ

প্রশ্নঃ মওলানা! অধিকাংশ লোকের ধারণা, জামায়াতে ইসলামী তার আদর্শ

---

[১]. সাপ্তাহিক এশিয়া লাহোর ৭ই নভেম্বর ১৯৬২ ইং

প্রচারের জন্যে গণমুখী পদ্ধতিতে কাজ করছে না। আমাদের উচিত জনগণের ইচ্ছা ও প্রয়োজনীয়তা পর্যালোচনা করে এমন কর্মপন্থা অবলম্বন করা, যা যুগের সাথে খাপ খাবে এবং জনগণের মধ্যে আবেদন সৃষ্টি করবে।

জবাবঃ জামায়াতে ইসলামী তার প্রতিষ্ঠার দিন যে কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছিল আমরা কখনো তা থেকে বিন্দুমাত্র সরে পড়িনি। কারণ, এই কর্মপন্থা আমরা ইসলামের শিক্ষার আলোকে প্রণয়ন করেছি। আমাদের সম্মুখে ছিল সেই মনযিল, ইসলামী বিধান অনুযায়ী যা একটি খাঁটি ইসলামী দলের মনযিল হওয়া উচিত। একাজের জন্যে আমরা সেই পথই নির্বাচন করেছি যা কুরআন সুন্নাহর আলোকে একটি ইসলামী দলের পথ হওয়া উচিত।

আমাদের মতে, কুরআন সুন্নাহ নির্ধারিত যাবতীয় মূলনীতি সম্পূর্ণ অপরিবর্তনীয়। জনগণের ইচ্ছা ও দাবীর প্রেক্ষিতে তা পরিবর্তন করা যায়না। জনগণের আকাংখাকে ইসলামী আকাংখায় রূপান্তরিত করাই তো হচ্ছে আমাদের কাজ। আমরা কখনো ইসলামকে পরিবেশ এবং জনগণের ইচ্ছানুযায়ী পরিবর্তন করবো না। এরূপ প্রস্তাবতো সেই সব লোকরাই করতে পারে যারা নিজেদের মধ্যে সমস্যা মোকাবিলার সাহস রাখে না। আমরা স্থায়ী এবং সুদৃঢ় পরিবর্তন চাই। আর এজন্যে স্থায়ী এবং সুদৃঢ় কর্মসূচীই কার্যকর হতে পারে। সময়োপযোগী সস্তা শ্লোগান দিয়ে এবং বিভ্রান্তকারী কৃত্রিম বুলি আউড়িয়ে জনগণকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করা যেতে পারে বটে, কিন্তু কোনো কল্যাণকর এবং গঠনমূলক কাজ করা যেতে পারে না। আমরাও যদি বিজয়ী হবার জন্যে শয়তানী ধোকা প্রতারণার পথ গ্রহণ করি তবে আমার মতে কোনো কাজ না করে চুপ করে বসে থাকাটাই এর চাইতে অনেক ভাল হবে।[১]

১৯. আল্লাহ তায়ালার আকাশে অবতীর্ণ হওয়া এবং সাধারণ দান।

প্রশ্নঃ আল্লাহ তাআলার পৃথিবীর আকাশে অবতীর্ণ হওয়া এবং সাধারণ দান সংক্রান্ত হাদীস প্রসঙ্গে আপনি দারসে হাদীস দান কালে বলেছিলেন, আল্লাহ

১. সাপ্তাহিক এশিয়া লাহোর ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ ইং

তাআলার অবতীর্ণ হওয়াটা রূপক অর্থে ব্যবহার হয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম থেকে হাদীসটি ব্যাখ্যার কোনো উদারহরণ পেশ করবেন কি?

জবাবঃ কেউ কেউ প্রতিটি শব্দের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণের জন্যে জেদ ধরে। তারা "আল্লাহর অবতীর্ণ হওয়া" শব্দেরও বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করে। তাদের এই অর্থ অনুযায়ী আল্লাহ অবতীর্ণ হয়ে থাকেন, যেমন একজন দেহধারী মানুষ উপর থেকে নীচে অবতীর্ণ হয়ে থাকে। অথচ আল্লাহ তাআলার অবতীর্ণ হবার তাৎপর্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। যেমন "আল্লাহর হাত" অর্থ পাঁচ আঙ্গুল বিশিষ্ট হাত নয় এবং "আল্লাহর চক্ষু" অর্থ মানুষের মত চোখ নয়। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলার পৃথিবীর আকাশে অবর্তীণ হবার অর্থ কোনো দেহধারী বস্তুর অবতীর্ণ হবার অর্থে গ্রহণ করা যায় না। যদি শব্দের বাহ্যিক অর্থের জন্যে জেদ ধরা হয় তবে তো একথাও স্বীকার করে নিতে হয় যে, আল্লাহ তাআলা মানব দেহ ধারণ করেন এবং মানুষের মত সিড়ি বেয়ে উপরে উঠেন এবং নীচে অবতীর্ণ হন। (মায়াযাল্লাহ)।

২০ তিন তালাক

প্রশ্নঃ একসাথে তিন তালাক বললে তালাক কার্যকর হয়ে যাবে কি? কেউ কেউ বলেন, একসাথে যতবারই তালাক উচ্চারণ করা হোকনা কেন, তা মূলত এক তালাক বলেই গণ্য হবে।

জবাবঃ এ হচ্ছে ইমাম ইবনে তাইমীয়ার মত। আহলে হাদীসও এমতেরই অনুসারী। শীয়া মাযহাবের মতও এটাই। কিন্তু চার ইমাম এব্যাপারে একমত যে, তিন তালাক একত্রেই দেয়া হোক কিংবা তা তিন তহুরে দেয়া হোক, সর্বাবস্তায়ই তালাক কার্যকর হয়ে যাবে। তিন তালাক একত্রে দেয়া হলে ইদ্দত কালে পূনঃ গ্রহণের অবকাশ থাকবে না। একথাটি বিভিন্ন হাদীস থেকে প্রমাণিত। বলা হয় হযরত উমর (রাঃ) একত্রে তিন তালাক দেয়াকে এক তালাক মনে করতেন। কথাটি ঠিক নয়। চার ইমাম যে মতামত প্রদান করেছেন তা হাদীসের ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয়েছে। উপরোক্ত কথাটি হযরত উমরের (রাঃ) কথা বলে চালিয়ে দেয়াটা তার প্রতি একটা অপবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। হযরত উমর (রাঃ) শরীয়তের কোনো পরিবর্তন সাধনের কোনা অধিকার রাখতেন না। তিনি এমনটি করলে সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) তা কখনো বরদাশত করতেন ন। তাছাড়া এমনটি করলে তিনি খলীফায়ে রাশেদও হতে পারতেননা।

২১. কাফিরকে চিকিৎসা সাহায্য করা

প্রশ্নঃ একজন মুমিন কি একজন কাফিরকে চিকিৎসার প্রয়োজনে রক্তদান করতে পারে? এমনটি কি শরীয়ত অনুযায়ী বৈধ?

জবাবঃ কাজটি অবৈধ হবার কোনো কারণ আমি দেখছি না।

২২. নাবালেগের বিয়ে

প্রশ্নঃ আমার মতে নাবালেগ বালক বালিকার বিয়ে অবৈধ। এ ব্যাপারে আপনার মত কি?

জবাবঃ কেউ যদি নিজের শরীয়ত নিজে তৈরী করে নেয় তবে তার কথা আলাদা। কিন্তু ইসলামী শরীয়তে একাজ বৈধ। কুরআনে হাকীমে এই স্পষ্ট বিধান রয়েছে যে, যেসব নারীর এখনো মাসিক আরম্ভ হয়নি সেসব নাবালেগ বালিকারা এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং একথা সুস্পষ্ট যে, বিয়ে ব্যতীত তালাক এবং তালাকে ইদ্দতের প্রশ্নই ওঠে না। কেউ যদি কুরআন হাদীসের বিধান থেকে মুক্ত হয়ে বলেঃ "আমার মত এরূপ এরূপ" তবে এটা মুসলমানের কাজ নয়।

২৩. ইমামত এবং বিদ্রোহ

প্রশ্নঃ হাদীসে আছে যতোক্ষণ পর্যন্ত বারোজন খলীফা না হবে ততোক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদের রাষ্ট্রের শক্তি খর্ব হবে না। এবং যে ব্যক্তি মুসলমান সুলতানের আনুগত্য পরিহার করে মৃত্যুবরণ করে তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়াতের মৃত্যু। প্রমাণসহ এসব হাদীসের জবাব দিন।

জবাবঃ প্রশ্নকর্তা সম্ভবত আব্বাসী সাহেবের মতের অনুসারী। এসব হাদীস থেকে তিনি প্রমাণ করতে চান যে, হযরত হুসাইন (রাঃ) আনুগত্য পরিহার করে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করেছেন। আর উমাইয়া খলীফারা ছিলেন বড় নেককার। প্রকৃতপক্ষে হযরত আলী (রাঃ) এবং আহলে বাইয়াতের প্রতি অতি ভক্তির ফলে যেমন একটি ফিৎনা সৃষ্টি হয়েছিল তেমনি আরেকটি ফিৎনা সৃষ্টি হয়েছিল রাফেজীদের জিদের ফলে, যাতে হযরত আলী (রাঃ) এবং আমীর মুয়াবীয়া (রাঃ) কে একই অবস্থানে দাঁড় করানো হয়েছে।

উমাইয়া খলীফাদের সর্বোত্তম খলীফা গণ্য করা হয়, ইয়াযিদকে গণ্য করা হয় সৎ এবং হযরত হুসাইন (রাঃ) কে বিদ্রোহী। এসব লোক একদিকে নিজেদের কুমতলব সাধণের জন্যে কিছু হাদীসকে করে সম্পূর্ণ উপেক্ষা। সকল উমাইয়া খলীফা সৎ, খোদাভীরু এবং সঠিক পথের অনুসারী ছিলেন একথা মোটেও ঠিকনয়। ইসলামী ফিকায় খুলাফায়ে রাশেদীন এবং উমর ইবনে আব্দুল আযীযের শাসনামলের সিদ্ধান্তসমূহকেই উদাহরণ (আদর্শ) হিসাবে পেশ করা হয়েছে, অন্যদের নয়। ফকীহগণের মতে উমাইয়া খলীফাদের স্ট্যান্ডার্ড ইসলামী খলীফার স্ট্যান্ডার্ডের চাইতে অনেক নিম্নে। তাছাড়া উমাইয়াদের গোটা কর্মকান্ড ইতিহাসে বর্তমান রয়েছে? বিনা কারণে তাদের সকলকে সৎ ও খোদাভীরু বানানোর কি প্রয়োজন রয়েছে। বাদশাহর আনুগত্য পরিহার না করার অর্থ এই নয় যে, মুসলমানদের রাষ্ট্র বিগড়ে যাবে আর আপনি চুপকরে বসে থাকবেন। আপনার কথার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আপনি নিজেই নিজের উপর সেই অপবাদ চাপাচ্ছেন যা পশ্চিমারা আপনার উপর চাপিয়েছে। আর তাহচ্ছে এই যে, মুসলমানদের রাষ্ট্র বদলে গেলেও তা ঠিক করার অধিকার মুসলমানদের নেই।

ইমাম আবু হানীফা হাদীসের এই তাৎপর্য গ্রহণ করেছেন যে, ভাংগন প্রতিরোধে শক্তি না থাকলে সবর করো। কিন্তু পূর্ণগঠনের শক্তি থাকলে চুপ করে বসে থাকাটা গুণাহ। দুস্কৃতি ও বিপর্যয় শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করার কথাও হাদীসে রয়েছে। সেই শক্তি না থাকলে মৌখিক বিরোধীতা এবং তাও সম্ভব না হলে মনে মনে ঘৃণা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেবল এমতাবস্থায় নীরতা অবলম্বন করার বিধান মুসলমানদের জন্যে রয়েছে যখন একটি সৎ রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার শক্তি তার থাকবে না। অন্যথায় নীরবতা অবলম্বন করা হবে গুণাহের কাজ।

হাদীসের অবশিষ্ট বিষয় বস্তুর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, একাধারে বারো জন খলীফার খিলাফতকাল পর্যন্ত মুসলমানদের বিজয় অক্ষুণ্ন থাকবে। আর বনি উমাইয়াদের খিলাফতকালে এই হাদীসের বাস্তবতা প্রকাশ হয়। তাদের আমলে দ্বাদশতম খলীফার খেলাফতকাল পর্যন্ত গোটা দুনিয়ার মুসলমানদের একটি মাত্র রাষ্ট্র ছিল, পৃথিবীর কোনো শক্তি যার সামনে মাথা উঠাবার সাহস করেনি। কিন্তু তার খিলাফতকালের পরে মুসলিম সাম্রাজ্যে দু'টি বাদশাহী কায়েম হয়। অতপর

তার সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর এখান থেকেই খর্ব হতে শুরু করে মুসলমানদের শক্তি।

২৪. মান্নত করা

প্রশ্নঃ কেউ যদি তার কোনো কাজের জন্যে মান্নত করে। অতপর সে মান্নত পূরণ করতে না পারে, তবে সে কি করবে?

জবাবঃ মান্নত করার সময়েই একথার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে যে, মান্নত সে পরিমাণে করবে যা পরিশোধ করা সম্ভব। শেষোক্ত অবস্থায় যতোটা পরিশোধ করা সম্ভব তা পরিশোধ করে দেবে এবং বাকীটার জন্যে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইবে।[১]

২৫. সৎ পিতামাতার সংগে সন্তানরাও কি জান্নাতে যাবে?

প্রশ্নঃ পরকালে বাপ মা যদি জান্নাতের অধিকারী হন, তাহলে তাদের সন্তানরাও কি জান্নাতে তাদের সংগী হবে? তাদের সন্তানরা যদি মুশরিক এবং বিদআতপন্থী হয়–তবু? বর্তমানে এমন অসংখ্য মুসলমান পরিবার আছে, যেখানে বাপ মা এবং সন্তানদের মধ্যে আকীদা বিশ্বাস ও ধ্যান ধারণাগত মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

জবাবঃ জান্নাত তো সেই সব লোকদের জন্যে, যারা এক আল্লাহ এবং তার রাসূলদের স্বীকার করেন এবং নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়তকে কার্যকর করেন। সুতরাং নেক বাপ মার সাথে তাদের ঐসব সন্তানরাই জান্নাতে যাবে, যারা হয়তো নাবালেগ অবস্থায় পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে কিংবা, বালেগ হবার পর সিরাতুল মুস্তাকীম অবলম্বন করেছে এবং এর উপর অটল অবিচল থেকে ওফাত লাভ করেছে।

কুরআন করীম থেকে একথা জানা যায় যে, পিতা মাতা যদি জান্নাতে উঁচু দরজা লাভ করেন, তবে তাদের যেসব সন্তান জান্নাতে নিম্ন দরজা লাভ করবে, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা নিজ মেহেরবানীতে পিতামাতার সাথে উঁচু দরজায়

---

১. সাপ্তাহিক এশিয়া লাহোর ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৬২ ইং।

একত্র করে দেবেন। কিন্তু কোনো দোযখবাসীকে বেহেশতবাসীর খাতিরে বেহেশতে প্রবেশ করানোর সম্ভাবনা নেই।

২৬. অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের প্রসংগ

প্রশ্নঃ অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেদের যে জান্নাতবাসীদের খাদিম বানানো হবে তা তো কুরআন থেকেই প্রমাণিত। কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের ব্যাপারে কি ফায়সালা হবে? তাদেরকেও কি বেহশতবাসীদের খাদিমা বানানো হবে?

জবাবঃ তাদের সম্পর্কে কুরআন হাদীস থেকে কোনো কথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত নেই। সম্ভবত তাদেরকে হুর বানিয়ে দেয়া হবে, কিংবা অন্য কোনো ফায়সালা হবে। এব্যাপারে সঠিক জ্ঞান আল্লাহর কাছেই রয়েছে।

২৭. গিলমান প্রসংগ

প্রশ্নঃ জান্নাতের গিলমানদের (সেবক) সম্পর্কে আপনি যে ধারণা পেশ করেছেন, তাহলো, শিশুরাই জান্নাতে গিলমান হিসেবে হাযির হবে। অথচ প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় শিশুরা অধিকতর নিষ্পাপ হয়ে থাকে। তাদের চাইতে কম মর্যাদার লোকদের পক্ষে তাদের সেবা পাওয়াটা কি করে সঠিক হতে পারে?

জবাবঃ নিষ্পাপ হওয়া এক জিনিস আর বুঝবুদ্ধি ও জ্ঞান লাভ করার পর স্বীয় ইচ্ছাকে অনুগত করে নেক পথে চলা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। শিশুরা যেহেতু এতোটা বুঝ ও চেতনা লাভ করেনা যাতে বুঝে শুনে সৎ বা অসৎ কাজ করতে পারে, তাই প্রকৃত অর্থে তাদের সব ধরনের কাজই এক রকম।

নিষ্পাপ হবার ভিত্তিতে লোকেরা বেহেশতে প্রবেশ করবেনা, বরঞ্চ সত্যদ্বীনের পথে চলার জন্যে প্রাণান্তকর চেষ্টা সাধনা চালানোর কারণে তারা এই পুরস্কার লাভ করবে। এ কারণে ঐ শিশুদের তুলনায় তাদের মর্যাদা হবে অনেক উপরে।

২৮. বেহেশতবাসীদের বয়স

প্রশ্নঃ বেহেশতবাসীদের বয়স কি সেটাই হবে যে বয়সে তারা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিল? নাকি তাদের যুবক বানিয়ে দেয়া হবে?

জবাবঃ এ প্রশ্নটি ঠিক সেরকম, যেমনটি একবার নবী করীম (সা)কে এক বৃদ্ধা প্রশ্ন করেছিলেন। তার প্রশ্নের জবাবে নবী করীম (সা) বলেছিলেনঃ 'জান্নাতে তো কেবল যুবতীদেরই প্রবেশ করানো হবে।'

অর্থাৎ–যেসব নেককার পৃথিবী থেকে বৃদ্ধাবস্থায় বিদায় নেন, পরকালে আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পূর্ণ নওজোয়ান করে দেবেন। আর এ যৌবনের মধ্যে থাকবে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য। তাদের FEATURES থাকবে অবিকল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা নিজ মেহেরবানীতে তাদের দান করবেন সীমাহীন রূপ সৌন্দর্য।।[১]

২৯. আয়ের উপর যাকাত

প্রশ্নঃ এক ব্যক্তির বেতন এক হাজার টাকা কিংবা যাকাতের নির্দিষ্ট নেসাব থেকে বেশী। এ ব্যক্তির জন্যে যাকাত দেয়া ফরয কি? যাকাতের জন্যে তো অর্থ সম্পদ সঞ্চিত হওয়া শর্ত।

জবাবঃ আয়ের উপর যাকাত দেয়া ফরয নয়। বেতন এক হাজার হোক কিংবা তার চাইতে বেশী। প্রতি মাসে যদি তা খরচ হতে থাকে এবং বৎসরের শেষে গিয়ে যাকাতের নেসাব পরিমাণ অর্থ বর্তমান না থাকে, তবে যাকাত ফরয হবেনা।

৩০. পারিবারিক আইন

প্রশ্নঃ পারিবারিক আইন প্রসংগে কোনো কোনো লোক বলেন, "দ্বিতীয় বিয়ের জন্যে সাধারণ অনুমতি রয়েছে" মোল্লাদের এই ব্যাখ্যা মানতে আমরা প্রস্তুত নই। "আমাদের মতে এই অনুমতির সাথে ইনসাফের শর্ত যুক্ত রয়েছে। ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম না হলে দ্বিতীয় বিয়ে বৈধ নয়।" আজকাল পত্র পত্রিকায় এই মত ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছেঃ যেহেতু ইনসাফ করা সম্ভব নয় সে জন্যে দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি নেই।

জবাব ঃ অবস্থা হচ্ছে এই যে, উর্দু এবং ইংরেজী পত্রিকায় ভিন্ন ভিন্ন নীতি অবলম্বন করা হয়েছে। উর্দু পত্রিকাগুলোতে উভয় মত আসছে। অথচ ইংরেজী পত্রিকাগুলোতে যথা সম্ভব একমুখী বক্তব্যই উপস্থাপন করা হচ্ছে। তাদের দাবী

---

১. এশিয়া, লাহোরঃ ১৮ এপ্রিল ১৯৬৮ ঈসায়ী।

হচ্ছে গণতন্ত্রের। কিন্তু তাদের দৃষ্টি মোল্লাদের চাইতেও অধিক সংকীর্ণ। তাদের সংকীর্ণতা এতোই নিকৃষ্ট যে, অপর পক্ষের মতামত তারা প্রকাশ হতেই দেয়না। এধরনের কর্মনীতির পরিণতি উর্দূ পত্রিকা পাঠক এবং ইংরেজী পত্রিকা পাঠকদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়ে দেয়া ছাড়া আর কি হতে পারে। এর অশুভ পরিণতি জাতিকেও ভুগতে হবে এবং এই লোকদেরও ভুগতে হবে। এই চিন্তা ও মানসিক অনৈক্য সাংঘাতিক ক্ষতির কারণ হবে। অথচ উভয় দিক জনগণের সামনে তুলে ধরা হলে একটি অভিন্ন দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি হতে পারতো এবং লোকেরা বুঝতে পারতো অপর পক্ষের মত কোন্ ধরনের যুক্তি প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত।

যারা আপনার পেশকৃত উপরোক্ত দলিল পেশ করে তাদের একথাটা চিন্তা করা উচিত যে, কুরআন স্পষ্ট বলে দিয়েছে, তোমরা একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারো। এখন কেউ যদি বলে 'কুরআন অপর স্থানে বলেছে, তোমরা স্ত্রীদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবেনা। একারণে একাধিক বিয়ে করতে পারবেনা।' তাহলে তার একথার অর্থ এই দাঁড়াবে যে, নাউযুবিল্লাহ আল্লাহ তাআলা নিজের বক্তব্য সাজিয়ে বলতে পারেননি। প্রকৃত কথা হচ্ছে এই যে, কুরআনের যে স্থানে বলা হয়েছে, তোমরা স্ত্রীদের মধ্যে ইনসাফ করতে পারবেনা সেখানে তো মনের অবস্থার কথা বলা হয়েছে এবং ভালবাসার ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। দাবী তো মনের ভিতরের অর্থ্যাৎ ভালবাসার সাম্য রক্ষা করার নয় বরঞ্চ, আচরণের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করাই প্রকৃত দাবী। দুঃখ হচ্ছে এলোকগুলো যেমন মুর্খ তেমনি হঠকারী।

৩১. রাসূলুল্লাহর (সা) মতো নবী

প্রশ্নঃ আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মতো নবী পয়দা করতে পারেন কি? কেউ কেউ বলে, আল্লাহ তা করতে পারেননা।

জবাবঃ যেখানে আল্লাহ পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর (সাঃ) পর আর কোনো নবী আসবেননা। সেখানেই তো একাহিনী সমাপ্ত হয়ে গেছে। এনিয়ে আর তর্ক বাহাসের কি প্রয়োজন? যারা এধরনের তর্ক বাহাসকে আলোচ্য বিষয় বানিয়ে ঝগড়া বিবাদ শুরু করে দিয়েছে, তাদের ভেবে দেখা উচিত, এখন মানব জাতির সম্মুখে যতো সমস্যা রয়েছে তা সবই কি সমাধান হয়ে গেছে? যার জন্যে এখন এধরনের নতুন নতুন সমস্যা উদ্ভাবন করার

প্রয়োজন পড়েছে, যেগুলোর না প্রয়োজন আছে আর না তাতে মানুষের কোনো কল্যাণ আছে?

৩২. নবীগণের (আঃ) পবিত্র জীবন

প্রশ্নঃ আপনি 'তাফহীমাত' গ্রন্থে লিখেছেন, "নবুয়্যত লাভের পূর্বে নবীগণের জীবন সাধারণ মানুষের মতোই ছিল"–এবক্তব্য দ্বারা বুঝা যায়, তারাও যেনো সেইসব গুণাহখাতায় নিমজ্জিত হতেন যাতে নিমজ্জিত হয় সাধারণ মানুষ?

জবাবঃ এ প্রশ্নটির ধরন খুবই বিস্ময়কর। একটি দীর্ঘ বিষয় বস্তু থেকে ছোট একটি বাক্যাংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে। অতপর নিজেই সেটার একটা অর্থ নির্ধারণ করে তার মধ্যে প্রশ্ন দাঁড় করেছে। সেখানে কি লেখা হয়েছে, পুরো অংশটা পড়ে দেখা উচিত ছিল। সেখানকার বক্তব্য এই যে, আল্লাহ তাআলা যে ব্যক্তিকে নবুয়্যত দান করবেন তার প্রশিক্ষণ এভাবেই দিয়ে থাকেন। কিন্তু সে ব্যক্তি জানেননা যে তাকে নবুয়্যত দান করা হবে। এরূপ না হলে মিথ্যা নবী এবং সত্য নবীদের মধ্যে কোনো পার্থক্য হত না। মিথ্যা নবুয়্যতের দাবীদারেরা প্রথমত প্রেক্ষাপট তৈরী করে। অনুকূল ময়দান সৃষ্টি করে। কিন্তু সত্য নবীগণ নবুয়্যত লাভের পূর্বে জানতেনই না যে, তাদের নবী বানানো হবে। প্রেক্ষাপট তৈরী করা তো দূরেরই কথা।

মূসা (আঃ) প্রথম থেকেই নবী হবার বিষয়ে কিছুই জানতেন না। হঠাৎ তূর পাহাড়ে ঘোষণা করা হলোঃ তুমি নবী। স্বয়ং নবী করীম (সা) সম্পর্কে কুরআন মজীদে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছেঃ কিতাব এবং ঈমান কি জিনিস তা তুমি জানতেনা। মেহেরবানী করে কুরআন পড়ুন, বুঝার চেষ্টা করুন এবং বিবেক বুদ্ধি খাটিয়ে প্রতিটি কাজ করুন।

৩৩. রাসূলুল্লাহর (সা) ছবি ও প্রতিকৃতি

প্রশ্নঃ কোনো অমুসলিম পত্রিকায় যদি রাসূলুল্লাহর (সা) ছবি ছাপা হয়, তাহলে বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। অথচ ইরান থেকে আসা এক শীয়া ভদ্রলোকের কাছে আমি এমন কতগুলো ছবি দেখেছি যেগুলোর মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ), হযরত আলী, ফাতিমা এবং হাসান হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমের ছবি রয়েছে এবং এব্যাপারে তাদের দেশে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই।

জবাবঃ মূলত, আফগানিস্তান এবং ভারত বর্ষের আলেমগণ ছবির তীব্র বিরোধীতা করেছেন সেজন্যে এ দু'দেশে এই ফিতনা সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু কোনো কোনো মুসলিম দেশে ছবির বিষয়ে কড়াকড়ি করা হয়নি। তাই ধীরে ধীরে সেসব দেশে প্রতিকৃতি তৈরী করা সাধারণ রীতিতে পরিণত হয়েছে। মিশরে দু'চার কদম পরপরই প্রতিকৃতি বসানো হয়েছে। কায়রোর রেলওয়ে স্টেশনের বর্হিভাগে ফেরাউন রা'য়মীসের স্ট্যাচু প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অথচ সকলেই জানে যে, এই ফেরাউন রা'য়মীসই হচ্ছে সে ব্যক্তি, যে মূসা (আঃ) এর সময় ডুবে মরেছিল। অথচ তারা এই নিকৃষ্ট খোদার দুশমনের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা করেছে। ইরানের অবস্থাও তদরূপ। সেখানকার দোকানসমূহে সাধারণভাবে নবী করীম (সাঃ), হযরত আলী, ফাতিমা এবং হাসান, হুসাইন (রাঃহুম) এবং অন্যান্য বুযুর্গদের ছবি টানিয়ে রাখা হয়। আমি কুয়েতে হযরত খালিদ এবং উমরের (রাঃ) ছবি টানানো অবস্থায় দেখেছি। সেখানে এখন আর নবী করীম (সাঃ) এর ছবি ঝুলানো বাকী রয়েছে।

বিগত শতাব্দীর শুরুর দিকে কোনো কোনো মুসলিম দেশের আলেমগণ ছবি ও প্রতিকৃতির ব্যাপারে যে অবহেলা প্রদর্শন করেছিল এটা তারই পরিণতি। আপনি যার কাছে এসব ছবি দেখেছেন, তাকে বুঝিয়ে দিন যে, এসব ছবি রাখা ঠিকনয় এবং এগুলোর বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিক্ষোভ প্রদর্শন করা উচিত। এদেশে এফিতনা প্রবেশ করতে দেয়া ঠিক হবে না।[১]

৩৪. পাখিদের জীবিকা

প্রশ্নঃ একজন মুমিন তার বাগানে ফলের গাছ লাগিয়ে রেখেছেন। অতপর মৌসুম এলে গাছে গাছে যখন ফলের সমারোহ দেখা দেয় তখন সকাল বিকেল ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি এসে ব্যাপকহারে ফল খেয়ে যায় এবং নষ্ট করে যায়। অর্থনৈতিক ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্যে পাখিদের ফল খাওয়া থেকে বিরত রাখা যায় কি? এব্যাপারে শরীয়তের দৃষ্টিভংগি কি?

জবাবঃ আপনি আপনার সাধ্যানুযায়ী আপনার ফল ফসল পাখিদের দ্বারা ক্ষতি হওয়া থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করবেন এব্যাপারে শরীয়তের কোনো

---

১. সাপ্তাহিক এশিয়া লাহোর ৮ অক্টোবর ১৯৬২ইং।

নিষেধাজ্ঞা নেই। তা সত্ত্বেও পাখিরা যদি ফল খেয়ে যায় তবে তা আপনার পক্ষ থেকে সদকা বলে গণ্য হবে। পাখিদের সাথে অবিরাম কঠোর আচরণ এবং তাদের ক্ষতি সাধন করা ঠিকনয়। এই জগতে আল্লাহ্‌র যতো সৃষ্টি রয়েছে সেগুলো এমনিতেই খেয়ে যায় বলে মনে করা ঠিকনয়। বরঞ্চ এর বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দ্বারা কোনো না কোনো খিদমত আন্‌জাম দিয়ে যাচ্ছেন। পাখিরা হয়তোবা ফল ফসল ধ্বংসকারী কতো পোকামাকড়ার বিনাশ সাধন করে। দেখা গেছে, চীনে পাখি ধ্বংস করার পরিণতিতে ফসলের জমি সব ধ্বংসাত্মক পোকায় ছেয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ পাখিরা যে পরিমাণ ফসল খেত, তার চাইতে হাজার গুণ বেশী ধ্বংস করেছে পোকা। তখন চীনবাসী বুঝতে পারলো, পাখিদের মধ্যে কি কল্যাণ রয়েছে।

৩৫. খোদায়ী ইনাসফ ঃ

প্রশ্নঃ দারসে হাদীস দানকালে আপনি বলেছিলেন, পথে কাঁটা সরিয়ে দেয়ার কাজ কর্তাকে বেহেশতে নিয়ে যেতে পারবেনা। কিন্তু এর পরেই আপনি বলেছেন, নেকী এবং পাপের পাল্লা বরাবর হবার এবং নেকী সামান্য কিছু বেশী হবার কারণে মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে। আপনি একটি হাদীসের ঘটনাও বলেছিলেন, একজন পাপী নারী কুকুরকে পানি পান করানোর কারণে জান্নাতে প্রবেশ করেছে। মেহেরবানী করে একথাটি আরো স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিন যে, একজন পাপী নারীর নেকী এবং তার পাপের পাল্লা কি করে সমান হতে পারে?

জবাবঃ একজন পাপী নারীও মুমিন হতে পারে। নামাযী হতে পারে। রোযা আদায়কারী হতে পারে এবং অন্য সকল ভাল ও কল্যাণের কাজ করে থাকতে পারে। কারো মুমিন হওয়ার অর্থ এই নয় যে তার দ্বারা কোনো গুণাহ্ বা কবিরা গুনাহ হবেনা। মানুষ যেহেতু মানুষই সেহেতু তার দ্বারা ভুলত্রুটি সংঘটিত হবার অবকাশ রয়েছে। এর চাইতে কঠিনতর গুনাহ্‌ও মুমিনের দ্বারা সংঘটিত হতে পারে।

তিনি একজন পাপী মহিলা ছিলেন। একথা মনে রাখা দরকার এহাদীসের পাপী অর্থ পেশাদার গণিকা নয়। যে কোনোভাবে তার দ্বারা অশ্লীল কাজ হয়ে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও তার আমলনামায় তার নেক আমলসমূহ বর্তমান ছিলো। পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করাণোর কাজ তার নেকীর পাল্লা ভারী করে দেয়। এই হাদীস দ্বারা কেউ কেউ আল্লাহ তাআলাকে অসম দাতা ধারণা করে

নিয়েছে। অথচ ব্যাপার তা নয়। তাঁর সত্তাইতো আদল ও ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি তাঁর সৃষ্টির ব্যাপারে বিন্দুমাত্র বৈষম্য বরদাশত করেননা।

এসব হাদীসের সঠিক বিশ্লেষণ তাই, যা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে।

৩৬. সত্যের সৈনিক

প্রশ্নঃ এক ব্যক্তি বক্তৃতাও জানেননা এবং লেখতেও পারেননা। তিনি তার সাদামাটা মৌখিক ভাষা দিয়ে মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহ্বান জানান। তার ব্যাপারে আশা করা যেতে পারে কি যে, আল্লাহর দরবারে সত্যের সৈনিক হিসাবে তার নাম লেখা হবে? মেহেরবাণী করে এসম্পর্কেও আলোকপাত করুন যে, অনৈসলামী সমাজ ব্যবস্থার স্থলে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিহত হলে শাহাদাতের মর্যাদা পাওয়া যাবে কি?

জবাবঃ কেউ যখন অনৈসলামী সমাজ পরিবর্তন করে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার কাজে জান প্রাণ দিয়ে চেষ্টা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করে এবং এপথে জীবন দিয়ে দেয়, তখন এরই নাম হয় "শাহাদাত"। সে কতোটা লেখা পড়া এবং বক্তৃতা জানে তার কোনো গুরুত্ব আল্লাহর কাছে নেই। আকর্ষণীয় বক্তৃতা এবং লেখনীর প্রভাবের ভিত্তিতে কাউকেও পুরস্কৃত করা হবেনা। আল্লাহতো শুধু এটাই দেখবেন যে, কোন্ ব্যক্তি তার যোগ্যতার সীমানুযায়ী আল্লাহর পথে কতোটা চেষ্টা সংগ্রাম করেছে এবং আল্লাহর কালেমাকে বিজয়ী করার জন্যে তার জান, মাল, সময় ও শ্রমকে কতটা আগ্রহ ও আন্তরিকতার সাথে কাজে লাগিয়েছে। এই আগ্রহ ও আন্তরিকতাই আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহ লাভের উপায়।

৩৭. রুক্ষতা এবং গাম্ভীর্যতার পার্থক্য

প্রশ্নঃ রুক্ষতা এবং গাম্ভীর্যতার মধ্যে পার্থক্য কি? অধিকাংশ লোকই এ দু'টোর পার্থক্য বুঝে না এবং তা রক্ষাও করে না।

জবাবঃ একেবারে মেপে ঝুপে এ দু'টোর মধ্যে পার্থক্য করা যায় না। গাম্ভীর্যবান ব্যক্তি স্পষ্টভাষী। ঠাট্টা মশকরা করে না। কিন্তু কারো সাথে মিলিত হলে তার চেহারা থেকে আনন্দ ও প্রফুল্লতা উদ্ভাসিত হয়। তিনি অত্যন্ত ভদ্রতা ও মর্যাদার সাথে সাক্ষাত প্রার্থীর সাথে মিলিত হন। পক্ষান্তরে রুক্ষ ব্যক্তি হচ্ছে

সে, যার চেহারার প্রতি তাকালে অসন্তুষ্টি এবং অনিচ্ছা ভাব অনুমিত হয়। সাক্ষাত প্রার্থী সহসাই বুঝতে পারে আমার আগমনে তিনি সন্তুষ্ট হননি।

৩৮. ইসালে সওয়াব প্রসংগ

প্রশ্নঃ কোনো গুনাহ্‌গার ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীরা যদি তার নামে দান খয়রাত করে, তবে তার দ্বারা মৃত ব্যক্তি সওয়াব লাভ করবে কি? লাভ করলে কি পরিমাণ লাভ করবে? উত্তরাধিকারীদের একাজ দ্বারা জাহান্নামী ব্যক্তি জান্নাতী হতে পারে কি?

জবাবঃ বেহেশত দোযখ তো আল্লাহর হাতে। যাকে ইচ্ছা তিনি জান্নাতে পাঠাবেন আর যাকে ইচ্ছা নিক্ষেপ করবেন জাহান্নামে। তবে, এব্যাপারে আমাদের যে হিদায়াত দেয়া হয়েছে তার থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, মৃতদের জন্যেও আমরা নেক কাজ করতে পারি। তাদের জন্যে আমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারি। নিজেদের কোনো নেক কাজ তাদের নামে করতে পারি। কিন্তু এর সওয়াব তাদের পর্যন্ত পৌছাটা সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। মৃত ব্যক্তি যদি সওয়াব লাভের উপযুক্ত হয় তবে আল্লাহ তাআলা তার খুশী ও আরামের জন্যে এই সওয়াব তার পর্যন্ত পৌছে দেবেন।

পক্ষান্তরে মৃত ব্যক্তি যদি হয় আল্লাহর অভিশপ্ত, অপছন্দনীয় তবে এ সওয়াব তার নিকট পৌছবেনা।

আমরা যেহেতু জানিনা, কোন্ ব্যক্তি আল্লাহর প্রিয় আর কোন্ ব্যক্তি আল্লাহর অভিশপ্ত, সেজন্যে আমরা এমন ধরনের মৃত লোকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা এবং সওয়াব পৌছানোর কাজ করতে পারি, যারা পরিষ্কারভাবে আল্লাহ, রাসূল এবং আখিরাত অস্বীকার করেনি এবং ইসলামের মৌলিক জিনিসগুলো মানতো এবং স্বীকার করতো।

৩৯. খৃষ্টানদের ভিত্তিহীন বর্ণনা

প্রশ্নঃ জনৈক হাজী সাহেব পবিত্র স্থানসমূহের আলোচনা প্রসংগে বলেছেন, তিনি বায়তুল মাকদাসে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ভাই বোনদের কবর দেখেছেন। সত্যই কি হযরত ঈসা (আঃ) এর ভাইবোন ছিল? থেকে থাকলে

তারাও কি পয়গম্বর ছিলেন? হযরত মরিয়ম কি পরবর্তীকালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন?

জবাবঃ এগুলো খৃষ্টানদের ভিত্তিহীন বর্ণনা (কিংবদন্তি)। এগুলোর কোনো প্রমাণ নেই। সে অঞ্চলে তো আপনি একই ব্যক্তির একাধিক কবর দেখতে পাবেন। এযুগের মতো সেযুগেও কবর এক ধরনের লোকদের আয় রোজগারের মাধ্যম ছিল। তাই যেখানেই তারা কবরের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে, নিজেদের পক্ষ হতে সেখানেই জনগণের সামনে কবর উপস্থাপন করে। হযরত ঈসা (আঃ) এর ভাই বোনদের কবরের ব্যাপাটরটাও তাই

৪০. বিয়ের সুন্নত

প্রশ্নঃ বৃদ্ধ মায়ের সেবা করার উদ্দেশ্যে কেউ যদি বিয়ে না করে এবং মাও যদি বিয়েতে রাজী না হয় তবে এ ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কি? আমার বয়স এখন ত্রিশ বছর। আপনার "পর্দা ও ইসলাম" বই পড়ার পর বিয়ের গুরুত্ব অনুভব করছি। উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে আমার সম্পর্কে আপনার রায় কি?

জবাবঃ বিয়ে করা ফরয নয় বটে, তবে তা সুন্নত এবং গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত। বিয়ে না করার ফলে অনেক অনিষ্টের সৃষ্টি হয়। মা বৃদ্ধ হলে তার খেদমত করা আপনার জন্যে ফরয। কিন্তু কেবলমাত্র একারণেই বিয়ে না করাটা ঠিকনয়। বিয়ের পর অধিকতর ভালভাবে মায়ের সেবা করা যায়।

৪১. দারুল কুফর এবং দারুল ইসলামের পার্থক্য

প্রশ্নঃ নবী আলাইহিসসালামগণের যে সব স্ত্রী তাদের পক্ষে কল্যাণের পরিবর্তে ক্ষতিকর প্রমাণিত হচ্ছিল, আল্লাহ তাআলা কেন তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ দিলেন না?

জবাবঃ প্রতিটি কথার জবাব দেয়ার যিম্মাদার আমি নই। কেন আল্লাহ তাদের এরূপ নির্দেশ দিলেন না তাতো তিনিই ভাল জানেন। তবে একটি নীতিগত কথা জেনে নিন যে, কিছু বিধান এমন রয়েছে যা কেবল দারুল ইসলামেই কার্যকর করা জরুরী। দারুল কুফরে সেগুলো কার্যকর করা যেতে পারেনা। কুরআন মজীদে যখন এবিধান নাযিল হয়েছিল যে, কোনে কাফির নারী মুসলমানের স্ত্রী থাকতে পারবেনা, তখন সেটা ছিল মদীনায় একটি প্রতিষ্ঠিত

ইসলামী সমাজ। এবিধান মক্কায় দেয়া হয়নি। দারুল কুফরে এমন কিছু বাধ্য বাধকতার অবস্থা থাকে যার ফলে সেখানে শরীয়তের কোনো কোনো বিধান কার্যকর করা যায়না। মক্কা মোয়াযযামায় নবী করীম (সাঃ) এর নবুয়্যত লাভ এবং ইসলামের দাওয়াত প্রসারের পর এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, একই ঘরে স্বামী মুসলমান হয়ে গিয়েছিল আর স্ত্রী কাফিরই থেকে গিয়েছিল। কিংবা সন্তান মুসলমান হয়ে গিয়েছিল আর পিতামাতা থেকে গিয়েছিল কাফির। এমতাবস্থায় সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ দেয়া হলে গোটা সমাজ জীবন চূর্নবিচূর্ণ হয়ে যেতো। তাই মদীনায় একটি মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্ব পর্যন্ত এবিধান মূলতবী রাখা হয়েছিল। আর যেহেতু হযরত নূহ (আঃ) এবং লূত (আঃ) এর যামানায় তাদের জনপদে দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সে কারণে তাদের প্রতি এবিধান নাযিলের অবকাশও আসেনি।

৪২. হযরত ঈসা (আঃ) এর জন্ম

প্রশ্নঃ খৃষ্টানরা কুরআনের আয়াত দ্বারা হযরত ঈসা (আঃ) এর খোদার পুত্র হবার দলিল পেশ করে। তারা বলে স্বয়ং আল্লাহ কুরআন করীমে বলেছেন, আমি মরিয়মের মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দিয়েছি যদ্বারা হযরত ঈসা (আঃ) এর জন্ম হয়েছে। মেহেরবানী করে এ সংশয়টা দূরীভূত করবেন।

জবাবঃ একথা কেবল হযরত ঈসা (আঃ) এর ব্যাপারেই বলা হয়নি। বরঞ্চ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে হযরত আদম (আঃ) এবং সকল মানুষের ব্যাপারেও একই কথা বলা হয়েছে। "আমার রূহ" এর অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ তাআলা নিজের সত্তা থেকে কোনো রূহ বের করে অন্যদের দেহে ফুঁকে দিয়েছেন। বরঞ্চ এর অর্থ হলো আমার, পক্ষ থেকে এবং আমার ইচ্ছায় একটি রূহ প্রবেশ করিয়ে দিয়েছি। হযরত ঈসা (আঃ) এর জন্ম প্রসংগে একথাই বলা হয়েছে। পার্থক্য কেবল এতোটুকু যে, তাঁর জন্মকে একটি অস্বাভাবিক রূপ দান করা হয়েছে।

৪৩. জুমার নামায এবং ব্যবসা

প্রশ্নঃ জুমার দিনে ব্যবসা সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি? এ দিনে ব্যবসা করা কি হারাম?

জবাবঃ আপনি যখন জু'মার প্রথম আযান শুনবেন তখনই তাতে শরীক হবার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করবেন। খুতবার আযানের সাথে সাথেই

ব্যবসায়ের কাজ বন্ধ করে দিবেন এবং খুতবায় শরীক হয়ে যাবেন। খুতবার আযানের সাথে সাথেই ব্যবসার অবৈধতা কার্যকর হয় এবং নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত তা বলবত থাকে। এরপর আপনি যথারীতি আপনার ব্যবসা বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

৪৪. নেক নিয়্যতের পুরস্কার

প্রশ্নঃ শাবান মাসের পনের তারিখের পর যারা রোযা রাখে তারা কি সওয়াব পাবেনা?

জবাবঃ সওয়াব পাওয়া না পাওয়ার মানদন্ড হচ্ছে এই যে, কাজটি আল্লাহর বিধানের আনুগত্যের ভিত্তিতে করা হলো, না কি নাফরমানীর ভিত্তিতে? কোনো কাজ, কাজ হিসেবে গুনাহ কিংবা সওয়াবের বাহন নয়, বরঞ্চ নিয়্যত (উদ্দেশ্য) এবং কর্মনীতিই সেটাকে সওয়াব কিংবা গুনাহের বাহন বানিয়ে দেয়। যখন নবী করীম (সাঃ) শাবানের শেষ পনের দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন তখন সে সময় রোযা রাখার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার অর্থ কি? নফল হিসাবে এপন্থায় সে সময় রোযা রাখা যেতে পারে, যখন কোনো ব্যক্তি প্রত্যেক মাসে নির্দিষ্ট কয়দিন রোযা রাখার ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং সে নির্দিষ্ট কয়েক তারিখের মধ্যে শাবান মাসের শেষ পক্ষেরও দু'একদিন পড়ে যায়।

৪৫. নফল নামায জামায়াতে পড়া

প্রশ্নঃ কোনো কোনো মসজিদে মে'রাজ উপলক্ষে নফল নামায জামায়াতে পড়া হয়। শরীয়তে দৃষ্টিতে একাজ কি বৈধ?

জবাবঃ আসলে কিছু লোক মনে করছে শরীয়ত অপূর্ণাঙ্গ রয়ে গেছে। এখন তা পূর্ণাঙ্গ করার দায়িত্ব তাদের পালন করতে হবে। নবী করীম (সাঃ) এতোটা সতর্কতার সাথে শরীয়তের অনুবর্তন করেছেন যে, নামায পড়ানোর পর তিনি মুসল্লীদের দিকে ফিরে বসতেন, যাতে করে কেবলামুখী হয়ে বসে থাকাকে লোকেরা নামাযের অবস্থা মনে না করে বসে। কিন্তু এখন তার রেখে যাওয়া সেই শরীয়তের অনুসারীদের অবস্থা হচ্ছে এই যে; তারা নামাযের পূর্বে ও পরে নতুন নতুন জিনিস আকীদা ও আমল হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছে। নফল তো এই জন্যেই পড়া হয়, যাতে করে বান্দা একান্ত নির্জনে নিজের আরযী নিয়ে মনিবের দরবারে হাযিরা দিতে পারে। এখন তাও যদি জামায়াতে আদায় করা শুরু হয়,

তাহলে তো তার উপকারিতাই খতম হয়ে যাবে। অবশ্য তারাবী নামায জামায়াতে পড়া বৈধ।

৪৬. হাদীস কাকে বলে?

প্রশ্নঃ বহু সংখ্যক হাদীস থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে, সেগুলো হুবহু রাসূলে করীমের (সাঃ) মুখনিসৃত শব্দ এবং বাক্য নয়, বরঞ্চ কোনো সাহাবী কোনো ঘটনা কিংবা নবী করীমের (সাঃ) কোনো বাণীকে নিজ ভাষায় বর্ণনা করছেন। এসব বর্ণনাকে হাদীস বলা কতোটা সঠিক?

জবাবঃ নবী করীমের (সাঃ) বাণীকে হুবহু তার ভাষায় বর্ণনা করাকেই শুধুমাত্র হাদীস বলা হয়না। কোনো সাহাবী যদি বর্ণনা করেন যে, নবী করীমের (সাঃ) আমল এরূপ ছিল, নবী করীম (সাঃ) অমুক জিনিস নিষেধ করেছেন, নবী করীম (সাঃ) অমুক কথার নির্দেশ দিয়েছেন, নবী করীম (সাঃ) এর অভ্যাস এরূপ ছিল, বিভিন্ন বিষয়ে নবী করীম (সাঃ) এরূপ নীতি অবলম্বন করতেন, তবে এসবগুলো কথাকেই হাদীস বলা হবে।

৪৭. অজ্ঞতা প্রসূত কথাবার্তা

প্রশ্নঃ আমি আপনার গ্রন্থাবলী পড়েছি। আপনার লেখা খুবই যথার্থ। তবে একটি ব্যাপারে আমার খটকা লেগেছে। তা হচ্ছে, আপনি ওহাবী আকীদা পোষণ করেন। আপনি এ আকীদা বর্জন করলে, এদেশে দ্রুত ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে।

জবাবঃ ওহাবী যে কি জিনিস আজ পর্যন্ত আমি তা জানতে পারলামনা। বিগত শতাব্দীতে কিছু নেক চরিত্রের মুসলমান ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন এবং ইসলামী সমাজ থেকে তাদের আধিপত্য নির্মূল করতে চেয়েছিলেন। ইংরেজরা তাদের মোকাবিলা করতে গিয়ে, সুকৌশলে তাদের বিরুদ্ধে 'ওহাবী' পরিভাষাটি চালু করে সাধারণ অজ্ঞ মুসলমানদের তাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে। ফলশ্রুতিতে অসংখ্য গালির মধ্যে 'ওহাবী'ও একটা গালিতে পরিণত হয়। এই অর্থহীন বাজে শব্দটি অপরের ঘাড়ে চাপানো কোনো শিক্ষিত জ্ঞানী লোকের কাজ হতে পারেনা। আমার প্রতি ওহাবী হবার অভিযোগ যদি এ উদ্দেশ্যে করা হয় যে, আমি সাধারণ মুসলমানদের আকীদা বিশ্বাসের বিরোধী কোনো আকীদা বিশ্বাস পোষণ করি, তবে তা চিহ্নিত করা হোক এবং

আমাকে বলা হোক যে, তোমার অমুক অমুক কথা ইসলামের খেলাফ। ভিত্তিহীন রটনা এবং গুজবে কান দিয়ে কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা কোনো বুদ্ধিমান লোকের জন্যে শোভনীয় নয়।[১]

৪৮. যাকাত আদায়

প্রশ্নঃ যায়েদ একজন ধনী ব্যক্তি। তিনি বকরকে টাকা ঋণ দিয়েছেন। কিন্তু বকর এখনো তার ঋণ ফেরত দেয়নি। এখন যায়েদ যদি নিজের যাকাত কাউকে দেয়ার পরিবর্তে তা বকরের নামে ঋণ কর্তন হিসেবে লেখে রাখে এবং তা তাকে জানিয়ে দেয়। এমতাবস্থায় যায়েদের যাকাত আদায় হবে কি?

জবাবঃ এর সঠিক পন্থা হচ্ছে এই যে, যায়েদ তার যাকাতের মাল নিজের কব্জা থেকে বের করে বকরের নিকট হস্তান্তর করবে। অতপর বকর যদি ঋণ ফেরত দেয় কিংবা একথা বলে যে, আমাকে যাকাত দেয়ার পরিবর্তে আমার ঋণ থেকে তা কেটে দিন, তখনই যায়েদ তা কাটতে পারে। কিন্তু নিজের পক্ষ থেকেই ঋণ ফেরত না নিয়ে তা যাকাত হিসেবে কেটে দেয়া এবং ঋণ গ্রহীতাকে একথা জানিয়ে দেয়া যে, তোমার নেয়া ঋণটাকে আমি যাকাত বাবদ কেটে নিয়েছি, সঠিক পন্থা নয়। সঠিক পন্থা হচ্ছে এই যে, হয় বকরকেই বলতে হবে, আমাকে যাকাত না দিয়ে আমার ঋণ বাবদ তা কেটে নিন কিংবা যাকাতের টাকা বকরকে প্রদান করতে হবে, অতপর বকর তা ঋণ পরিশোধ বাবদ ফেরত দেবে।

৪৯. মহররমের মাতম ও ভয়

প্রশ্নঃ মহররমের মাস এলে আমার মধ্যে ভীতি সঞ্চার হয়। রাত্রে ঘুম আসেনা। পরীক্ষা নিকটবর্তী থাকে। কিন্তু পড়া লেখা হয়না। অথচ মাতম ইত্যাদির অনুষ্ঠান কখনো দেখতে যাইনি। তাছাড়া কেউ কখনো মাতমের প্রসংগ তুললে আমি কানে আঙ্গুল ঠেসে দিই। কিন্তু আমার ভীতি দূর হয়না। এভয় থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে কোনো পরামর্শ দিন।

জবাবঃ এর ঔষধ আপনার কাছেই রয়েছে। এটা এক প্রকার মানসিক দূর্বলতা। ছোট বেলায় বিভিন্ন প্রকার গল্প শুনে মনের মধ্যে এভয় সৃষ্টি হয়।

---

১. সাপ্তাহিক এশিয়া লাহোরঃ ২১ জানুয়ারী ১৯৬৮ ইং

সুতরাং যেহেতু এভয় অনুভূতির ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়না, তাই প্রবল ইচ্ছাশক্তি এবং দৃঢ় সংকল্পের মাধ্যমে এথেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে।

৫০. যাকাত ও সরকার

প্রশ্নঃ ইসলামী রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিক কি ব্যক্তিগতভাবে তার যাকাত পরিশোধ করবে, না কি সরকারী ব্যবস্থাপনায় তা উসূল করা হবে? যদি এটা সরকারের কাজই হয়ে থাকে তবে কেন যাকাত দাতা সরাসরি যাকাত প্রাপ্যদের মুখোমুখী হবে?

জবাবঃ যাকাত উসূলের ব্যবস্থাপনা দায়িত্ব যদিও ইসলামী সরকারের, কিন্তু তা সত্ত্বেও কয়েকটি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে, যেমন কোনো দেশে মুসলমান আছে কিন্তু ইসলামী সরকার নেই, কিংবা ইসলামী সরকার আছে কিন্তু সে এদায়িত্ব পালন করছেনা। কিংবা ইসলামী সরকারও আছে এবং এদায়িত্ব পালনের ইচ্ছাও আছে কিন্তু ব্যবস্থাপনা করতে পারছে না। এরূপ প্রতিটি অবস্থার নযীরই আমাদের ইতিহাসে আছে। এমন একটি সময় ছিল যখন রাসূলুল্লাহ (সা) ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে চেষ্টা সংগ্রাম করছিলেন, পূর্ণ রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে ওঠেনি। অতপর এমন একটি সময় এলো যখন পূর্ণ কাঠামো গড়ে ওঠে। এরপর হযরত উসমানের খেলাফত আমলে ইসলামী রাষ্ট্র এতোটা বিস্তৃত হয়েছিল যে, সরকারের পক্ষে যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা দুষ্কর হয়ে পড়ে। তখন ব্যক্তিগতভাবে যাকাত পরিশোধ করার কথা ঘোষণা করে দেযা হয়। এমন অবস্থাও হতে পারে যখন সাময়িকভাবে হলেও মুসলমানদেরকে নিজেদেরকে যাকাত নিজেদের হাতেই বন্টন করতে হতে পারে।

৫১. জুমা'র নামায ও দুই রাকাআত নফল

প্রশ্নঃ নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, শুক্রবারে তোমাদের কেউ জুমা'র নামায পড়তে এসে ঈমামকে খুতবা দিতে দেখলে সে যেনো সংক্ষিপ্ত দুই রাকাআত নফল নামায পড়ে বসে যায়। আবার কেউ কেউ বলেন, খুতবার সময় নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। শেষোক্ত বক্তব্য পূর্বোক্ত হাদীসটির খিলাফ নয় কি? মেহেরবাণী করে বিষয়টি স্পষ্ট করুন।

জবাবঃ এ বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। মতপার্থক্যের ব্যাপারে অবশ্য দলিল প্রমাণ রয়েছে।। খুতবার সময় এলেও দুই রাকাআত নফল নামায পড়াকে যারা

সঠিক বলেন, উপরোক্ত হাদীসটি তাদের দলিল। আর যারা এসময় নামাযকে সঠিক মনে করেন না, তাদের দলিল হচ্ছে নবী করীম (সাঃ)–এর নিম্নোক্ত নির্দেশ। তিনি বলেছেন, ইমাম যখন খুতবা দেয়ার জন্যে বেরিয়ে আসবেন তখন নামাযও পড়া যাবেনা কথাও বলা যাবেনা। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ইমাম খুতবা দিতে এলে খুতবা শোনাই তখনকার ইবাদত। ফকীহগণ সাধারণভাবে এবক্তব্যকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। যে ইবাদতের যে সময়, শরীয়তে সে সময় সেই ইবাদতই গুরুত্বপূর্ণ। সে সময় যদি আপনি সে ইবাদতের পরিবর্তে অন্য ইবাদত করলেন তাহলে ব্যাপারটা এমন দাঁড়ালো, যেনো আপনি নির্ধারিত ইবাদতকে ক্ষতিগ্রস্ত করলেন। একটি সময় আছে যখন আপনি মসজিদে গেলে নফল নামায পড়তে পারেন। আবার খুতবার সময় মসজিদে গেলে বা উপস্থিত থাকলে তখন খুতবাই শুনতে হবে। আবার ইমাম যখন জুমা'র নামায পড়ানোর জন্যে দাঁড়িয়ে যাবেন তখন সেই নামাযই পড়তে হবে। উপরোক্ত সময় তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ইবাদতের সময়। খুতবার সময়ের ইবাদত খুতবা শোনা। তখন যদি কেউ নামায পড়তে শুরু করে। তবে সঠিকভাবে নামায আদায় করতে পারবেনা। কারণ বার বার খুতবার আওয়ায তার কানে ঢুকতে থাকবে এবং খুতবার বক্তব্য বিষয় তাকে আকর্ষণ করতে থাকবে। আবার নামাযরত থাকার কারণে খুতবাও ভালভাবে শুনতে পারবে না।

তাছাড়া খুতবার সময় খুতবা শোনাটা সাংগঠনিক শৃংখলার দিক থেকেও যুক্তি যুক্ত এবং সঠিক। খতীব খুতবা দিচ্ছেন এবং আল্লাহর বিধান শুনাচ্ছেন। এসময় যদি সামনে বিভিন্ন স্থানে লোকেরা এদিক সেদিক থেকে এসে নামায পড়তে থাকে। তখন বক্তার সম্মুখে সভাস্থলে অবিরাম। বিশৃংখার সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় বক্তৃতা করাও কঠিন। "ইমাম খুতবা দিতে এলে নামাযও পড়া যাবে না কথাও বলা যাবে না।" হাদীসটি খুবই বাস্তব। যারা হাদসীটিকে সঠিক মনে করেন তারা খুতবার সময় নামায পড়া বৈধ মনে করেননা। যারা অপর হাদসীটিকে সঠিক মনে করেন তারা সে অনুযায়ী আমল করেন। উভয় পক্ষই নিজেদের সমর্থনে একেকটি হাদীসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছে। সুতরাং কেউ এর কোনো একটি মতের উপর আমল করলে অপর পক্ষ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা ঠিক নয়। কেননা উভয় পক্ষই দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে আমল করছে। তাই যে যে মতের উপর আমল করছে, তা তার জন্যে সঠিক। আপনি যেটাকে সঠিক মনে করেন তার উপর আমল করুন। অপর মুসলমান যদি

অপরটাকে সঠিক মনে করে সে অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদত করতে থাকে, তবে তার সাথে ঝগড়া বিবাদ করা ঠিক নয়।

৫২. রাসূলে করীমের (সাঃ) বাণী এবং অহী

প্রশ্নঃ নবী করীম (সাঃ) সকল কথাই যদি অহীর ভিত্তিতে বলে থাকেন, তবে তার খেজুর গাছের নর ও মাদীর মধ্যে জোর লাগানো সংক্রান্ত সেই বক্তব্যের ব্যাখ্যা কি? যাতে তিনি বলেছিলেন, তোমাদের দুনিয়াদারীর ব্যাপারে তোমরাই ভাল বুঝ। মেহেরবাণী করে বিষয়টি বুঝিয়ে দিন।

জবাবঃ আগেও বহুবার বলেছি, অহীর মধ্যে সেই ব্যাপক অর্থ নিহত রয়েছে, আল্লাহ তাআলা নবী করীম (সাঃ)–এর মধ্যে যে দূরদৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টির নূর দিয়েছিলেন যার আলোকে তিনি যে কোনো দ্বীনি বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন এবং তার কোনো কথাই হিদায়াতের পথ থেকে বিচ্যুত হতনা। এ প্রশ্নে যে প্রসংগটি আনা হয়েছে তা নিরেট একটি পার্থিব বিষয়। মক্কায় খেজুর গাছে জোড় লাগানোর প্রথা চালু ছিলনা। নবী করীম (সাঃ) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন তিনি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলেন, "এমনটি না করলে কি অসুবিধা হবে"? লোকেরা তার এই কথার প্রেক্ষিতে সেবছর খেজুরগাছে জোড় লাগায়নি, কিংবা সেবছর খেজুরের ফলন ভাল হয়নি। এতে করে লোকেরা পুনরায় নবী করীম (সা) এর নিকট হাযির হয় এবং ফলন কম হবার কথা আরয করে। তখন তিনি বলেছিলেন, "তোমাদের পার্থিব বিষয়ে তোমরাই ভাল বোঝ, দ্বীন সম্পর্কে আমি যদি কোনো নির্দেশ দিই তবে তোমরা সেটা পালন করবে।"

তখন পর্যন্ত সম্ভবত লোকেরা এই ধারণায় নিমজ্জিত ছিল যে, নবী করীম (সাঃ) এর প্রতিটি কথারই আনুগত্য করতে হবে, চাই সেটা দীনি হোক কিংবা দুনিয়াবী। অতপর তিনি উপরোক্ত বাণীটি দ্বারা একথা পরিষ্কার করে দিলেন যে, কি কি বিষয়ে তারা নিজেদের ইচ্ছামত চলতে পারে? পানাহার, পোষাক পরিচ্ছদ এবং চলাফেরার মধ্যে শরীয়তের সীমার ভিতর অবস্থান করে তারা কতোটা স্বাধীনতা অবলম্বন করতে পারে?

৫৩. সূরা আন নাজম ও মি'রাজ

প্রশ্নঃ সূরা আন নাজমে মি'রাজের ঘটনা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন 'وَلَقَد رَاٰهُ نَزلَةً اُخرىٰ' এখানে " نزول " শব্দের অর্থ কি? সমস্ত দৃশ্য যদি শুধু পৃথিবীতেই দেখানো হয়ে থাকে তা হলে এখানে " نزول " শব্দ ব্যবহারের কি অর্থ হতে পারে? তাছাড়া এখানে জিব্রাঈলের কথা উল্লেখ নেই। বরঞ্চ নবী করীম (সাঃ) এর সাক্ষাতের কথা উল্লেখ হয়েছে। যেমনঃ فَكَانَ قَابَ قَوسَينِ اَو اَدنىٰ ـ

জবাবঃ সম্ভবত আপনি বলতে চাচ্ছেন, নবী করীম (সাঃ) জিব্রাঈলকে নয়, বরঞ্চ স্বয়ং আল্লাহকেই দেখেছেন। কিন্তু দু'টি কারণে আপনার এই বক্তব্য মেনে নেয়া যায় না।

প্রথমত, যদি তিনি আল্লাহকেই দেখেছেন ধরে নেয়া হয় তবে, একথাও ধরে নেয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে যে, আল্লাহ তাআলার নির্দিষ্ট ধরনের দৈহিক অবয়ব রয়েছে এবং কোনো এক স্থানে তিনি আগমন করেছেন। অথচ এধরনের ধ্যান ধারণা ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের সম্পূর্ণ খেলাফ। ধর্মীয় আকীদার ভিত্তিতে কেউ যদি একথা প্রচার করে, তবে তার নিজেকেই এজন্যে আল্লাহ পাকের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এধরনের জাহিলি কথা বার্তা বলে কোনো ব্যক্তি নিজেকে আবার মুসলিম বলে দাবী করতে পারেনা।

৫৪. অমুহাররমদের কবরে যাওয়া

প্রশ্নঃ মেয়েরা কি অমুহাররম পুরুষদের কবর যিয়ারত করতে যেতে পারে?

জবাবঃ সাধারণ কবরস্থানে যেতে মহিলাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। মৃত্যুরপর মুহাররম ও অমুহাররমের বন্ধন এমনিতেই ছিন্ন হয়ে যায়।

৫৫. মহিলাদের জু'মার নামায

প্রশ্নঃ মহিলাদের জন্যে জু'মার নামায পড়া কি বৈধ?

জবাবঃ হ্যাঁ, যদি পর্দার ব্যবস্থা থাকে তবে তাদের জন্যে জু'মার নামায পড়া বৈধ। তবে, ফরয নয়। মেয়েদের জন্যে মসজিদে নামায পড়ার চাইতে নিজের ঘরে নামায পড়া উত্তম।[১]

৫৬. অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করা

প্রশ্নঃ অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের পন্থা কি?

জবাবঃ ইসলাম প্রচারের সবচাইতে কার্যকর পন্থা হচ্ছে এই যে, আপনি নিজে প্রথমে পাকা মুসলমান হউন। তাহলে লোকেরা আপনাকে দেখে বুঝতে পারবে, ইসলাম একজন লোকের মধ্যে এই এই গুণাবলী সৃষ্টি করে। সাথে সাথে আপনি তাদের ইসলামী সাহিত্য পড়তে দিন। নিরেট ইসলাম ও ইসলামী আদর্শের উপর লিখিত সাহিত্য পড়তে দিবেন। কোনো বিশেষ ফিরকার বই পড়তে দিবেননা। বিশেষ ফিরকার বই পড়তে দিলে সে দারুণ জটিলতায় পড়ে যাবে এবং কোন্ ফিরকা কবুল করবে তাই নিয়ে দ্বিধা সংশয়ে ভুগবে। তার সাথে সোজাসুজি এভাবে কথা বলবেন যে, আমরা মুসলমান। আমাদের ধর্ম ইসলাম। ইসলামই অতীতের সকল নবীর ধর্ম ছিল। ইসলামই একমাত্র ধর্ম যাতে মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের পথনির্দেশ রয়েছে।

৫৭. দারসে হাদীস এবং হাদীস অস্বীকারকারী

প্রশ্নঃ আপনি প্রত্যেক দারসে হাদীসেই, হাদীস অস্বীকারকারীদের প্রতি ইংগিত করেন। কিন্তু তাদের নাম বলেন না। তবে তারা কারা?

জবাবঃ যে ব্যক্তি বাড়ীর তিনতলার ছাদে দাঁড়িয়ে আছে এবং নীচের সবাইকে দেখতে পাচ্ছে, তাকে আবার নাম ধরে ধরে সকলের পরিচয় করিয়ে দেবার কি প্রয়োজন? কে না জানে হাদীস অস্বীকারকারী কারা?

৫৮. আপনি কি হাদীস অস্বীকার করেন?

প্রশ্নঃ জনৈক মওলানা সাহেব আপনাকে হাদীস অস্বীকারকারী বলে উল্লেখ করেছেন?

---

১. সাপ্তাহিক এশিয়া লাহোর ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৪

জবাবঃ আমার লেখা বই পুস্তক পড়ার পর, আমার দারস শুনার পর এবং আমার মত ও পথ সম্পর্কে অবগত থাকার পরও কেউ যদি আমাকে হাদীস অস্বীকারকারী বলে, তবে তার কী ঔষধ আমার কাছে আছে? যারা আমার বিরুদ্ধে এই অপবাদ রটিয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে।

৫৯. বুখারী, মুসলিম এবং ইজমায়ে উম্মাত

প্রশ্নঃ বুখারী ও মুসলিমের হাদীসসমূহ সঠিক হবার ব্যাপারে উম্মাতের ঐক্যমত হয়েছে। কিন্তু আপনি সেগুলো বিশুদ্ধ হবার ব্যাপারটাকে শর্ত সাপেক্ষ বলেছেন।

জবাবঃ হাদীসকে সহীহ বলার অর্থ কেবল এতোটুকু যে, তা সনদ অনুযায়ী সহীহ্। এ দু'টি গ্রন্থের হাদীস সমূহের সনদ সম্পর্কে কথা বলার অবকাশ খুব কমই আছে। উম্মাত সাধারণভাবে এগুলোর বিশুদ্ধতা মেনে নিয়েছে। কিন্তু সনদের ভিত্তিতে কোনো হাদীস সহীহ হলেও তার বিষয়বস্তু হুবহু মেনে নেয়া জরুরী নয়। বরঞ্চ হাদীসটিতে কি বক্তব্য রয়েছে তা চিন্তা ও গবেষণা করে দেখা উচিত। প্রথমত, অন্যান্য বিশুদ্ধ হাদীসের বিষয়বস্তুর সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে এর কোনা অংশ সেগুলোর সাথে সাংঘর্ষিক নয়তো? সকল ফকীহ্গণই এভাবে হাদীসের সমালোচনা করেছেন। দ্বিতীয়ত মূল হাদীসটির বিষয়বস্তুর উপর চিন্তা ভাবনা করে দেখতে হবে তা কতোটুকু গ্রহণ করা যায়?

৬০. সুন্নাত এবং আদত

প্রশ্নঃ আপনি বলেছেন, আদতকে (অভ্যাস) সুন্নাত বানানো আল্লাহ এবং রাসূলের (সাঃ) উদ্দেশ্য নয়। একথাটির তাৎপর্য কি?

জবাবঃ প্রথমত চিন্তা করে দেখতে হবে, আদতের অর্থ কি? আর সুন্নাতেরই বা অর্থ কি? যেমন ধরুন, রাসূলে করীম (সাঃ) যে ধরনের খাবার খেতেন, তা ছিল তৎকালীণ আরবের প্রচলিত খাদ্য। আর এই খাদ্য খাওয়াটা ছিল তাঁর অভ্যাসগত ব্যাপার বা আদত। ঠিক সেইধরনের খাদ্য খওয়া গোটা দুনিয়ার মুসলমানের জন্যে সুন্নাত বানানো যেতে পারেনা। দ্বিতীয়ত, দেখতে হবে তিনি খাদ্য খাওয়ার ব্যাপারে কি কি নিয়ম কানূন বা সীমার কথা বলেছেন? হালাল

হারাম সম্পর্কে কি বলেছেন? মূলত এজিনিসগুলোই সুন্নাত এবং এগুলোই আমাদেরকে মানতে হবে।

একইভাবে নবী করীম (সাঃ) যে পোষাক পরতেন তা ছিল তাঁর আদত। তাঁর পরিধানের সেই আবা, সেই তহবন্দ, সেই টুপি এবং সেই জুতা মুসলমানদের মধ্যে চালু করার প্রয়োজন নেই। কারণ এগুলো আদতের অন্তর্ভুক্ত। পোষাকের ব্যাপারে নবী করীম (সাঃ) যে সীমা ও নিয়মনীতি বলে দিয়েছেন সেটাই হচ্ছে পোষাকের সুন্নাত। যেমন তিনি সতরের সীমা বলে দিয়েছেন। এগুলো হচ্ছে সুন্নাত। এগুলো মানতে হবে।

বিষয়টি পরিষ্কার। কিন্তু যখন কোনো বিষয়ে কেউ বক্রতা অবলম্বন করতে চায়, তার তো কোনো ঔষধ নেই। এদেরকে আমরা আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে দিলাম। তাঁর কাছেই তাদেরকে জবাব দিতে হবে।

৬১. আল্লাহ "রাব্বুল আলামীন" এবং রাসূল "রাহমাতুল্লিল আলামীন"

প্রশ্নঃ আল্লাহ তো রাব্বুল আলামীন এবং রাসূলকে বলা হয়েছে রাহমাতুল্লিল আলামীন। তাহলে আল্লাহ তা'আলা যেমন করে সমগ্র সৃষ্টির রব, রাসূল (সাঃ)ও কি তেমনিভাবে গোটা সৃষ্টি জগতের হেদায়েত স্বরূপ?

জবাবঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের এই পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টির জন্যে রহমত এবং হেদায়াত। সমগ্র সৃষ্টির হেদায়াত ও রহমতের ব্যাপারটা তো আল্লাহই ভাল জানান।

৬২ মেয়েদের জামায়াতে নামায পড়া

প্রশ্নঃ মেয়েদের জামায়াতে নামায পড়ার পদ্ধতি কি? একজন নারী কি অপর নারীদের ইমামতি করতে পারে?

জবাবঃ হ্যাঁ পারে। নবী করীম (সাঃ) তাদেরকে এই অনুমতি দিয়েছেন এবং পদ্ধতিও বলে দিয়েছেন। অর্থাৎ মহিলা ইমামকে কাতারের ভিতর দাঁড়াতে হবে।

৬৩. মসজিদ ও কবরস্থান

প্রশ্নঃ কিছু লোক কবরস্থানে মসজিদ তৈরী করে দেয়। এমনটি করা কি বৈধ?

জবাবঃ মুসল্লিদের প্রয়োজনে যদি কবরস্থানে মসজিদ তৈরী করা হয় এবং সেটাকে যদি কোনো মাজারের সাথে সম্পৃক্ত করা না হয় তবে তাতে কোনো দোষ নেই। তবে একথার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে, তা যেনো কোনো বুযুর্গের নামে উৎসর্গিত না হয়।

৬৪. মহররম মাসে কবরে মাটি দেওয়া

প্রশ্নঃ মহররম মাসে কবরে মাটি দেওয়া বৈধ কি? কিছু লোক মহররম মাসে কবরে মাটি দিয়ে থাকে।

জবাবঃ যারা এমনটি করে তাদের কাছেই জিজ্ঞেস করুন, কেন তারা এমনটি করে? আসল ব্যাপার আমল নয়, নিয়্যত। তাদের জিজ্ঞেস করুন তারা কোন্ নিয়্যতে এমনটি করে?

৬৫. মসজিদে উচ্চস্বরে দরূদ পড়া

প্রশ্নঃ কোনো কোনো লোক মসজিদে উচ্চ স্বরে দরূদ পাঠ করে থাকেন। এ সম্পর্কে ইসলামের বিধান কি?

জবাবঃ মসজিদে আওয়ায বড় করতে নিষেধ করা হয়েছে। উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করাও নিষেধ আছে। কেননা তাতে নামাযীদের মনোযোগ নষ্ট হয়। তাই মসজিদে উচ্চস্বরে দরূদ কিংবা "লাইলাহা ইল্লাহ" পড়া নিষেধ। দরূদ তো রাসূলে (সাঃ) এর প্রতি, তা উচ্চস্বরে পাঠ করার প্রয়োজন কি? এএক ধরনের প্রদর্শনীবৈকি।[১]

৬৬. নবী করীম (সাঃ) এর ওযুর পানি ব্যবহার

প্রশ্নঃ হাদীস থেকে জানা যায়, সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) এর ওযু করা পানি ভালবাসার সাথে উঠিয়ে নিয়ে নিজেদের মুখমণ্ডলে মেখে

---

১. সাপ্তাহিক এশিয়া লাহোর ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬১

নিতেন। অথচ ওযুর পানি দিয়ে ওযু করা ঠিকনয়। এ দু'টি কথার মধ্যে কিভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যেতে পারে?

জবাবঃ ওযু করা পানি অপবিত্র হয়না। মুমিন এমন কি প্রত্যেক মানুষের ঝুটা পবিত্র। সেকারণে কুল্লির পানি কাপড়ে পড়লে কাপড় নাপাক হয়না। তাই আপনি যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন সে প্রশ্ন সৃষ্টি হবার কোনো অবকাশ নেই। বিধান কেবল এতোটুকু যে, ওযু করা পানি দ্বারা ওযু হয়না। সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) রাসূলে করীম (সাঃ) এর ওযু করা পানি দ্বারা ওযু করতেননা। মহব্বত ও ভালবাসার কারণে তাবাররক হিসাবে পানি হাতে এবং মুখমন্ডলে মেখে নিতেন। আর যারা এপানি পেতনা তারা ঐসব সাহাবীদের হাতে হাত মিলিয়ে নিজেদের আগ্রহ পূরণ করতেন, যারা নিজেদের হাতে পানি মাখিয়ে নিয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম বরকতের জন্যে নবী করীম (সাঃ) এর ওযুর পানি পাত্রের মধ্যেও রেখে দিতেন।

৬৭. নামাযীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করা

প্রশ্নঃ কোনো ব্যক্তি যদি মসজিদে নামায পড়তে থাকেন, তবে তার সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করতে হলে কতোটুকু দূরত্ব রাখা উচিত? কেননা মসজিদে তো ছুত্রা রাখার কোনো সুযোগ নেই।

জবাবঃ এ বিষয়ে মতবিরোধ আছে। কারো মতে চল্লিশ কদমের দূরত্ব থাকা জরুরী। আবার কোনো মতে সিজদার স্থানের দূরত্বই যথেষ্ট।

৬৮. হযরত ঈসা (আঃ) এবং কিয়ামতের নিদর্শন

প্রশ্নঃ কুরআনে বলা হয়েছে হযরত ঈসা (আঃ) কিয়ামতের নিদর্শন। এরদ্বারা কি হযরত ঈসা (আঃ) এর দ্বিতীয়বার অবতীর্ণ হবার কথা বুঝায়না? অর্থাৎ ঈসা (আঃ) এর অবতীর্ণ হওয়া কিয়ামত নিকটবর্তী হবার নিদর্শন?

জবাবঃ এই অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে যে প্রসংগে এই আয়াতটি এসেছে তার সাথে এই অর্থের সম্পর্ক কম। প্রসংগটি হচ্ছে এই যে, কাফিররা বলছিলো, খৃষ্টানরাও তো হযরত ঈসা (আঃ)কে খোদা মানে। সুতরাং আমরা যদি মূর্তিগুলোকে খোদা মানি তবে তাতে অপরাধের কি আছে। এর জবাবে বলা হয়েছে, হযরত ঈসা (আঃ) কখনো খোদা বা খোদার পুত্র হবার দাবী করেননি।

তাছাড়া হযরত ঈসা (আঃ) পিতাবিহীন জন্ম হবার কারণে তিনি খোদা কিংবা খোদার পুত্র হবার আকীদা বিশ্বাস সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

হযরত ঈসা (আঃ) কিয়ামতের নিদর্শন, খোদায়ীর নিদর্শন নয়। তিনি একথার নিদর্শন যে, আল্লাহ তা'আলা যখন যাকে যেভাবে সৃষ্টি করতে চান, তা করতে তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম। তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী হযরত আদম (আঃ) কে পিতা মাতা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। তেমনি নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী ঈসা (আঃ) কে পিতা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। এ কারণে যেমনি করে হযরত আদম (আঃ) খোদা হয়ে যাননি, তেমনি হযরত ঈসা (আঃ) ও খোদা হবার প্রশ্নই ওঠে না। এমনি করে আল্লাহ তা'আলা যখন চাইবেন কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষকে পুনরায় জীবিত করে তুলবেন।

কেউ এর অপর অর্থ গ্রহণ করতে চাইলে করতে পারে। কিন্তু আমি কুরআনের তফসীর করার সময় বক্তব্যের প্রসংগের প্রতি লক্ষ্য রেখে থাকি। আর বক্তব্যের প্রসংগের মধ্যে অপর কোনো কিছু স্থান পায়না।[১]

৬৯. জগতের স্রষ্টা স্বয়ং সৃষ্ট

প্রশ্নঃ জনৈক প্রফেসর বলেছেন জগতের সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং সৃষ্টি জগতের অন্তর্ভুক্ত।

জবাবঃ যে প্রফেসর একথা বলেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তে তাকে মানসিক হাসপাতালে রাখা উচিত। 'সৃষ্টিকর্তা' এবং 'সৃষ্টি জগত' শব্দ দু'টি স্পষ্ট ভাষায় বলছে, এ দু'টি জিনিস সম্পূর্ণ পৃথক। তা না হলে তো এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং নিজেকে সৃষ্টি করেছেন।

৭০ সৃষ্টি জগত কেন সৃষ্টি করা হলো?

প্রশ্নঃ আল্লাহ তা'আলা এজগত কেন সৃষ্টি করলেন?

জবাবঃ আল্লাহর নিকট গিয়ে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে নিন। যতোক্ষণনা তিনি এবিষয়ে কিছু বলেন, ততোক্ষণ পর্যন্ত এনিয়ে তর্ক বাহাস করে কি লাভ? তাঁর

১. সাপ্তাহিক এশিয়া লাহোর ১৬ই আগষ্ট ১৯৬১

কাছ থেকে এর জবাব জানার যেহেতু কোনো মাধ্যম নেই তাই এধরনের প্রশ্ন করে মনকে কেন জটিলতার মধ্যে ফেলছেন? যেসব বিষয়ে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবেনা সেগুলোর পিছে লেগে পড়া ঠিক নয়। এপ্রশ্নের সমাধানের সাথে যিন্দেগীর কি সম্পর্ক রয়েছে? এধরনের প্রশ্ন বাজে ও অনর্থক চিন্তার চিহ্ন।

৭১. অর্থহীন প্রশ্ন

প্রশ্নঃ কোনো কোনো লোক এধরনের (উপরোক্ত) প্রশ্ন করে। থাকে তাদেরকে কি জবাব দেয়া যেতে পারে?

জবাবঃ এ ধরনের লোকদের সালাম দিয়ে তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাবেন এবং বলবেন বিষয়টি যখন তোমরা অবগত হবে তখন আমাদেরকেও জানাবে।

৭২. মৌলিক পদার্থ ছাড়া জগত সৃষ্টি

প্রশ্নঃ মৌলিক পদার্থ ছাড়া জগত সৃষ্টি সম্ভব কি? সরঞ্জাম ছাড়াতো কেউ একটি ঘরও তৈরী করতে পারেনা?

জবাবঃ সৃষ্টিকর্তাকে কোনো স্থপতি বা কারিগরের মতো কল্পনা করা ঠিক নয়। এরাতো ইট, সিমেন্ট, সুরকী নাহলে অট্টালিকা তৈরী করতে পারেনা। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্নতর। মৌলিক পদার্থকেও তিনিই সৃষ্টি করেন। মৌলিক পদার্থ আগে থেকে মওজুদ থাকতে হবে এমনটির মুখাপেক্ষী তিনি নন। যারা এরূপ কথাবার্তা বলে তাদের বিবেক বুদ্ধি খুবই সংকীর্ণ।[১]

৭৩. ফরয এবং সুন্নাত

প্রশ্নঃ আচ্ছা মওলানা! কোনো কোনো দেশের লোকেরা কেবল ফরযই পড়ে এবং সুন্নাত ত্যাগ করে। এমনটি করা কি ঠিক?

জবাবঃ এমনটি করা নির্ঘাত ভ্রান্তি। এই লোকদের ধারণা হচ্ছে, সুন্নাত পরবর্তী লোকেরা গড়ে নিয়েছে এবং প্রথম প্রথম কেবল ফরযই পড়া হতো। নিজেদের কথার সমর্থনে এরা যেসব প্রমাণ পেশ করে সেগুলো একেবারেই

---

১. সাপ্তাহিক এশিয়া লাহোর ১৪ই নভেম্বর ১৯৬২

ভিত্তিহীন। যাদের মাধ্যমে আমাদের নিকট কুরআন পৌছেছে তাঁদের মাধ্যমেই আমাদের নিকট সুন্নাত এবং হাদীস পৌছেছে তাঁদের ব্যাপারে কীকরে এ ধারণা পোষণ করা যেতে পারে যে, তারা আমাদের কাছে কুরআন ঠিকঠিকভাবেই পৌছে দিয়েছেন কিন্তু সুন্নাত এবং হাদীস ভুল পৌছিয়েছেন। বিবেকের দাবীতো হচ্ছে এই যে, কুরআন এবং সুন্নাত উভয়টার বাহকরাই হয়তো সত্যবাদী হবে, নয়তো হবে মিথ্যাবাদী। তারা যদি কুরআনের ব্যাপারে সত্যবাদী হয়ে থাকেন তবে অবশ্য অবশ্যি সুন্নাত সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন তাও সঠিক। তারা যদি সুন্নাতের ব্যাপারে খিয়ানত করে থাকেন এবং আমাদের নিকট তা ভুল পৌছিয়ে থাকেন তবে তাদের পৌছানো কুরআন কীকরে সঠিক হতে পারে? সুতরাং যেহেতু কুরআনকে আমরা সত্য সঠিক বলে মানি, তাই যুক্তিসঙ্গত ভাবেই তাঁদের পৌছানো সুন্নাত এবং হাদীসকেও সঠিক বলে মেনে নিতে হবে।

৭৪. সুদ এবং ঘৃণা

প্রশ্নঃ সুদ দাতা এবং গ্রহীতার মধ্যে যে ঘৃণ্য ও নীচু ধরনের অনুভূতি কাজ করে, আন্তর্জাতিক পর্যায়েও কি দাতা এবং গ্রহীতা দেশের মধ্যে এরূপ অনুভূতি কাজ করে?

জবাবঃ হ্যাঁ, সুদী কারবারে একজন মানুষ অপর জনের উপকার এবং সেবা করার কথা বলেই পার্শ্ববর্তী হয়। একজন সুদখোরের মানসিকতা এমন হয়ে থাকে যে, সে সুদ ছাড়া কাউকেও টাকা দেয়না, এমনকি তার সামনে কেউ যদি অভুক্ত থেকে মরেও যায়। একইভাবে একটি ধনী ও সম্পদশালী দেশ অপর কোনো গরীব দেশকে ততোক্ষণ পর্যন্ত অর্থদান করেনা, যতোক্ষাণনা তারা তা সুদের ভিত্তিতে গ্রহণ করতে রাজী হয়। সুদখুরীর সম্পদ মানুষকে নিঃস্বার্থ সেবার অনুভূতি থেকে দূরে রাখে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন বৃটেন অর্থনৈতিকভাবে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং প্রায় দেউলিয়া হয়ে পড়ে, তখন প্রধানমন্ত্রী চার্চিল মিত্রদেশ আমেরিকার নিকট আর্থিক সাহায্যের আবেদন করে। আমেরিকা নির্লজ্জভাবে বলে দেয়, সাহায্য কেবল সুদের ভিত্তিতে দেয়া যেতে পারে। চার্চিল আবেদন করল, সুদ পরিশোধ করার পজিশনে এখন আমরা নেই। আমাদেরকে বিনা মূল্যে অফেরতযোগ্য সাহায্য করুন কিংবা বিনা সুদে ঋণ দিন। কিন্তু আমেরিকা তাতে অস্বীকৃতি জানায়। অবশেষে চার্চিলকে বাধ্য হয়ে সুদের ভিত্তিতে ঋণ নিতে হয়।

সকল জাতি আমেরিকার এই অমানবিক আচরণকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেছে। এ জন্যেই জনগণ পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে চরম ঘৃণা করে।

দুঃখের বিষয় এই সুদী ব্যবস্থার মোকাবিলায় যে সমাজতন্ত্র এবং কমিউনিজম ক্ষমতাবান হয়, সেও এ অভিশাপকে গলায় পরে নিয়েছে। সমাজতন্ত্র, কমিউনিজম এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থা নামের দিক থেকে পৃথক পৃথক হলেও মূলত এগুলি পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই বিভিন্ন নাম।

৭৫. নিঃশব্দে এবং সশব্দে "আমীন" বলা?

প্রশ্নঃ জনৈক ব্যক্তি আমীন সশব্দে বলার পক্ষে প্রশ্ন করেন?

জবাবঃ হাদীসের গ্রন্থসমূহে সশব্দে আমীন বলারও প্রমাণ পাওয়া যায়, আবার নিঃশব্দে বলারও প্রমাণ পাওয়া যায়। এবাপারে আমার মত হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি যদি কোনো প্রমাণিত সুন্নাতের উপর আমল করেন, পক্ষান্তরে একই বিষয়ে যদি আরেকটি প্রমাণিত সুন্নাত থাকে তবে একজন মুসলমানকে সেই প্রমাণিত সুন্নাতের উপরও আমল করা উচিত। অন্তত জীবনে একবার হলেও। যিনি সশব্দে আমীন বলেন তার উচিত কখনো নিঃশব্দে আমীন বলা, যাতে করে উভয় সুন্নাতের উপর তার আমল হয়ে যায়। অর্থাৎ প্রত্যেকেরই এই চেষ্টা করা উচিত যেন এমন কোনো সুন্নাত থেকে না যায় যার উপর তিনি আমল করেননি।[১]

৭৬. পরিবেশের প্রভাব

প্রশ্নঃ যে শিশু কোনো অমুসলিমের ঘরে জন্মগ্রহণ করে এবং অনিবার্যভাবে সেই পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়, সেই কুফরী পরিবেশই তার ধ্যান ধারণা নির্মাণ করে এবং তার মনমগজকে প্রশিক্ষণ দেয়। ফলে সত্যের আলো থেকে সে থাকে বঞ্চিত। পক্ষান্তরে মুসলমানের ঘরে জন্ম হয় যে শিশুর, অনিবার্যভাবেই সে হয় মুসলমান এবং ঈমানদার। আমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী কাফির হবে জাহান্নামী এবং মুসলিম হবে বেহেশতের অধিকারী। আমি এ বিষয়ে দুশ্চিন্তায় ভুগছি। এদের পরিণতির ব্যাপারে সিদ্ধান্তের সময় অমুসলিম শিশুদের পরিবেশগত অনিবার্যতার বিষয়টি কি উপেক্ষা করা হবে?

---

১. সাপ্তাহিক এশিয়া লাহোরা ৩০শে মার্চ ১৯৬৫।

জবাবঃ শিশু মুসলমানের ঘরেই জন্ম হোক কিংবা অমুসলমানের ঘরে, মৌলিকভাবে আল্লাহ তা'আলা তাকে সমান বিবেক বুদ্ধি দিয়েই সৃষ্টি করেন। এই বিবেক বুদ্ধির সাহায্যে সে ভালমন্দ এবং সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। অতপর তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতাও দেয়া হয়েছে এবং উভয় শক্তির ব্যবহারের মধ্যেও স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। তাছাড়া প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই মৌলিকভাবে ন্যায় ও সত্যের প্রবণতা আত্মস্থ করে দেয়া হয়েছে। তবে এ প্রবণতা কাজে লাগানোর দায়িত্ব ব্যক্তির নিজের। এসব যোগ্যতাকে যদি সে কাজে লাগায় তবে কিছুতেই সে ইসলামের উপর কুফরকে এবং সত্যের উপর মিথ্যাকে অগ্রাধিকার দেবেন না। এর বাস্তব প্রমাণ হচ্ছে এই যে, অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা সকল শিশুই অমুসলিম হয়না এবং মুসলমানের ঘরে লালিত পালিত সকল শিশুই অনিবার্যভাবে মুসলমান হয়না।

হিদায়াত দান করা আল্লাহর ইচ্ছাধীন। মুসলমান এবং অমুসলমান সকলেই তার সৃষ্টি আর তিনি হলেন 'হাকিম' সর্বশ্রেষ্ঠ ইনসাফগার। তিনি কারোর প্রতি যুলুম করেন না। তাই এবিষয়ে আপনার কোনো প্রকার দুঃশ্চিন্তায় পড়ার কারণ নেই।

৭৭. আল্লাহকে স্বপ্নে দেখা

প্রশ্নঃ জনৈক ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে স্বপ্নে দেখেছে বলে দাবী করছে। এমনটি কি সম্ভব?

জবাবঃ স্বপ্নে কিংবা জাগ্রত অবস্থায় আল্লাহ তা'আলাকে দেখবে এমন সামর্থ মানুষের নেই। কুরআন পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছে "লা তুদরিকহুল আবৃসারু– কোনো দৃষ্টি তাঁকে দেখতে পায়না।"

৭৮. সত্যই বুযুর্গীর মানদন্ড

প্রশ্নঃ কিছু লোক এমন আছেন যাদের নীতি ও আচরণ শরীয়তের দাবীর বিপরীত। কিন্তু তারা এমন কিছু আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হয়, যার ভিত্তিতে লোকদের ফাঁসিয়ে নেয়। তাদের মুরীদরা তাদের সম্পর্কে অতি সুধারণা পোষণ করে। তারা তাদের বিরুদ্ধে কোনো কথা বরদাশত করতে পারেনা, তা যতোই সত্য হোক না কেন?

জবাবঃ কেবলমাত্র কুরআন সুন্নাহর বিধানের অনুবর্তনই সত্য ও বুযুর্গীর মানদন্ড। কারো আধ্যাত্মিক বা অলৌকিক শক্তি সত্য ও মিথ্যার মানদন্ড হতে পারেনা। কেননা এরূপ শক্তিতো সাধু সন্ন্যাসীরাও অর্জন করে থাকে।

কোনো ব্যক্তির যিন্দেগী যদি কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী পরিচালিত হয় এবং তার দ্বারা অলৌকিক কিছু সংঘটিত হয়, তবে সেটাকে কিরামত বলা যায়। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি সিদ্ধি এবং কতিপয় আধ্যাত্মিক তপস্যার ভিত্তিতে কিছু ইন্দ্রোজালনৈপূণ্য শিখে নেয় এবং সেরূপ পূর্ণতা প্রদর্শন করে লোকদের প্রভাবিত করে, তবে তার দ্বারা কখানো প্রভাবিত হবেননা।

এ এক বিস্ময় ও লজ্জাকর ব্যাপার যে, লোকেরা সেইসব বুযুর্গদের নামেও এমন সব কাহিনী রচনা করে নিয়েছে যেগুলোর বিরুদ্ধে তারা সারাজীবন জিহাদ করে গেছেন। আমি আশ্চার্যান্বিত হই, যখন লোকেরা বলে, ইমাম আবু হানীফা (রঃ) চল্লিশ বছর পর্যন্ত এশার নামাযের ওযু দিয়ে ফজরের নামায পড়েছেন। একথাটির অর্থ তো এই দাঁড়ায় যে, তিনি চল্লিশ বৎসর রাত্রে ঘুমাননি। তিনি যদি ঘুমিয়েই না থাকেন তবে কি করে সর্বশ্রেষ্ঠ ফিকাহ সংকলন করে গেলেন। লোকেরা মনে করে চল্লিশ বছর না ঘুমানোটা একটা কিরামতী। কিন্তু ফিকাহর সর্বশ্রেষ্ট সংকলনটা কোনো কিরামতী নয়। অথচ মিল্লাতে ইসলামীয়ার প্রতি ইমাম আবু হানীফার (রঃ) সবচাইতে বড় ইহসান হচ্ছে তাঁর ফিকাহ। আর এটাই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং জীবন্ত কিরামত।

প্রশ্নঃ আচ্ছা মওলানা! আমাদের আল্লাহ এক, রাসূল এক, কুরআন এক তা সত্ত্বেও মুসলমানরা কেন এক হচ্ছে না?

জবাবঃ আল্লাহ এক, রাসূল এক, কুরআন এক, কিন্তু মুসলমানদের অন্তর হচ্ছে অসংখ্য। তারা আল্লাহ রাসূল এবং কুরআনের পথনির্দেশ ত্যাগ করে অন্তরের কামনা এবং নিজেদের স্বার্থকে পথ প্রদর্শক হিসাবে গ্রহণ করেছে।[১]

৭৯. বিদ'আত কি?

প্রশ্নঃ বিদ'আত কাকে বলে?

---

১. সাপ্তাহিক এশিয়া লাহোর ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১।

জবাবঃ বিদ'আত এমন কাজকে বলে, যা ইসলামের কোনো মূলনীতি কিংবা আইনের বিপরীত। যেমন, ইসলামে চুরির শাস্তি হলো হাত কেটে দেয়া। এখন কোনো ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যদি চুরির শাস্তি হিসাবে এক বা দুই বৎসর কিংবা অপর কোনো মেয়াদের কারাদন্ড প্রদান করে, তবে তা বিদ'আত। অথবা এর উদাহরণ হচ্ছে এই যে, ইসলামে হত্যার শাস্তি হচ্ছে কিসাস (হত্যার বদলা হত্যা)। এখন কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যদি হত্যাকারীকে হত্যার পরিবর্তে দশ অথবা বিশ বছরের কারাদন্ড দিয়ে দেয়, তবে তা বিদ'আত। একাজ যারা কার্যকর করবে, সেইসব শক্তি বা ব্যক্তি একটি বিদ'আত চালু করার ব্যাপারে অংশগ্রহণকারী বলে বিবেচিত হবে।

এমন কোনো নতুন কাজ যা ইসলামী হবার ব্যাপারে কোনো প্রমাণ নেই, তাতে যদি ইসলামী আদর্শের লেবেল লাগানো হয় এবং তা যারা করবেনা তাদেকে গুণাহগার আখ্যায়িত করা হয় এবং তার ব্যাপারে এতোটা কড়াকড়ি ও গুরুত্ব আরোপ করা হয়, যতোটা গুরুত্ব রয়েছে ইসলামের কোনো বিধানের, তবে তা বিদআত।

এ প্রশ্নোত্তর প্রসংগে এক যুবক জিজ্ঞাসা করেঃ ইসলামে যে বিধান বর্তমানে নেই কিংবা ইসলাম যে বিষয়ে কিছু বলেনি সে বিষয়ে আইন প্রণয়ন করাও কি বিদ'আত?

এর জবাবে মওলানা বলেনঃ যে বিষয়ে কিতাব এবং সুন্নায় কোনো বিধান বর্তমান নেই সে বিষয়ে মুসলমানদের মজলিশে শূরা সর্ব সম্মতিক্রমে আইন প্রণয়ন করতে পারে। এরূপ আইন প্রণয়নের অধিকার ইসলাম মুসলমানদের দিয়েছে। এরূপ আইন প্রণয়নের জন্যে যে মূলনীতি নির্ধারণ করা হবে তা স্থায়ী হবেনা। বরঞ্চ পরিবেশ পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে তাতে রদ বদলের অবকাশ থাকবে। সুতরাং এরূপ আইন প্রণয়ন বিদ'আতের সংজ্ঞায় পড়ে না।

৮০. কাফির ও মুশরিকের সুহবত

প্রশ্নঃ আমরা কি কাফির এবং মুশরিকদের নিকট গিয়ে বসতে পারি? অথচ কুরআন বলছে, তোমরা কাফির ও মুশরিকদের সাথে বসোনা।

জবাবঃ তাদের কাছে যাবেন এবং বসবেন। কারণ, তাদের কাছে না গেলে না বসলে তাদের নিকট কী করে ইসলামের দাওয়াত পৌছাবেন? স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) কাফির ও মুশরিকদের নিকট যেতেন এবং তাদের ইসলামের দাওয়াত দিতেন। কুরআন মজীদ তো কেবল তাদের ভ্রান্ত ও বাজে কথার প্রভাব গ্রহণ করতে নিষেধ করেছে। পক্ষান্তরে কুরআন বলেছে, তোমরা নিজেদের আদর্শ ও আচারণ দ্বারা তাদের প্রভাবিত করো। তবে তাদের কথায় প্রভাবিত হবার আশংকা থাকলে তোমরা তাদের কাছে যেয়োনা।

৮১. বাতিল মতবাদ অধ্যয়ন

প্রশ্নঃ বাতিল মতবাদের বই পুস্তক পড়া যেতে পারে কি?

জবাবঃ হ্যাঁ, পড়া যেতে পারে। তবে প্রথমেই ইসলামী আদর্শের পরিপূর্ণ অধ্যয়ন এবং সুস্পষ্ট ও যথার্থ জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন। এর পরেই কেবল অন্যান্য মতবাদ অধ্যয়ন করা যেতে পারে। সেসব মতবাদ এজন্যে পড়তে হবে, কারণ সেগুলো না পড়লে তাদের ভ্রান্তি এবং দুর্বলতাসমূহ সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে না এবং সেগুলোর ভ্রান্তি খন্ডন করা যাবেনা। কিন্তু একটি কথার প্রতি অবশ্যি দৃষ্টি রাখতে হবে যে, সেসব মতবাদ অধ্যয়নকালে সেগুলোর উজ্জ্বল ও অন্ধকার দিকগুলো সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, তাদের মতবাদে যা কিছু উজ্জ্বল দিক রয়েছে তা সবই তারা ইসলাম থেকে গ্রহণ করেছে, যেনো এই উজ্জ্বল দিক দেখিয়ে আল্লাহর বান্দাদেরকে অন্ধকারের গহ্বরে নিমজ্জিত করা যায়।

৮২. বন্ধককৃত জমির ফসল

প্রশ্নঃ বন্ধককৃত জমির ফসল গ্রহণ কি সূদ বলে গণ্য হবে?

জবাবঃ ইসলামী শর্ত অনুযায়ী জমির মালিক যদি ফসলের নির্দিষ্ট অংশ পান তবে তাতে সূদের সংশয় থাকবেনা। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি টাকা দিয়ে জমি বন্ধক নেন এবং গোটা আয় উৎপাদন নিজেই গ্রহণ করেন, তবে এমনটি অবশ্যই সূদখুরী হবে। এরূপ কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত।

৮৩. রুগীকে রক্তদান

প্রশ্নঃ কোনো রুগীকে রক্তদান কি ইসলামে বৈধ?

জবাবঃ এব্যাপারে ইসলাম কেনো বিধি নিষেধ আরোপ করেনি। রুগীর জন্যে যার রক্ত নেয়া হবে, তার রক্ত পরীক্ষা করে নেয়া কর্তব্য। কোনো মারাত্মক ও জটিল রুগীর রক্ত কাউকে দেয়া উচিত নয়। কোনো বদকার বদ অভ্যাসী ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ থেকেও বিরত থাকা উচিত।

৮৪. ভ্রান্তি ও বে'আদবী

প্রশ্নঃ কোনো নেক ও বুযুর্গ ব্যক্তির ভুল ভ্রান্তিকে ভুল ভ্রান্তি বললে কি তার মর্যাদা কমে যায়? কিংবা তাতে কি কোনো বে'আদবী হয়?

জবাবঃ কোনো ব্যক্তির ভুলকে ভুল বলে দিলে তার প্রতি বে'আদবী হয়না। স্বয়ং কুরআন সুন্নাহও কোনো ভুলভ্রান্তিকে গোপন করে রাখেনি। বরঞ্চ চিহ্নিত করেছে। হ্যাঁ, তবে কারো প্রতি যদি ভ্রান্ত ও অপ্রপাণিত অভিযোগ অপবাদ আরোপ করা হয় তবে অবশ্যই তা খন্ডন করতে হবে।[১]

৮৫. পুনরুত্থান

প্রশ্নঃ সূরা ইয়াসীনে বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন কাফিররা যখন কবর থেকে উঠবে তখন তারা বলবে, "আমাদেরকে আমাদের কবর থেকে কে উঠিয়ে এনেছে?" তাদের এই বক্তব্য থেকে প্রশ্ন সৃষ্টি হয়, মৃত্যুর পর থেকে পুনরুত্থান পর্যন্ত মৃত ব্যক্তি কি অচেতন শুয়ে থাকবে? এবং কবর আযাবের ধারণা কি ভ্রান্ত? কারণ, কবর আযাব যদি হবে তবে কাফিররা তো একথা বলতো না যে, আমাদেরকে আমাদের কবর থেকে কে উঠিয়ে এনেছে?

জবাবঃ প্রথমত, মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের তাৎপর্য জেনে নেয়া দরকার। মৃত্যু কি? দেহ থেকে আত্মা বিচ্ছিন্ন করে দেয়াটাই হলো মৃত্যু। আর পুনরুত্থান হচ্ছে, দেহের সাথে আত্মার পুনঃসংযোগ স্থাপন। মৃত্যু যখন আসে তখন দেহ থেকে আত্মাকে বের করে দেয়া হয়। কিন্তু তাতে আত্মার বিলয় ঘটে না। বরঞ্চ পূর্ণ অনুভূতির সাথে তা থেকে যায়। এমতাবস্থায় আত্মার আযাব হয়। এটাকে কবর আযাব বলা হয়। যেমন কোনো ব্যক্তি স্বপ্নে বাঘ কর্তৃক আক্রান্ত হতে দেখে সে

১. সাপ্তাহিক এশিয়া লাহোর, ১৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫।

তেমনি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যায়, যেমনটি জাগ্রত অবস্থায় আক্রান্ত হতে দেখে কোনো ব্যক্তি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যায়। ঘুমন্ত ব্যক্তি এই ভীতি ও আতংকের মধ্যে একথা অনুভব করেনা যে সে স্বপ্ন দেখছে এবং নিজের খাটে শুয়ে আছে। বরঞ্চ সে এটাকে প্রকৃত আক্রমণই মনে করে এবং এই ভীতি দ্বারা কষ্ট পায়। মৃত্যুর পর যে শাস্তি হবে তা হবে এধরনেরই শাস্তি আর এটাই হচ্ছে কবর আযাব।

অতপর জাগ্রত হবারপর মানুষ যেমন বুঝতে পারে যে সে নিজের বিছানায় শুয়েছিলো এবং স্বপ্ন দেখছিলো, তেমনি করে কাফিররাও যখন জাগ্রত হবে তখন এঅর্থেই তারা বলবে যে, সম্ভবত তারা যেন ঘুমিয়েছিল, ভীতিকর স্বপ্ন দেখছিল এবং এখন তাদের জাগ্রত করে দেয়া হয়েছে। এসময় মু'মিনরা সাথে সাথেই বুঝবে যে, কিয়াতমের দিন তারা পুরুত্থিত হচ্ছে। কিন্তু কাফির মুশরিক এবং আখিরাত অস্বীকারকারীরা হতভম্ব ও আতংকিত হয়ে যাবে। তাদের মনে হবে, তারা শুয়ে পড়েছিল এবং এখন তাদের জাগানো হয়েছে। এসময় তারা স্বগতভাবে বলবেঃ আমাদের নিদ্রা থেকে আমাদের কে উঠিয়ে এনেছে? এরি জবাবে তখন তাদের বলা হবে هٰذَا مَاوَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ "এই হচ্ছে সেই জিনিস আল্লাহ রহমান যার সংবাদ আগেই দিয়েছিলেন আর রাসূলগণ যা বলেছিলেন তা ছিলো মহাসত্য।"

৮৬. কুনফায়াকূন

প্রশ্নঃ আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টির মাহাত্ম্য সম্পর্কে বলেছেন, اِنَّمَا اَمْرُهٗ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنَ অর্থাৎ তিনি যখন কোনো কিছু সৃষ্টি করতে চান তখন বলেন, "হয়ে যাও এবং তা হয়ে যায়।" অথচ আমরা দেখছি আল্লাহ তাআলা অনেক অবলম্বন এবং বিভিন্ন সামগ্রীর দ্বারা কার্যসম্পন্ন করে থাকেন। যেমন মানুষ সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করতে বেশ একটা সময় লেগে যায় এবং সেজন্যে অসংখ্য জিনিসের ব্যবহার প্রয়োজন হয়ে পরে।

জবাবঃ কুনফায়াকুনের অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ তাআলা বলেন, পঁচিশ বছর বয়সের পরিপূর্ণ মানুষ সৃষ্টি হয়ে যাও এবং সাথে সাথে তা হয়ে যায়। বরঞ্চ একথাটির তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাআলা যখন কোনো মানুষকে সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাঁর হুকুমে মানুষ সৃষ্টি হওয়ার যে নির্দিষ্ট পন্থা তিনি নির্ধারণ করে রেখেছেন সে অনুযায়ী তার সৃষ্টি কার্যকরী হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলার কার্যসম্পাদন ব্যবস্থা মানুষের অনুরূপ নয়। যেমন কাঠমিস্ত্রি টেবিল

চেয়ার বানানোর জন্যে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম না পেলে সে টেবিল চেয়ার বানাতে পারেনা। কিন্তু আল্লাহ তাআলা সরঞ্জাম ছাড়াই তার হুকুমে যা ইচ্ছা তা সৃষ্টি করতে পূর্ণ সক্ষম। আল্লাহ তাআলা তাঁর উপরোক্ত বাণীতে সেইসব লোকদের গোমরাহীকেও খন্ডন করেছেন যারা আল্লাহর সাথে মৌলিক উপাদানকেও আদি মনে করে। তাদের ধারণা হচ্ছে, আল্লাহ এবং মৌলিক উপাদান উভয়টাই পূর্ব থেকে মওজুদ ছিল এবং আল্লাহ মৌলিক উপাদানের সাহায্যে সৃষ্টির কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। অথচ কুরআন বলছে, আদিতে শুধু আল্লাহই ছিলেন, মৌলিক উপাদন ছিলো না। তা আল্লাহর নির্দেশে অস্তিত্ব লাভ করেছে। মানুষের জ্ঞান এটা প্রমাণ করেছে যে, প্রথমে মৌলিক উপাদান বর্তমান ছিলো না এবং কেবলমাত্র আল্লাহর নির্দেশেই সকল অস্তিত্বহীন জিনিস অস্তিত্ব লাভ করেছে।

৮৭. খোদা এবং ফেরেশতা

প্রশ্নঃ কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, আল্লাহর হুকুমে ফেরেশতারা বিশ্বব্যবস্থা পরিচালনা কাজে নিযুক্ত। কেউ বাতাসের দায়িত্বে নিযুক্ত, কেউ নিযুক্ত পানির দায়িত্বে, কেউ নিযুক্ত বৃষ্টির দায়িত্বে। এরদ্বারা একথা প্রমাণ হয়না যে, আল্লাহ তাআলার ও কর্মচারীর প্রয়োজন আছে?

জবাবঃ ফেরেশতা দ্বারা কাজ করানোর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ তাআলা কর্মচারীর মুখাপেক্ষী। বরঞ্চ আল্লাহ তাআলা এই সৃষ্টি জগত পরিচালনার জন্যে এই ব্যবস্থাই করে রেখেছেন। যেমন 'আল্লাহ তাআলা রাজ্জাক' (রিযিক দাতা)। অসংখ্য অসীলা এবং উপায়ের মাধ্যমে তিনি তাঁর সৃষ্টি জগতকে রিযিক দিয়ে থাকেন। গায়েব থেকে খাবার তৈরী করে তাঁর সৃষ্টিকূলকে রিযিকদানের নিয়ম তিনি নির্ধারণ করেননি। তিনি ইচ্ছা করলে সকল কাজই সরাসরি এবং প্রত্যক্ষভাবে করতে পারেন। কিন্তু এমনটি তাঁর ইচ্ছা নয়। আর এর অর্থ এই নয় যে, তিনি উপায় উপাদানের মুখাপেক্ষী।

৮৮. কুরআন ও আকাশ

প্রশ্নঃ কুরআনে আকাশকে ছাদ বলা হয়েছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, মহাশূন্যে ছাদ জাতীয় কিছু নেই।

জবাবঃ যেসব জিনিস আমাদের চিন্তা ও অনুভূতির বাইরে, সেগুলোর স্বরূপ প্রকাশের জন্যে আমাদের ভাষায় কোনো শব্দ নেই। তাই আল্লাহ তাআলা যখনই

এরূপ কোনো জিনিসের কথা উল্লেখ করেন, তখন আমাদের ভাষায় এমনসব শব্দ প্রয়োগ করেন, যেসব শব্দের অর্থ সেই জিনিসের কাছাকাছি। যেমন, আল্লাহ তাআলা নিজের সিফাত বর্ণনা করতে গিয়ে নিজের জন্যে 'হাত' শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আমাদের মতই আল্লাহ তাআলারও হাত রয়েছে। একইভাবে আকাশকে ছাদ বলা হয়েছে। কেননা আকাশ তেমনিভাবে আমাদের মাথার উপর রয়েছে, যেমনটি থাকে ঘরের ছাদ। যেন পৃথিবী একটি ঘর আর আকাশ তার ছাদ, অর্থাৎ উর্ধ্ব জগত। জ্বিনদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা আকাশের দিকে গিয়েছে এবং তারা সেখানে ছাদের মত সুরক্ষিত পেয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে, জ্বিনেরা উপরের দিকে কেবল একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্তই যেতে পারে। তা অতিক্রম করার সাধ্য তাদের নেই।

এধরনের নিগূঢ় তত্ত্ব পেশ করার জন্যে যেহেতু আমাদের ভাষায় কোনো শব্দ নেই, সেজন্যে এগুলো সম্পর্কে একটি বুঝ বা বোধ স্পষ্ট করে তোলার জন্যে সেই সব শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে, যা আমাদের ভাষায় বর্তমান রয়েছে।

৮৯. স্যার সৈয়দ আহমদ, কুরআন এবং লন্ডন

প্রশ্নঃ স্যার সৈয়দ আহমদের ধারণা, কুরআন যদি লন্ডনে অবতীর্ণ হতো, তবে জান্নাতের চিত্র অংকনের সময় গরম গোসলখানার কথা উল্লেখ করা হতো ইত্যাদি ইত্যাদি।

জবাবঃ স্যার সৈয়দ আহমদ যদি কোনো সঠিক কথা বলে থাকেন এবং তা যদি কুৎসিতভাবে বলে থাকেন তবে সেটার দায়দায়িত্ব তার। সেটাকে খন্ডন করা বা ভ্রান্ত বলার প্রয়োজন নেই।

প্রত্যেক জাতির লোকদেরই আরাম আয়েশের সামগ্রী ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা যে জাতির কাছে কিতাব নাযিল করেন, সে জাতিকেই সর্ব প্রথম কিতাবের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। তাদের রুচিকে সামনে রেখেই বক্তব্য পেশ করা হয়। প্রত্যেক জাতির মুমিন এবং নেক লোকদেরকে জান্নাতে তাদের রুচি অনুযায়ী আরাম আয়েশের সামগ্রী সরবরাহ করা হবে।

৯০. হযরত মূসা (আঃ) এবং তুরপাহাড়

প্রশ্নঃ যখন মূসা (আঃ) তূর পাহাড়ে গিয়েছিলেন এবং তার "হে রব আমাকে

দেখাও” দাবীর ভিত্তিতে তাজাল্লি হয়েছিলো, কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী তখন পাহাড় অনু পরমাণুর মতো গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গিয়েছিলো। অতপর পাহাড়টি কেমন করে অবশিষ্ট থাকলো?

জবাবঃ বর্তমান তূরপাহাড় সেই তূরপাহাড় নয়, যার উপর তাজাল্লি হয়েছিল। সে পাহাড়টি গুঁড়ো হয়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এখন তার কোনো চিহ্ন বর্তমান নেই। বর্তমানে যেটিকে তূরপাহাড় বলা হয় এটি সেই তাজাল্লি হওয়া পাহাড়ের সন্নিকটে বলে এটাকে তূরপাহাড় বলা হয়।[১]

৯১. কবরে হেলান দেয়া

প্রশ্নঃ গত রোববার আপনি একটি হাদীস বর্ণনা করেছিলেন যে, কবরে হেলান দিলে মাইয়্যেতের কষ্ট হয়। কথা হচ্ছে, মৃত ব্যক্তি যদি কষ্ট অনুভব করেন তবে তার নিকট দোয়া প্রার্থনার বৈধতা প্রকাশ পায় না কি?

জবাবঃ মৃত ব্যক্তি তো আমাদের থেকে মরে যায়, পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে আমরা জ্ঞাত নই। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আমাদেরকে কবরে ফাতেহা পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং কবরস্তানে প্রবেশের সময় কবরবাসীদের সালাম দেয়ার হিদায়াত দিয়েছেন। এখন কেউ যদি এথেকে অনুমানের অট্টালিকা নির্মাণ করে এবং মৃত লোকদের থেকে দোয়া প্রার্থনা করাকে বৈধ বলে ঘোষণা করে থাকে, তবে কুরআন হাদীসে তার এ অনুমানের কোনো ভিত্তি নেই। এর সমস্ত দায়দায়িত্ব তার নিজের।

৯২. নবী করীম (সাঃ) এর কন্যার ইন্তেকাল

প্রশ্নঃ আপনি একবার দারসে হাদীসে বলেছিলেন, নবী করীম (সাঃ) এর কন্যা উম্মে কুলসুমের মৃত্যুর পর তিনি তার কফিন কবরে নামানোর জন্যে সাহবাগণকে হুকুম করেন। তাছাড়া একথাও বলেন যে, তাকে সেই ব্যক্তি কবরে নামাবে যে আজ রাত স্ত্রী সহবাস করেনি। এদুটো কথা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিন।

---

[১]. এশিয়া লাহোর ১৩ই জানুয়ারী ১৯৬১।

জবাবঃ আমি তখন একথাও বলেছিলাম যে, এটি সাধারণ শরয়ী বিধান নয়। মৃত নারীর আত্মীয়রা যদি কোনো অপারগতার কারণে তাকে কবরে নামাতে না পারে, তার সে অবস্থায় অমুহাররম পুরুষের তাকে কবরে নামানোর অনুমতি আছে।

থাকলো আপনার প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের জবাব। নবী করীম (সঃ) এর একথা বলার পেছনে কোন্ যুক্তি ছিলো? সে যুক্তির ব্যাখ্যা হাদীসের গ্রন্থাবলীতে উল্লেখ রয়েছে, এখানে সে ব্যাখ্যা পেশ করার উপযুক্ত স্থান নয়। কোনো কোনো মাসায়েল এমন আছে, যেগুলো সকল স্থানে খোলা খুলি আলোচিত হওয়া যুক্তিসিদ্ধ নয়।

৯৩. আবহাওয়া দফতর

প্রশ্নঃ কুরআন হাদীসের দৃষ্টিতে আবহাওয়া দফতর প্রতিষ্ঠা করা কি বৈধ? আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা সবসময় ভবিষ্যতবাণী করার প্রাক্কালে বলে থাকে "আজ বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা আছে," কিংবা "আজ আকাশ পরিষ্কার থাকবে" ইত্যাদি।

জবাবঃ আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা যেদিন বলবে "আজ অবশ্যই বৃষ্টি হবে" সেদিন থেকে এই বিভাগের অস্তিত্ব অবৈধ হবে। কিন্তু যতোদিন তারা বলবে, আজ বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা আছে এবং সেই সম্ভাবনার বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করবে তবে তা নাজায়েয নয়।[১]

৯৪. সূরায়ে মুযযাম্মিল এবং নবী করীম (সাঃ)

প্রশ্নঃ সূরা মুয্যাম্মিল অবতীর্ণ হবার পূর্বেই তো নবী করীম (সাঃ) রাতভর নামায পড়তেন। অতপর সূরায়ে মুয্যামিলে কেন এ বিষয়ে তাঁকে পূনরায় তাগাদা দেয়া হলো?

জবাবঃ নবী করীম (সাঃ) এসূরা অবতীর্ণ হবার পূর্বেও রাত্রে ইবাদত করতেন। কিন্তু তা ছিল তাঁর মনের সান্ত্বনার জন্যে। সূরা মুযযাম্মিল নাযিল হবার পর রাত্রে তাহাজ্জুদ নামায পড়া তাঁর জন্যে ফরয হয়ে পড়ে। এসূরার দ্বিতীয় রুকুতে গিয়ে উম্মতের জন্যে তাহাজ্জুদ পড়া ফরয হিসাবে চালু রাখেনি। তা

---

১. এশিয়া লাহোর ৩০ আগস্ট ১৯৬৬।

কেবল নবী করীম (সাঃ) এর জন্যেই ফরয রাখা হলো এবং পরিমাণ কমিয়ে দেয়া হলো। এরপরও নবী করীম (সাঃ) আপন মনের তাড়ায় রাতভর তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন

৯৫. কিয়ামত ও পয়গম্বর

প্রশ্নঃ কিয়ামতের দিন প্রতিটি উম্মতকে তার পয়গম্বরের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে পাকড়াও করা হবে। কিন্তু যে উম্মতের নিকট নবী প্রেরিত হয়নি তাদেরকে কিসের ভিত্তিতে শাস্তি দেয়া হবে?

জবাবঃ আল্লাহ তাআলা এমূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, কোনো জাতির কাছে পয়গম্বর পাঠানো ব্যতীত এবং দাওয়াত পৌছার পর তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে বলে প্রমাণিত হওয়া ছাড়া তাদের শাস্তি দেয়া হবেনা। কিন্তু এফায়সালা আল্লাহই করবেন, কার কাছে দাওয়াত পৌছার পর সে প্রত্যাখ্যান করে শাস্তি পাবার যোগ্য প্রমাণিত হয়েছে? এফায়সালা আমি এবং আপনি করতে পারবনা। মোটকথা, আল্লাহ তাআলা কারো প্রতি যুলুম করবেননা। যার কাছে দাওয়াত পৌছেছে তার দায়িত্ব কর্তব্য কি তা তিনি আমাদের বলে দিয়েছেন। আর যার নিকট দাওয়াত পৌছায়নি তার ব্যাপারে ফায়সালা করার দায়িত্ব আল্লাহর। কিন্তু কার নিকট দাওয়াত পৌছেছে আর কার নিকট দাওয়াত পৌছায়নি, কিছু লোক নিজেই সে ফায়সালা করতে চায়। অথচ মানুষের জ্ঞান খুবই সীমিত এবং এব্যাপারে ফায়সালা করার অধিকার তার নেই।

৯৬. 'মকর' শব্দের অর্থ

প্রশ্নঃ মকর শব্দের অর্থ ধোকা ষড়যন্ত্র। তাহলে "وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ" এর তাৎপর্য কি?

জবাবঃ মকর শব্দের আসল অর্থ গোপন কার্যপ্রণালী বা অভিসন্ধি, যে সম্পর্কে অপর কেউ জানতে পারেনা। কিন্তু মানুষ যখন গোপন অভিসন্ধি করে, তা সাধারণত মন্দ কাজ হয়ে থাকে। এজন্যে সাধারণভাবে মকর শব্দের অর্থ ধোকা ও ষড়যন্ত্র বলে খ্যাত হয়ে গেছে। মানুষের মকর করার অর্থ ধোকা ও ষড়যন্ত্র করা। কিন্তু আল্লাহতাআলার মকর করার অর্থ তার কার্যপ্রণালী পরিচালনা করা। অর্থাৎ মানুষ এটা জানেনা যে, কখন সে আল্লাহ কর্তৃক পাকড়াও হয়ে যাবে। যেমন ভূমিকম্পের প্রস্তুতি অত্যন্ত সংগোপনে হয়ে থাকে। মানুষ এটা তখনই টের পায় যখন ভূকম্পন সংঘটিত হয়।

৯৭. নূহের (আঃ) তুফান

প্রশ্নঃ নূহের (আঃ) তুফান কি বিশ্বব্যাপী ছিল, নাকি তা ইরাকেই সীমিত ছিল?

জবাবঃ এবিষয়ে দুটি মতবাদ পাওয়া যায়। এক, এতুফান বিশ্বব্যাপী ছিল। দুই, তা ইরাকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, যেদেশে নূহ (আঃ) প্রেরিত হয়েছিলেন। কিন্তু কুরআন বলছে, নূহের (আঃ) সময়ের তুফান দ্বারা সমস্ত মানুষ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং পরবর্তী লোকেরা ঐ সমস্ত লোকদের বংশধর যারা নূহের (আঃ) সাথে তুফান থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন।

উভয় দৃষ্টিভংগির মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যেতে পারে যে, সেসময় মানব জাতি শুধুমাত্র ইরাকেই বসবাস করতো। এছাড়া ইতিহাস থেকে একথারও প্রমাণ পাওয়া যায়, পৃথিবীর প্রতিটি জাতির মধ্যে তুফান সংঘটিত হয়েছে এবং প্রত্যেক জাতির মধ্যেই সে তুফানের কিংবদন্তী খ্যাত হয়ে আছে। এথেকেও প্রমাণিত হয়, সে তুফান ছিল বিশ্বব্যাপী। অস্ট্রেলিয়ায় একটি সম্প্রদায় রয়েছে যারা প্রাচীনতম কৃষ্টির ধারক। তাদের কিংবদন্তীর মধ্যেও এতুফানের কথা চালু আছে।[১]

৯৮. ভূমির মালিকানা ও সূদ

প্রশ্নঃ আপনার 'ভূমির মালিকানা সমস্যা' এবং 'সূদ ও আধুনিক ব্যাংকিং' পড়েও আমি এবিষয়ে পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারিনি।

জবাবঃ এতো দীর্ঘ বই পড়েও যদি আপনি আশ্বস্ত হতে না পারেন, তাহলে এখন পাঁচ মিনেটের আলোচনায় আপনি কিভাবে আশ্বস্ত হবেন? যাতে আপনি আশ্বস্ত, তার উপরেই আমল করুন।

৯৯. জ্বিন ও নবুয়ত

প্রশ্নঃ কুরআনে বলা হয়েছে, পৃথিবীর অধিবাসীরা যদি ফেরেশতা হতো তবে তাদের জন্যে ফেরেশতাকে রাসূল বানানো হতো। প্রশ্ন হচ্ছে, তবে জ্বিনদের জন্যে

---

১. এশিয়া লাহোর ১৭ ডিসেম্বর ১৯৬৫।

মানুষকে কেন নবী বানানো হলো? জ্বিনদের জন্যে জ্বিনকে কেন নবী বানানো হলো না?

জবাবঃ আল্লাহ তাআলা মানুষকে তার খলীফা বানিয়েছেন, তাই জ্বিনদেরকেও মানব রাসূলেরই অনুসরণ করতে হবে।

১০০. হাযির নাযির প্রসংগ

প্রশ্নঃ কোনো কোনো লোক আত্যাহিয়্যাতুর "আইয়্যুহান্নাব্বীউ" থেকে এ অর্থ গ্রহণ করে যে, নবী সবসময় সর্বত্র হাযির নাযির থাকেন, সে কারণেই এখানো তাঁকে সম্বোধন করা হয়।

জবাবঃ যাকে সম্বোধন করা হবে, তাকে অবশ্যই হাযির নাযির থাকতে হবে, সম্বোধন করার জন্যে এমনটির কোনো প্রয়োজন নেই। অদৃশ্য অবস্থায়ও সম্বোধন করা যেতে পারে। মনে মনে স্মরণ করেও কাউকে সম্বোধন করা যেতে পারে। কোনো বিষয়কে আকীদা বিশ্বাসে পরিণত করার জন্যে সে বিষয়ে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল কি বলেছেন তা সম্মুখে রেখেই ফায়সালা করতে হবে। আকীদা বিশ্বাস হচ্ছে সেই জিনিস যে বিষয়ে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন এবং যা গ্রহণ করা এবং না করার ভিত্তিতে জান্নাত কিংবা জাহান্নামের ফায়সালা হবে। এধরনের বিষয়গুলো আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল অত্যন্ত পরিষ্কার ও স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, যাতে করে তা আকীদাগত বিষয় হবার ব্যাপারে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ না থাকে। যে সব বিষয়ের উপর মানুষের মুক্তি নির্ভরশীল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তা কখনো অস্পষ্ট রাখেননি। একবার কুরআনের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে দেখুন, তাওহীদ, আখেরাত এবং নবী করীম (সাঃ) এর রিসালাত প্রভৃতি যেগুলোর উপর বিশুদ্ধ আকীদা বিশ্বাস পোষণ করার উপর পরকালের মুক্তি নির্ভরশীল, সেগুলো কতোটা স্পষ্ট করে এবং বারবার করে বলে দেয়া হয়েছে, যাতে করে সকল প্রকার সন্দেহ সংশয় থেকে হিদায়াতের পথ স্বচ্ছ সাফ হয়ে যায়। নবীর হাযির নাযির হওয়াটা যদি এধরনের কোনো বিষয় হতো যার জন্যে মানুষকে পরকালে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য করা হবে, তবে আল্লাহ তাআলা তা অবশ্যই পরিষ্কার করে বলে দিতেন। আইয়্যুহান্নাবীউ থেকে টেনে হেঁচড়ে তা বের করার প্রয়োজন হতোনা আল্লাহ তাআলা পরিষ্কার করে বলে দিতেন, "হে মানুষ, আমার নবী সদা সর্বত্র হাযির নাযির।"

১০১. ইসলামী রাষ্ট্রে সাহিত্যের স্থান

প্রশ্নঃ ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে, তাতে সাহিত্যের মর্যাদা কি হবে? যদি তার কোনো মর্যাদা দেয়া হয় তাবে তার স্বরূপ কি হবে? তাতে মেয়েদের ভূমিকা কি হবে? গল্প এবং নাটক কি থাকতে দেয়া হবে না? এগুলো ছাড়াতো জীবন নীরস হয়ে যাবে।

জবাবঃ জীবন যখন হারাম সজীবতায় অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন সে হালাল সজীবতার তৃষ্ণা অনুভব করে। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে, জীবন ধীরে ধীরে বৈধ রীতিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। তখন ঐধরনের সাহিত্যের প্রতি আপনার মধ্যে ঘৃণার সৃষ্টি হয়ে যাবে, যেগুলোকে আপনি এখন রসালো মনে করছেন। নির্লজ্জ নোংরা জিনিস কি করে সাহিত্য হতে পারে? ইসলামী রাষ্ট্র সেইসব সাহিত্য সৃষ্টিতে উৎসাহিত করবে যা হবে সভ্য মানুষের জন্যে রুচিকর, মানুষ বানানোর হাতিয়ার এবং সততা এবং সত্যের উদ্দীপক। তাতে নারীর শিল্প নৈপূন্যের কি প্রয়োজন? নারী হচ্ছে ঘরের রানী। তারা মা বোন। মঞ্চে নৃত্য করা এবং প্রবৃত্তির কামনায় সুড়সুড়ি দেয়া তাদের কাজ নয়। নারীকে নাচিয়ে সৌন্দর্য উপভোগ করা ইসলাম হতে পারেনা। যে ইসলামী রাষ্ট্রে (?) নারীদের মঞ্চে উঠিয়ে নাচানো হয়, তা ইসলামী রাষ্ট্র নয়।[১]

১০২. দু'আ কি?

প্রশ্নঃ দু'আ বলতে কি বুঝায় এবং এর তাৎপর্যই বা কি?

জবাবঃ দু'আ মূলত একথার স্বীকৃতি যে, আপনিই জগতের সব কিছু নন। আপনার উপরে এক মহা শক্তিমান সত্তা রয়েছেন, যিনি আপনার ভালো মন্দ নিয়ন্ত্রণ করছেন। তিনি ইচ্ছা করলে আপনার পার্থিব যবিতীয় বিষয়ে আপনাকে সফলকাম করে দিতে পারেন। আর তাঁর ইচ্ছা না হলে, আপনার ভাগ্যে নেমে আসতে পারে চরম ব্যর্থতা।–এ মহাসত্যের অনুভূতি যার মধ্যে রয়েছে, তিনি অবশ্যি উর্ধ্বতন সেই মহাশক্তিমানের কাছে প্রার্থনার হাত বাড়িয়ে দেবেন। সেই সব বিষয়ে তাঁর কাছে বিনয়ের সাথে প্রার্থনা করবেন, যেগুলো নিজের নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতার বাইরে।

---

১. এশিয়া লাহোর ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৬২

১০৩. দু'আ কি পূর্ণ হয়?

প্রশ্নঃ মানুষ আল্লাহর কাছে যে দু'আ প্রার্থনা করে, তা কি পূর্ণ হয়?

জবাবঃ জী হ্যাঁ, দু'আ অবশ্যি পূর্ণ হয়। এমন এমন কাজ হয়ে যায়, যেগুলো সম্পর্কে বুঝাই যায় না যে, কী করে তা হয়ে গেল? এমনও হয়ে থাকে যে, এক ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হলো। ডাক্তার তার রোগ নির্ণয় করতে ব্যর্থ হয়ে যান। কিন্তু আল্লাহ তাকে সুস্থতা দান করতে চাইলে বিনে পয়সার ঔষধেই কাজ হয়ে যায়।

নাস্তিক দু'আ করেনা। কিন্তু আলাহর ইচ্ছার যে বিধান জগতময় কার্যকর রয়েছে, তারই অধীনে তার কাজও পূর্ণ হয়। আর একজন মুমিন দু'আ করেন। তার কাজও সম্পন্ন হয়। এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো এই যে, প্রথমোক্ত ব্যক্তির কাজতো জগতের অনিবার্য নিয়মের অধীনে সম্পন্ন হয়। তার সাথে আল্লাহ বিশেষ কোনো সম্পর্ক রাখে না। পক্ষান্তরে শেষোক্ত ব্যক্তির কাজই শুধু সম্পন্ন হয় না, সেই সাথে দু'আর জন্যে তিনি বিনিময়ও লাভ করেন এবং তার অবস্থা ও কার্যক্রমের সাথে আল্লাহর রাহমতও শামিল হয়।

১০৪. আপনার কোনো দু'আ কবুল হয়েছে কি?

প্রশ্নঃ আপনার কোনা দু'আ কবুল হয়েছে কি?

জবাবঃ জী হ্যাঁ, আমার অভিজ্ঞতায় বহুবার ধরা পড়েছে যে, দু'আর মাধ্যমে আমার এমন সব কাজ সম্পন্ন হয়েছে, যেগুলো সম্পন্ন হবার জন্যে বাহ্যত কোনো উপায়ই ছিলোনা। সকল দিক থেকে আশার সমস্ত পথ সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে যাবার পর দু'আ সেকাজ সম্পন্ন করে আশার প্রদীপ জ্বেলে দিয়েছে।

১০৫. দু'আ এবং তাকদীর

প্রশ্নঃ মানুষের তাকদীর যদি আগেই নির্ধারিত হয়ে থাকে, তবে দু'আ করা অর্থহীন নয় কি? আল্লাহ তা'আলা কি তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তণ করেন?

জবাবঃ জী হাঁ, PRE-DESTINATION-ও সঠিক এবং দু'আও সঠিক। তকদীরের অর্থ এনয় যে, কোনো একটি জিনিস ফায়সালা করার পর আল্লাহ

তাআলা অক্ষম হয়ে গেছেন। তিনি যেমন ফায়সালা করার ক্ষমতা রাখেন, তেমনি ফায়সালা পরিবর্তন করারও ক্ষমতা রাখেন। হতে পারে তিনি কারো ব্যাপারে পূর্ব থেকে এসিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন যে, সে যদি দু'আ প্রার্থনা করে, তাহলে তার সম্পর্কে আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে দেবো। আর দু'আ প্রার্থনা না করলে তার সাথে পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই কাজ হবে। এ জিনিসটারই পারিভাষিক নাম 'ঝুলন্ত তাকদীর' (তাকদীরে মুআল্লাক)। অর্থাৎ এটা হচ্ছে সেই তাকদীর যাতে আল্লাহ তাআলা রদবদলের অবকাশ রেখে দিয়েছেন। আর "চূড়ান্ত তাকদীর" (তকদীরে মুবরাম) সেই তাকদীর যার সম্পর্কে এই অকাট্য ফায়সালা হয়ে গেছে যে, তা আর পরিবর্তন করা হবেনা[১]

১০৬. সামাজিক অপরাধের শাস্তি

প্রশ্নঃ খোদাদ্রোহী নাফরমান জাতিসমূহকে যেহেতু দুনিয়াতেই তাদের সামাজিক ও সামষ্টিক অপরাধের শাস্তি দিয়ে দেয়া আল্লাহর নীতি, সে কারণে প্রশ্ন জাগে পরকালে আবার তাদের হিসাব কিতাব নেয়া হবে কেন?

জবাবঃ আসলে পৃথিবীতে ঐসব জাতি তাদের সামষ্টিক ও সামাজিক শাস্তি ভোগ করেনা। বরঞ্চ তারা যখন নিজেদের ফিতনা ফাসাদ দ্বারা কোনো জনপদকে বিপর্যস্ত করে দেয়, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের জীবনের অবকাশের যবনিকা টেনে দেন এবং পৃথিবী থেকে তাদের নির্মূল করে দেন। তাদের কৃতকর্মের এটা আসল ফায়সালা নয়, রবঞ্চ এটা এক ধরনের গ্রেফতারী। আসল ফায়সালা তো হবে পরকালে। এই গ্রেফতারী সেই মহাসত্যের নির্দশন যে, নিঃসন্দেহে কোনো মহাশক্তিমান এই বিশ্বজগতের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করছেন। যার পাকড়াও থেকে বাঁচা কারো পক্ষে এবং কোনো প্রকারেই সম্ভব নয়।

১০৭. শাস্তি ও পুরস্কার

প্রশ্নঃ কোনো জাতিকে তার অপরাধের শাস্তি সামষ্টিকভাবে দেয়া হবে? নাকি প্রত্যেক ব্যক্তির পৃথক পৃথকভাবে হিসাব হবে?

---

১. সাপ্তাহিক এশিয়া লাহোর ১৮ জুলাই ১৯৬৯ ঈসায়ী।

জবাবঃ জী হ্যাঁ। পরকালে প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যাপারে পৃথক পৃথক ফায়সালা হবে এবং তাকে তার নিজস্ব আমলের ভিত্তিতে পুরস্কৃত কিংবা দণ্ডিত করা হবে। পৃথিবীতে যতো জাতি, সম্প্রদায় কিংবা দল রয়েছে, সেগুলোর কার্যকারিতা পৃথিবীর ব্যবস্থা পরিচালনা পর্যন্তই সীমিত। পরকালে সকল জোটবদ্ধতা খতম হয়ে যাবে এবং সেখানে মানুষ কেবল দু'টি দলে বিভক্ত হবে। একটি হবে হকপন্থীদের দল আর অপরটি বাতিলপন্থীদের। পৃথিবীর সকল জাতির মধ্য থেকে হকপন্থীদের বেছে বেছে পৃথক করা হবে। একইভাবে পৃথক করা হবে বাতিলপন্থীদের। অতপর ব্যক্তিগত আমলের ভিত্তিতে এদের প্রত্যেকের ফায়সালা করা হবে।

পৃথিবীতে মানুষকে যে শাস্তি দেয়া হয়, সেটাকে চূড়ান্ত ফায়সালা মনে করা ঠিক নয়। পৃথিবীতে কোনো ব্যক্তির আমলের শাস্তি কিংবা পুরস্কার যথাযথভাবে প্রদান করা কোনো অবস্থাতেই সম্ভব নয়। একটি উদাহরণ থেকে কথাটি বুঝে নিন। যেমন, এক ব্যক্তি কোনো জাতির বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিলো এবং সেই যুদ্ধে নিহত হলো লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষ। এখন এই আসল অপরাধীকে পৃথিবীতে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড দেয়া যেতে পারে– এর চাইতে অধিক কোনো শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা এখানে নেই। কিন্তু সেই দন্ড ঐ লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষের জীবনের বিনিময় তো হতে পারেনা। তার শাস্তিতো তার অপরাধ অনুযায়ী হওয়া উচিত। আপনারা দেখেছেন, অনেক সময় বড় বড় অপরাধী এবং পাপিষ্ঠ ব্যক্তিরও পৃথিবীতে কোনো শাস্তি হয়না। খাটের উপর শোয়া অবস্থায় আরামের সাথে তার মৃত্যু হয়ে যায়। যেমন, রাশিয়ায় স্ট্যালিন লক্ষ লক্ষ কৃষককে হত্যা করেছে এবং এর কোনো শাস্তি সে পৃথিবীতে ভোগ করেনি। হিটলার অজার্মান জাতিসমূহের উপর চরম যুলুমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে অজ্ঞাত মৃত্যুবরণ করে। আল্লাহ্ তা'আলার ইনসাফের দাবী হচ্ছে এই যে, এইসব অপরাধীকে তাদের অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করতে হবে। কিন্তু সে শাস্তি কেবল আখিরাতেই প্রদান করা সম্ভব, পৃথিবীতে সে ব্যবস্থা নেই।

একইভাবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, নবী করীমের (সা) বদৌলতে এই পৃথিবীতে কতো সীমাহীন নেকী ও কল্যাণ প্রসার লাভ করেছে এবং ভবিষ্যতেও প্রসার লাভ করতে থাকবে। তিনি এই মহান সৎকর্মের পুরস্কার পৃথিবীতে পেয়েছেন কি? নিঃসন্দেহে এই পুরস্কার ভোগ করার জন্যে প্রয়োজন একটি

চিরন্তন জীবনের। যেখানে তিনি তাঁর রবের পুরস্কারসমূহ পরিপূর্ণভাবে ভোগ করতে পারবেন এবং তাঁর নিয়ামতসমূহের পূর্ণ স্বাদ আস্বাদন করতে পারবেন, যা তাঁকে এই পৃথিবীতে সত্যের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্যে চরম কষ্টের বিনিময়ে আল্লাহতা'আলা প্রদান করবেন। নিঃসন্দেহে পরকাল অনুষ্ঠিত হওয়া ব্যতীত সেই সুযোগ আসা সম্ভব নয়। সকল মানুষের ব্যাপারে এই একই কথা প্রযোজ্য।

১০৮. দোযখের শাস্তির অনুভূতি

প্রশ্নঃ যে ব্যক্তি দোযখে যাবে তার তো ধীরে ধীরে সেখানকার পরিবেশ সয়ে যাবে। অতপর সেখানে তার আবার কিসের কষ্ট হবে? কেননা কষ্টতো একটা ৗঝীইকঅগঝ কঝীু আর তার CORRESPONDING অনুভূতি হচ্ছে আরাম। যে ব্যক্তি কখনো শীতকাল দেখেনি গরমের মাত্রা কম কিংবা বেশী হবার অনুভূতি তো তার মধ্যে থাকার কথা নয়।

জবাবঃ আল্লাহ্ তা'আলা এতোটা অক্ষম নন যে, তিনি কাউকে শাস্তি দিতে চাইবেন অথচ তা দেয়া সম্ভব হবেনা। দোযখে অপরাধীদের শাস্তির পরিকল্পনাই সেভাবে করা হবে যে, সেখানে তারা কেবল শাস্তিই ভোগ করবে। আপনারা কুরআনে দেখেছেন যে, দোযখে আগুনের স্ফুলিঙ্গ হবে এবং সেখানকার অগ্নিশিখা আকাশের সাথে কথা বলবে। এগুলো তো কেবল দোযখের শাস্তির ধারণা দেবার জন্যেই বলা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, শাস্তির ধরন কেবল এতোটুকুই হবে। প্রকৃতপক্ষে দোযখে পাপিষ্ঠদের যে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে পৃথিবীর মানুষের পক্ষে তা কল্পনা করাই সম্ভব নয়।

বেহেশতের ব্যাপারে একই প্রশ্ন করা যেতে পারে যে লোকেরা ওখানে থাকতে থাকতে সেখানকার পরিবেশ তাদের কাছে একঘেঁয়ে হয়ে যাবে। সুতরাং সেখানকার সুখের অনুভবই আর তাদের থাকবেনা। কিন্তু এসবই ভ্রান্ত ধারণা। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কুদরাত না শাস্তি দেবার ব্যাপারে সীমিত আর না নিয়ামত উপভোগ করানোর ব্যাপারে সীমিত। বেহেশতবাসীদের তিনি এমনসব সুযোগ সুবিধা দেবেন যে, প্রতিটি মুহূর্তেই তারা একটি নতুন স্বাদ এবং সুখ অনুভব করবে।[১]

---

১. এশিয়া লাহোর, ১৮ জুলাই ১৯৬৯ ইং।

১০৯. আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা

প্রশ্ন ঃ সূরা তাকভীরের শেষ আয়াত وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ –এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, মানুষের হিদায়াত আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, মানুষ যদি হিদায়াত পেতেও চায় আর আল্লাহর ইচ্ছা যদি তাকে হিদায়াত না দেয়ার হয় তবুও সে নিজের আকাংখা সত্ত্বেও হিদায়াত পাবেনা। মেহেরবাণী করে ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলবেন।

জবাবঃ মানুষ হিদায়াত পেতে চাইলেও আল্লাহ তাকে হিদায়াত দান করবেননা, আয়াতটি থেকে এরূপ অর্থ বের করার অবকাশ কোথায়? অবশ্য একথা বলা হয়েছে যে, এ পৃথিবীতে মানুষের ইচ্ছাই সব কিছু নয় যে, এখানে সে যা ইচ্ছা করবে, যা সিদ্ধান্ত নিবে তাই–ই হয়ে যাবে এবং সে যা ইচ্ছা করবে আল্লাহর ইচ্ছাও অনুরূপ হওয়া জরুরী। মানুষের ইচ্ছার সাথে আল্লাহর ইচ্ছা যুক্ত হওয়া ব্যতিত তা কার্যকর হতে পারেনা। যতোক্ষণনা আল্লাহ তা'আলা পরিবেশকে তার অনুকূল করে দিবেন ততোক্ষণ সে নেক কাজ করতেও সক্ষম নয়, বদ কাজ করতেও সক্ষম নয়। যেমন একব্যক্তি মসজিদে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলো, সেই সাথে আল্লাহ্ তা'আলা তার পায়ে চলন শক্তি দিলেই সে সেখানে যেতে সক্ষম হবে। অনুরূপভাবে চিন্তা করলে দেখতে পাবেন, জীবনের একটি নিশ্বাসও আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ইচ্ছা ব্যতিত মানুষ গ্রহণ এবং ত্যাগ করতে পারেনা।

১১০. অদৃশ্য জ্ঞান

প্রশ্নঃ সূরা আত্ তাকভীরের وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ আয়াতের ব্যাখ্যায় আপনি বলেছেন, নবী করীম (সাঃ) কে যে জ্ঞান দেয়া হয়েছিলো তা কেবল তাওহীদ ও আখিরাত সংক্রান্ত জ্ঞান। অবশিষ্ট সকল অদৃশ্য জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকটই রয়েছে। তাহলে কিরামান কাতেবীন যে আমলনামা লিখছেন তা কি কেবল তারা বাহ্যিক আমলের ভিত্তিতেই লিখছেন নাকি নিয়্যতের অবস্থাও তাতে শামিল রয়েছে? যদি শামিল থেকে, থাকে তবে তা কি অদৃশ্য জ্ঞান নয়? মেহেরবানী করে ব্যাপারটি স্পষ্ট করবেন।

জবাবঃ প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলা যার থেকে যে কাজ গ্রহণ করতে চান সে অনুপাতে তাকে অদৃশ্য জ্ঞান দান করেন। যেমন, নবুয়্যতের দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার জন্যে নবী করীম (সাঃ) এর যতটুকু অদৃশ্য জ্ঞানের প্রয়োজন ছিলো ততোটা অদৃশ্য জ্ঞান তাকে তিনি দান করেছেন। নবী হবার পর তিনি যদি মানুষকে একথা বলতেন যে, আমার বিবেক বুদ্ধি বলছে, আল্লাহ তা'আলা এক, মরণের পর সব মানুষকে পুনরুত্থিত করা হবে, এবং তাদের আমলের হিসাব কিতাব হবে, অতপর তাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামে প্রেরণ করা হবে তবে কোনো মানুষই তাঁর এই ব্যক্তিগত অনুমানের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করতোনা। তাই এইসব অদৃশ্য ব্যাপার তাঁর নিকট উম্মুক্ত করা হয়েছিলো এবং তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে বলেছেন, এগুলো আন্দাজ অনুমান নয়, আমার স্বচক্ষে দেখা বাস্তব সত্য আমি তোমাদের বলছি।

হাদীসে এসেছে- انما الاعمال بالنيت অর্থাৎ আমল নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল। তাই যেসব ফেরেশ্তা আমলনামা লেখার দায়িত্বে নিয়োজিত, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা নিয়্যত সম্পর্কে অদৃশ্য জ্ঞান দান করেছেন। তাদের কাছে এই জ্ঞান না থাকলেতো তাদেরকে আমলের বাহ্যিক দিকই লিখতে হবে। আর বাহ্যিক দিক বিচারে আমলের মর্যাদা নির্ণীত হতে পারেনা। যেমন, এক ব্যক্তি মসজিদ থেকে বের হবার সময় অপর মুসল্লির জুতা পরে নিয়ে গেল। এখন সে যদি ভুলে একাজ করে থাকে তাবে তার আমলনামায় লেখা হবে, জুতা চুরির নিয়্যত তার ছিলোনা বরঞ্চ ভুলে জুতা বদল হয়েছে। কিন্তু জুতা চুরিই যদি তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে আমলনামায় বাহ্যিক কাজটির সাথে সাথে নিয়্যতের অবস্থাও লিখিত হবে। এই অদৃশ্য জ্ঞানটি কেবল সেই ফেরেশতাদেরই দেয়া হয়েছে যারা আমলনামা লেখার কাজে নিযুক্ত। অপর ফেরেশ্তাদের এজ্ঞান দেয়া হয়নি।

একইভাবে জগতে এমন কেউ নেই, যাকে যিন্দেগীর দায়িত্ব অনুযায়ী আংশিক অদৃশ্য জ্ঞান দেয়া হয়নি। কিন্তু সে অদৃশ্য জ্ঞানী (আলিমুল গায়িব) নয়। আলিমুল গায়িব তো কেবল আল্লাহর সত্তা, যিনি পূর্ণাংগ ইলমে গায়িবের মালিক।[১০]

---

১০. এশিয়া লাহোর ১৬ অক্টোবর ১৯৬৯ ইং।

১১১. নফ্স ও শয়তান

প্রশ্নঃ শয়তান বলতে কি বুঝানো হয়েছে? এটা কি মানুষের নফ্স, নাকি কোনো বহিঃশক্তি যা মানুষকে প্ররোচিত করে?

জবাবঃ শয়তান নিঃসন্দেহে একটি বাহিঃশক্তি, যে মানুষের নফ্সের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে তাকে প্ররোচিত করে এবং বিপথে পরিচালিত করে। অবশ্য মানুষের নফস্ শয়তান থেকে কম নয়।

১১২. বিজ্ঞান ও আল্লাহ

প্রশ্ন ঃ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রাচীন ধারণাসমূহকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করেছে। এখন জীবনের সকল রহস্য মানুষ অবগত। সে এখন জানে দুটি শুক্রকীটের সংযোগের ফলে মানব বংশ অস্তিত্ব লাভ করে। দেহবিজ্ঞান মৃত্যুর আগ্রাসী ছোবলকে পিছু হটিয়ে দিয়েছে। এমতাবস্থা এক অদেখা সত্তার প্রতি ঈমান আনা অন্তত বিজ্ঞানীদের জন্যে প্রয়োজন নেই।

জবাব ঃ সত্যিকার বিজ্ঞানীর জন্যে তার সে জ্ঞান এসাক্ষী দেয়ার জন্যে যথেষ্ট যে, অবশ্যই এক অদৃশ্য সত্তা বর্তমান রয়েছেন এবং তিনিই এই বিশ্বব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক। বিজ্ঞানীরা এটা জানে যে, দুটি শুক্রকীটের যোগাযোগের ফলে মানব বংশ অস্তিত্ব লাভ করে, কিন্তু সেই শুক্রকীটগুলোর বংশ কোত্থেকে এসেছে তা তারা জানেনা। তারা এই সীমাহীন সৃষ্টিজগতের দিকে দৃষ্টি দিলে অবশ্যি একথা স্বীকার করা ছাড়া তাদের কোনো গত্যন্তর নেই যে, তাদের জ্ঞান মহাসমুদ্রের তুলনায় এক ফোঁটা পানির সমানই মাত্র। এমতাবস্থায় সুস্থ বিবেকের মানুষ আল্লাহর সত্তাকে অবশ্যই স্বীকার করে নেয়। কিন্তু যাদের মগজে রয়েছে বক্রতা, তারা নিজেদের এই স্থূল জ্ঞানের অহমিকায় বিভ্রান্ত হয়ে যায়।[২]

১১৩. সত্যের মাপকাঠি

প্রশ্নঃ নবী করীম (সাঃ) এর সত্তা সত্যের মাপকাঠি। কুরআনের বিভিন্ন আয়াত এবং আপনার সাহিত্য থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু মা'রূফের শর্ত

---

২. এশিয়া লাহোর ২ নভেম্বর ১৯৬৯ ইং।

যদি নবীর আনুগত্যের জন্যে আরোপ করা হয়, তবে মা'রূফ এবং মুনকার কিভাবে চেনা যাবে?

জবাবঃ ভুল বুঝা বুঝির কারণে এ প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাহ্ থেকেই মা'রূফ এবং মুনকারের পরিচয় জানা যায়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যে বলেছেন, لا يعصينك في معروف (কোনো মু'রূফ কাজে নির্দেশ অমান্য করবেনা) এর অর্থ এই নয় যে, নবী করীম (সাঃ) ও বুঝি মা'রূফের বিপরীত নির্দেশ প্রদান করতেন। বাক্যটি থেকে এরূপ কদ অর্থ বের করার কোনো অবকাশ নেই। তিনি তো ছিলেন ভুলের উর্ধ্বে। তাঁর সকল হুকুমই ছিলো মা'রূফ। এখানে মূলত 'আমরবিল মা'রূফ এবং নাহি আনিল মুনকারের' গুরুত্ব প্রকাশ করা হয়েছে। এর তাৎপর্য হলো এই যে, কুরআন সুন্নাহর বিধানের বিপরীত কোনো হুকুম দেয়া হলে তার বিরোধিতা করা আবশ্যক।

১১৪. কবীরা এবং সগীরা গুনাহ

প্রশ্নঃ কবীরা এবং সগীরা গুনাহর পরিচয় কি?

জবাব ঃ সংক্ষিপ্তভাবে বুঝে নিন যে, কবীরা হচ্ছে সেই গুনাহ্, কুরআন সুন্নায় সুস্পষ্টভাবে যা করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং যেগুলোর কোনোটির দায়ে কেহ অপরাধী হলে দুনিয়াতে তার শাস্তি বিধানের নির্দেশ রয়েছে, কিংবা পরকালে শাস্তি প্রদানের দুঃসংবাদ শুনানো হয়েছে। অবশিষ্ট সকল নিন্দনীয় ও অপছন্দনীয় কাজই সগীরা গুনাহের সংজ্ঞায় পড়ে।

১১৫. গর্ভপাত

প্রশ্ন ঃ কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, তাদের থেকে এই শপথও নেও যে, তারা নিজেদের সন্তান হত্যা করবেনা। এই আয়াতের দৃষ্টিতে গর্ভপাতও কি সন্তান হত্যার সংজ্ঞায় পড়ে?

জবাব ঃ অধিক সন্তান হবার ভয়ে যে গর্ভপাত করানো হয় শরীয়তের দৃষ্টিতে তা সন্তান হত্যারই শামিল। তবে মায়ের জীবন যদি চরম সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে এবং গর্ভপাতই মায়ের জীবন রক্ষার একমাত্র উপায় বলে ডাক্তার মনে করেন তবে এমতাবস্থায় তা বৈধ এবং অভিমতের বাস্তবতা ও অবাস্তবতার ব্যাপারে ডাক্তার দায়ী।

১১৬. হুজুর (সাঃ) এর পবিত্র নাম

প্রশ্ন ঃ নবী করীম (সাঃ) এর দাদা যে তার নাম মুহাম্মদ রেখেছিলেন তা তো ঐতিহাসিকভাবে সত্য। কিন্তু তাঁর অপর নাম "আহমদ" কখন কোথা থেকে কিভাবে পেলেন, সেসম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায়না। নবুয়্যতের পূর্বে ঐশেষোক্ত নামটি তো তেমন পরিচিতি লাভ করেনি। বিষয়টি স্পষ্ট করবেন।

জবাব ঃ "আহমদ" নাম সম্পর্কে ইতিহাসে কোনো তথ্য না পাওয়াটা, তাঁর নাম আহমদ ছিলো না বলে দাবী করার দলিল হিসাবে যথেষ্ট নয়। হাদীসে এবিষয়ে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। নবী করীম (সাঃ) স্বয়ং বলেছেন, আমার নাম "আহমদ"। অতপর নবী করীমের (সাঃ) মহব্বতের নিদর্শন স্বরূপ শতাব্দীর পর শতাব্দী মুসলমানরা নিজেদের সন্তানের নাম আহমদ রেখে এসেছে। মিথ্যা নবুয়্যতের দাবীদার গোলাম আহমদের বাপ তার এই নাম নবী করীমের (সাঃ) নামের প্রতি দৃষ্টি রেখেই রেখেছিলেন।

১১৭. ইঞ্জিল এবং তাওরাতের অনুসরণ

প্রশ্ন ঃ বর্তমান কালের ইহুদী, খৃষ্টানরা যেহেতু এটা জানেনা যে, অতীতের লোকেরা ইঞ্জিল এবং তাওরাতের মধ্যে কি রদবদল করেছিলো। তাই তারা যদি নিষ্ঠার সাথে এই কিতাবগুলোর অনুসরণ করে, তবুও কি তারা কাফির এবং জাহান্নামী হবে?

জবাব ঃ কোন্ কোন্ স্থানে রদবদল হয়েছে বর্তমান ইহুদী, খৃষ্টানরা একথা না জানলেও গ্রন্থ দুটিতে যে রববদল করা হয়েছে তাতো তারা জানে। তাছাড়া কোনো ব্যক্তি যদি চোখ খুলে বাইবেল পড়ে দেখে, তবে রদবদল করা অংশগুলো তার দৃষ্টি এড়াতে পারেনা। যেমন বাইবেলের প্রথম পাঁচ পুস্তকে যেসব কথা বলা হয়েছে তা পড়ার পর সেগুলোকে খোদার কালাম বলে অভিহিত করা তো দূরের কথা, কোনো ভদ্র ও বিবেকবান ব্যক্তির বক্তব্য বলেও বিবেচনা করা যেতে পারেনা। উদাহরণ হিসাবে ইয়াকুব (আঃ) এর আল্লাহর সাথে কুস্তি লড়ার ঘটনা এবং হারুন (আঃ) এর প্রতি গোবাছুর বানানোর অভিযোগ প্রভৃতি চরম নোংরা ও অনৈতিক ঘটনাবলী আম্বিয়ায়ে কিরামের সাথে সম্পৃক্ত করার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

অনুরূপভাবে খৃষ্টানদের কাছে যে চারটি ইঞ্জিল নির্ভরযোগ্য সেগুলোতে একই ঘটনা বিভিন্নরূপ, শব্দ ও বর্ণনার মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে। স্বয়ং খৃষ্টান আলেমরাই স্বীকার করেছেন যে, এগ্রন্থগুলো পরবর্তীকালে সংকলিত হয়েছে এবং পূর্ণগ্রন্থ আল্লাহর বাণী নয়। অবশ্য আল্লাহর কিছু বাণী সেগুলোতে বর্তমান আছে।

ঐশী গ্রন্থাবলীর মধ্যে একমাত্র কুরআনই হচ্ছে সেই কিতাব যা সর্বপ্রকার ভেজাল মুক্ত। কুরআনের প্রতি ঈমান আনা এবং তার শিক্ষানুযায়ী জীবন যাপন ব্যতিত বর্তমানে মুক্তি সম্ভব নয়।[১]

১১৮. সপ্তাকাশ

প্রশ্ন : আপনি বিগত দারসে কুরআনে বলেছিলেন, প্রতিটি নক্ষত্রের আকর্ষণবলয় একটি আকাশ। ব্যাপার যদি তাই হয় তবে তো কেবল সাতটি নয় বরঞ্চ মহাশূন্যে কোটি কোটি আকাশের অস্তিত্ব বর্তমান আছে বলে ধরে নিতে হয়। অথচ কুরআন বারবার সাত আকাশের কথাই উল্লেখ করেছে।

জবাব : প্রতিটি নক্ষত্রের আকর্ষণবলয় এবং পরিমন্ডল এক একটি আকাশ, একথা আমি কখন বললাম? আমি তো একথা বলেছি যে, আকাশের রহস্য সম্পর্কে আমরা কিছুই জানিনা। অবশ্য কুরআনের বাণী থেকে মনে হয় যে এই সৃষ্টি জগতকে সাতটি স্তরে ভাগকরা হয়েছে এবং প্রতিটি স্তর তার নিজস্ব অবস্থানে একটি আকাশ। কিন্তু এসব স্তরের প্রকৃত স্বরূপ যে কি মানুষের পক্ষে তা এখনো বুঝা সম্ভব হয়নি।

১১৯. গুনাহগারদের পরিণতি

প্রশ্ন : বলা হয়ে থাকে কেবল কাফির আর মুশরিকরাই শেষ পর্যন্ত দোযখে থাকবে। অন্যান্য গুনাহগারদের দোযখে নির্দিষ্ট শাস্তি হবার পর জান্নাতে পাঠিয়ে দেয়া হবে। এ বক্তব্য কি ঠিক?

---

১. এশিয়া লাহোর ৬ আগষ্ট ১৯৬৭ ইং।

জবাব ঃ হ্যাঁ, এবক্তব্য সঠিক। কুরআন হাদীসে এবক্তব্য পাওয়া যায় যে, গুনাহগার লোকদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং একটা নির্দিষ্ট মুদ্দতের পর তাদের জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে পাঠিয়ে দেয়া হবে।

১২০. একজন পাকিস্তানী চিন্তাবিদের অভিমত

প্রশ্ন ঃ আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্কের ভিত্তি কিছুতেই "ভয়" হতে পারেনা। এমতবাদ হচ্ছে একজন পাকিস্তানী চিন্তাবিদের। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

জবাব ঃ এমতবাদ কুরআন এবং হাদীস উভয়ের সাথে সাংঘর্ষিক। কুরআন হাদীসের বহু জায়গায় বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌কে ভয়ও করো এবং মহব্বতও করো। ডর ভয়, লোভ আকাংখা, মহব্বত ভালোবাসা এগুলো হচ্ছে মানুষের প্রকৃতিগত অনুভূতি। বাস্তব জীবনের প্রতি মুহূর্তে মানুষের থেকে এগুলোর অভিব্যক্তি ঘটতে থাকে। মানুষকে সঠিক পথে রাখার জন্যে আল্লাহ তা'আলা এসব প্রকৃতিগত অনুভূতি তাঁর সত্তার সাথে সম্পৃক্ত করতে বলেছেন। যাতে করে মানুষের সেসব অনুভূতিতে সমতা ও সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে এবং এসব অনুভূতি তার জীবনে নেকী ও কল্যাণ প্রসারের মাধ্যম প্রমাণিত হয়। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে, "তোমাদের রবকে ভয় করো।" এখন যে ব্যক্তি তার রবকে ভয় করবে, গোটা দুনিয়ার ভয় সে তার অন্তর থেকে বের করে দিতে সক্ষম হবে। দুনিয়ার কোনো শক্তিই তাকে সত্যপথ থেকে ফেরাতে সক্ষম হবেনা। পক্ষান্তরে সে যদি আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে ভয় করে, তবে তাদের ভয়ে অনেক ভাল কাজ তাকে ত্যাগ করতে হবে। একইভাবে বলা হয়েছে, কামনা বাসনা ও আকাংখা করবে কেবল আল্লাহর থেকে। অর্থাৎ দুনিয়াতে অপর কারো কাছে কামনা করোনা। আকাংখা করবে কেবল নিজের রবের কাছে। এখন একথা পরিস্কার, যে ব্যক্তি খোদার নিকট আকাংখা পোষণ করবে, সে কখনো অন্যায় কাজে নিজের জানমাল নিয়োজিত করতে পারেনা। সে কেবল নেক কাজেই এগুলো নিয়োগ করবে। একইভাবে আল্লাহ তা'আলার মহব্বতও মানুষকে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হতে দেয়না। যে চিন্তাবিদ আল্লাহ্‌র সাথে

মানুষের সম্পর্কের ভিত্তি কখনো ভয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বলেছেন তিনি কথাটা ভেবে চিন্তে বলেননি।[১]

১২১. মানুষ পরকালে কি ধরনের ব্যক্তিত্ব নিয়ে উঠবে

প্রশ্ন ঃ আপনি তাফহীমুল কুরআনের এক স্থানে লিখেছেন ঃ "যে ব্যক্তি যে ধরনের ব্যক্তিত্ব নিয়ে মৃত্যুবরণ করে সে কিয়ামতের দিন সেধরনের ব্যক্তিত্ব নিয়ে উঠবে?" তাহলে যে ব্যক্তি রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে মরবে, সে কি সেখানে রাষ্ট্র প্রধান হিসেবেই উঠবে? আর যে নিঃস্ব অবস্থায় মরবে, সে কি ভুখা নাংগা অবস্থায় উঠবে?

জবাব ঃ 'ব্যক্তিত্ব' (PERSONALITY) সেই জিনিসের নাম নয়, যার দায়িত্ব মানুষ বাহির থেকে গ্রহণ করে বা অর্পিত হয়। বরঞ্চ, ব্যক্তিত্ব হচ্ছে, কোনো ব্যক্তির সেই অবস্থার নাম, যা সে নিজস্ব সত্তাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে এবং বিশেষ ধরনের জীবন যাপন করার মাধ্যমে তার মধ্যে বিকশিত করে তোলে। অন্যকথায় ব্যক্তি তার নফ্স, রূহ, নৈতিকতা এবং চরিত্র ও আচরণকে যে মানে প্রতিষ্ঠিত করে, সেটাই তার ব্যক্তিত্ব।

যেমন ধরুন, এক ব্যক্তি কোনো দেশের প্রেসিডেন্ট হন। অতপর প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি ইনসাফ ও ন্যায় বিচার করেন, মানুষের সেবা করেন, দেশে সত্য ও সততার প্রসার ও প্রতিষ্ঠা করেন, অন্যায় ও দুষ্কৃতির মূলোৎপাটন করেন এবং রাষ্ট্রের সকল উপায় উপকরণ আল্লাহ্র দ্বীন বুলন্দ করার কাজে ব্যবহার করেন আর এ অবস্থায়ই তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। এখন এব্যক্তি আদালতে আখিরাতে রাষ্ট্রপতি হিসেবে উত্থিত হবেননা। বরং তিনি উঠবেন এমন একজন মানুষ হিসেবে, যিনি পৃথিবীতে নেকীর প্রসার করেছেন এবং আল্লাহর দ্বীনকে বুলন্দ করার জন্যে কাজ করেছেন। অন্য কথায় সেদিন তিনি নেক ও অতি উত্তম ব্যক্তিত্ব (PERSONALITY) নিয়ে উঠবেন।

পক্ষান্তরে আরেক জন লোক কোনো দেশের প্রেসিডেন্ট হলো। কিন্তু প্রেসিডেন্ট হিসেবে মানুষের উপর যুলুম শোষণের নীতি গ্রহণ করে। জনগণের সম্পদ লুণ্ঠন করে। নানা প্রকার গাদ্দারীতে নিমজ্জিত হয় এবং জনগণের উপর

---

১. সাপ্তাহিক এশিয়া লাহোর ৭ আগষ্ট ১৯৬৯ ইং।

অত্যাচার নির্যাতন চালায়। আর এ অবস্থায়ই দুনিয়া ত্যাগ করে। কিয়ামতের দিন সে প্রেসিডেন্ট হিসেবে উঠবেনা। বরঞ্চ সে ধূর্ত চোর এবং ডাকাত হিসেবে উত্থিত হবে। কারণ দুনিয়ায় ক্ষমতার দাপটে সে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করেছিলো। বস্তুতঃ ব্যক্তিত্ব মানে মানুষের নৈতিক ব্যক্তি সত্তা। এটা কোনো অর্পিত এবং বাহ্যিক পদমর্যাদা নয়।

১২২. হারাম শরীফের সীমানায় ভিক্ষাবৃত্তি

প্রশ্ন ঃ হারাম শরীফের সীমানায় ভিক্ষাবৃত্তি কি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ? যেমন হযরত আলী (রাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে কঠোরভাবে একাজ করতে নিষেধ করেছেন।

জবাব ঃ হযরত আলী (রাঃ) যা করেছিলেন সে ব্যাপারে একথা খেয়াল রাখা দরকার যে, তিনি কোনো পুলিশী কাজ করেননি, বরঞ্চ এই কাজ থেকে বিরত থাকার জন্যে লোকটিকে নৈতিকভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তিনি দেখলেন, হজ্জের দিনে স্বয়ং আরাফাত ময়দানে একজন মুসলমান আল্লাহর পরিবর্তে মানুষের নিকট প্রার্থনা করছে। তিনি তাকে একথা শিক্ষা দিলেন, এই আরাফার দিনে আল্লাহর পরিবর্তে মানুষের নিকট প্রার্থনা করাটা ভালো কাজ নয়। তোমাকে অন্তত রাত আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত।

হযরত আলী (রাঃ) মূলত এভাবে লোকটির আত্মশুদ্ধির কাজ করেছিলেন।

১২৩. মসজিদে ব্যবসা

প্রশ্ন ঃ হাদীস থেকে জানা যায়, রাসূল করীম (সাঃ) একবার জনৈক ব্যক্তিকে ভিক্ষাবৃত্তি ত্যাগ করে শ্রমের মাধ্যমে উপার্জনের শিক্ষা দিয়েছিলেন। এসময় তিনি মসজিদে নববীতে লোকটির পেয়ালা এবং কম্বল নিলামে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এহাদীসের ভিত্তিতে কি মস্‌জিদে নিলাম কিংবা অন্য কোনো ব্যবসায়িক লেনদেনের বৈধতা ধরে নেয়া যেতে পারে?

জবাব ঃ এক ধরনের নিলাম হচ্ছে ব্যবসায়িক নিলাম। এরূপ নিলামের ব্যাপারে একথা পরিষ্কার যে, তা মসজিদে বৈধ নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাঁর মসজিদকে নিলাম ঘর বানাননি। আরেক ধরনের নিলাম হচ্ছে, সেই নিলাম যা আল্লাহর কোনো বান্দাকে দূরাবস্থা থেকে রক্ষা করার এবং কল্যাণের পথ

দেখানোর জন্যে করা হয়। যেমনটি নবী করীম (সাঃ) মসজিদে নববীতে করেছিলেন। এতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই যে, তাঁর একাজটি ছিলো উপদেশ ও আত্মশুদ্ধির কাজ। কারণ আত্মশুদ্ধি তো কেবল আল্লাহ আল্লাহ করার শিক্ষাদান করা নয়। বরঞ্চ মানুষের মনমগজ থেকে নৈতিক ও চারিত্রিক ত্রুটিকে দূর করে দিয়ে তদস্থলে উত্তম নৈতিক চরিত্র সৃষ্টি করে দেয়ার নামই হচ্ছে আত্মশুদ্ধি করা। আত্মশুদ্ধির এই কাজ বিভিন্ন পন্থায় হতে পারে। আল্লাহ্ আল্লাহ্ শিখানোর দ্বারা হতে পারে, নামায এবং রোযার প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে হতে পারে, হালাল উপার্জনে উদ্বুদ্ধ করা এবং হারাম উপার্জন বর্জন করার শিক্ষাদানের মাধ্যমে হতে পারে। এ কাজের জন্যে অনুরূপ অন্যান্য পন্থাও রয়েছে। মোটকথা, নবী করীম (সাঃ) প্রকৃতপক্ষে মসজিদে ব্যবসায়িক নিলামের কাজ করেননি, বরঞ্চ তিনি করেছেন আত্মশুদ্ধির কাজ।

১২৪. কুরআন পড়ে ভুলে যাওয়া

প্রশ্ন ঃ এক হাদীসে কুরআন পড়ে ভুলে গেলে কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি হবে বলে উল্লেখ আছে। হাদীসে বলা হয়েছে, এমন ব্যক্তি কিয়ামতের দিন কর্তন করা হাত নিয়ে উঠবে। এই শাস্তি কি কয়েকটি আয়াত এবং একটি সূরা ভুলে গেলেও প্রযোজ্য হবে?

জবাব ঃ যে হাদীসে কথাটা বলা হয়েছে সেখানে তার 'অর্থ মনে না থাকার' ভুলে যাওয়া নয়। বরঞ্চ তার অর্থ সেই ভুলে যাওয়া যা অবহেলা ও উপেক্ষা করার কারণে হয়ে থাকে। যেমন, কোনো ব্যক্তিকে কুরআনের কয়েকটি সূরা মুখস্ত এবং নামায শিক্ষাদান করানো হলো। অতপর সে নামায ত্যাগ করে এবং নামায ছেড়ে দেয় এবং কুরআন পড়ার কোনো প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করেনি। এতে করে ধীরে ধীরে সে কুরআন ভুলে যায়। এমন কি 'কুলহু আল্লাহু' সূরাটি পর্যন্ত তার মুখস্ত থাকেনি। অনুসন্ধান করলে আপনি বাস্তবিকই এধরনের অনেক লোকের সন্ধান পাবেন। নামাযে দাঁড় করিয়ে দিলে সূরা ফাতিহা এবং সূরা ইখলাসও পড়তে পারেনা। নামাযের তরতীব এবং নামাযে কি পড়তে হয় তাও

তার মনে আসেনা। প্রকৃত পক্ষে উক্ত হাদীসে এরূপ ভুলে যাওয়াকেই শাস্তি যোগ্য অপরাধ বলা হয়েছে।[১]

১২৫. আকাশের তাৎপর্য

প্রশ্ন ঃ কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, সেদিন আকাশ বিচূর্ণ হবে। বিজ্ঞানীদের ধারণা আকাশ বলতে কোনো জিনিস নেই। খুব বেশী হলে দৃষ্টির সীমাকে আকাশ বলা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে আকাশ বলতে কি বুঝায়?

জবাব ঃ আসলে কুরআন মজীদ বিজ্ঞানের ভাষায় অবতীর্ণ হয়নি, হয়েছে সাহিত্যের ভাষায়। যেমন কুরআনে যখন 'অন্তর" শব্দ বলা হয়, তখন তার অর্থ বুকের ভিতরকার সেই রক্ত গ্রহণ এবং বের করে দেয়ার পাম্প বুঝানো হয়না, বরঞ্চ বুঝানো হয়, চিন্তা করার ও অনুধাবন করার সেই মনকে যা দিয়ে মানুষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। এই জিনিসকেই আপনারা বলেন, 'না ভাই আমার অন্তর সাক্ষ্য দেয়না'।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বুকের মধ্যে রক্ত সঞ্চালনের যে পাম্পটি রয়েছে তা কি সত্যিই সাক্ষ্য দেয়? প্রকৃতপক্ষে 'আমার মন সাক্ষ্য দেয়না' বলে আপনি আপনার বোধিগত অতুষ্টির কথাই প্রকাশ করছেন। একইভাবে কুরআন মজীদে আকাশ মানে দৃষ্টির সীমা নয়, বরঞ্চ তা উর্ধ্ব জগত এবং জগতের কোনো মহাব্যবস্থাপনা যা আপনি আপনার উপরে দেখতে পাচ্ছেন। যেমন গ্রহ নক্ষত্র। এর প্রত্যেকটি নিজ নিজ অবস্থানের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। সুনির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরছে। বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হচ্ছেনা। বুঝা যাচ্ছে, এ এক সুদৃঢ় ব্যবস্থাপনা, যা উর্ধ্ব জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত। এমন এক সুদৃঢ় কাঠামো, যেখানে সব কিছুর একটির সাথে অপরটির রয়েছে অটুট বন্ধন। এখন কেউ যদি বলে, যা আমি দেখিনা তার কোনো অস্তিত্ব নেই, তবে তার চেয়ে বড় আহমক আর কেউ হতে পারে কি?

বিজ্ঞানীরা আকাশ থাকা বা না থাকার যে ধারণাই পোষণ করুক না কেন, কুরআন মজীদে যখন আকাশ উল্লেখ করা হয় তখন এর অর্থ হয় উর্ধ্ব জগত। আর আকাশ বিচূর্ণ করার অর্থ হলো, উর্ধ্ব জগতের ব্যবস্থাপনা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে

---

[১]. এশিয়া লাহোর ১৬ ডিসেম্বর ১৯৬৮।

যাওয়া। অর্থাৎ সেই সুদৃঢ় কাঠামো, যার মধ্যে সুনিয়ন্ত্রিত হচ্ছে উর্ধ্ব জগত। তা এক সময়ে বিচূর্ণ হয়ে যাবে এবং সব কিছু ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে।

১২৬. সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার ক্ষমতা কল্পনার ভ্রান্তি

প্রশ্নঃ আযরাঈল যদি একই সময় অসংখ্য মানুষের জান কবজ করতে পারে এবং ইবলিস যদি একই সময় পৃথিবীর সকল মানুষকে গুমরাহ করার তৎপরতা চালাতে পারে, তবে রাসূলুল্লাহ (সা) কেন গোটা উম্মতের কার্যক্রম দেখতে সক্ষম হবেন না? কেন তাঁকে হাযির নাযির মনে করাটা ভুল হবে? তাঁর সম্পর্কে এমনটি ধারণা করাটা কি করে শিরক হতে পারে?

জবাবঃ যারা বলেন, পৃথিবীতে একই সময় যতো মানুষ মারা যায়, আযরাঈল একাই তাদের সকলের জান কবজ করেন,–তারা সাংঘাতিক রকমের ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত। কুরআন মজীদে জান কবজকারী ফেরেশতাদের কথা উল্লেখ রয়েছে, একজন ফেরেশতার কথা নয়। 'মালাকুল মউত' হচ্ছেন সেই ফেরেশতা যাকে জান কাবজকারী ফেরেশতাদের কর্তা নিযুক্ত করা হয়েছে। কুরআনের কয়েক স্থানেই জানকবজকারী ফেরেশতাদের কথা উল্লেখ রয়েছে। একথা কোথাও বলা হয়নি যে, পৃথিবীর যেখানেই মানুষের মৃত্যু আসবে একজন মাত্র ফেরেশতাই গিয়ে তাদের সকলের জান কবজ করে।

একইভাবে কোনো ব্যক্তি যদি সত্যিই মনোযোগের সাথে কুরআন পড়ে থাকেন, তবে তিনি একথা বলতে পারেন না যে, দুনিয়ার সকল মানুষকে ইবলিস একাই গিয়ে গিয়ে গুমরাহ করে। কুরআন মজীদে যুররিয়াতা ইবলিস–ইবলিস সন্তানদের কথা পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে। একথারও উল্লেখ রয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির পিছে রয়েছে পৃথক পৃথক শয়তান। ইবলিস হচ্ছে তাদের সকলের লীডার বা কর্তা। তার নির্দেশনা অনুযায়ী তারা কাজ করে। বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ হয়েছে, ইবলিস সমুদ্রে তার তখ্‌ত পেতে বসেছে। সেখান থেকে সে শয়তানদের পাঠায় মানুষকে ধোকা দেবার জন্যে। এককেজন শয়তান ফিরে এসে তার নিকট রির্পোট পেশ করে–আমি এই এই কাজ করে এসেছি। সে প্রত্যেককে বলে, তুমি কিচ্ছু করোনি। তুমি কিছুই করতে পারোনি। একজন শয়তান এসে রিপোর্ট দেয়–আমি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে এসেছি। ইবলিস তাকে টেনে গলায় জড়িয়ে ধরে বলে, হ্যাঁ, তুমিই কাজের কাজ করে এসেছো।

এখন বলুন, কুরআন হাদীসে এসব স্পষ্ট কথা বর্তমান থাকার পরও যারা বলে, একই সময় ইবলিস একা দুনিয়ার সকল মানুষকে গুমরাহ করার তৎপরতা চালাচ্ছে, তাদের কথা গ্রহণযোগ্য হতে পারে কি? লোকেরা যদি মনোযোগের সাথে কুরআন হাদীস পড়তো, তাহলে এসব ভিত্তিহীন কথাবার্তা কখনো বলে বেড়াত না।

একইভাবে কোনো মানুষ সম্পর্কে এরূপ ধারণা করা ইসলামী আকীদার সম্পূর্ণ খেলাফ যে, তিনি সর্বত্র বর্তমান এবং সবকিছু শুনেন এবং জানেন। এসব সিফাত এবং কুদরত তো কেবল আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট। কুরআন মজীদে এই সিফাত ও ক্ষমতা কেবল আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো মানুষ এরূপ ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বলে কি করে স্বীকার করা যেতে পারে? কেউ যদি কোনো মানুষ সম্পর্কে এরূপ ধারণা করেন যে, তিনি সর্বত্র বর্তমান, সবকিছু শুনেন এবং জানেন, তবে স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মধ্যে আর কি পার্থক্য অবশিষ্ট থাকলো? কেউ যদি বলেন, রাসূলের (সাঃ) এই বৈশিষ্ট্য এবং ক্ষমতা আল্লাহ প্রদত্ত। তবে তার এই কথার অর্থ দাঁড়ায়, আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টিকে খোদায়ীত্বও প্রদান করেন (নাউযুবিল্লাহ)। এখন প্রশ্ন হলো, এটাকেও যদি শিরক বলা না হয়, তবে আর কোন্ জিনিসটার নাম শিরক?

১২৭. আল্লাহর রিযিকদাতা হবার বিশ্বাস

প্রশ্নঃ আল্লাহ তাআলা এবং কেবল আল্লাহ তাআলাই একমাত্র রিযিকদাতা,একথার বিশ্বাস কিভাবে মনের মধ্যে বসিয়ে দেয়া যেতে পারে? সম্ভবত, আমার মতো অনেকেই নিজ অফিসে হিংসা এবং গ্রুপিং এর শিকার হয়। নিজের পক্ষ থেকে পূর্ণ ঈমানদারীর সাথে কাজ করলেও চাকুরী চলে যাবার ভয় হয়?

জবাবঃ বুঝে বুঝে মনোযোগের সাথে বার বার কুরআন অধ্যয়ন করা ছাড়া আল্লাহ রিযিকদাতা হবার অটল বিশ্বাস অন্য কোনোভাবে পয়দা হতে পারে না। অবশ্য অভিজ্ঞতা দ্বারাও এবিশ্বাস জন্ম লাভ করতে পারে। কেউ যদি গভীর মনোযোগের সাথে কুরআন অধ্যয়ন করেন, তবে তিনি এমনভাবে আল্লাহ তাআলার রিযিকদাতা হবার ইয়াকীন লাভ করবেন, যেন তিনি স্বচক্ষে আল্লাহ তাআলাকে রিযিকদান করতে দেখছেন। অবশ্য শর্ত হচ্ছে, তাকে কুরআন বুঝে

পড়তে হবে এবং বার বার পড়তে হবে। তখন বুঝতে পারবেন আল্লাহতাআলা কতইনা মহান রিযিকদাতা রাজ্জাক। বহু ব্যক্তির ব্যাপারে এমন দেখা গেছে, তিনি উঁচু দরের চাকুরী করতেন। অন্যায়ভাবে তার চাকুরী হরণ করা হয়। তার সামনে আয়ের অন্য কোনো উৎসের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। আগামীকাল তার চুলায় আগুন জ্বলবে কি জ্বলবে না তাও তিনি জানেন না। কিন্তু এমতাবস্থায়ও আল্লাহতাআলা তাকে অনাহারে মারেননি। বরঞ্চ আগের তুলনায় রোজগারের ভাল মাধ্যম তাকে দান করেছেন।

কিন্তু সকলের ব্যাপারে এ একই কথা প্রযোজ্য নাও হতে পারে। কোনো ব্যক্তির উপর যখন কঠিন পরীক্ষা চলতে থাকে, তখনো তাকে ধৈর্য ও কতৃজ্ঞতার উপর অটল থাকা উচিত। অমুক হারামখুরীর কাজটি করলে আমাকে আজ আর এই বিপদের ঝুঁকি নিতে হতো না। এমন ধরনের কোনো কুচিন্তা যেনো তার মনে উদ্রেক না হয়। কিংবা এরূপ কোনো বাজে চিন্তাও যেনো তার মনে না আসে যে, হালালখুরীর ফলতো দেখলাম এবার হারামখুরী শুরু করবো। এ ধরনের চিন্তা থেকে মুক্ত থেকে কেউ যদি ধৈর্য এবং সহনশীলতার সাথে পরিস্থিতির মোকাবিলা করেন, তবে তিনি দেখতে পাবেন, আল্লাহ তাআলা কতো মহান রিযিকদাতা। পক্ষান্তরে কেউ যদি আল্লাহ তাআলার দেয়া পরীক্ষা ধৈর্যের সাথে মোকাবিলা করতে রাজী না হয়, তবে আল্লাহ তাআলা দারিদ্রের মাধ্যমে তার অহংকার ধূলিস্যাত করে দিতে পারেন। কখনো একথা ভুলে যাবেন না যে, আল্লাহ তাআলার দেয়া পরীক্ষার মোকাবলা করার জন্যেই আমাদের সৃষ্টি, আমাদের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া আল্লাহ তাআলার দায়িত্ব নয়।

১২৮. সূরা ফাতিহা এবং কুরআন

প্রশ্নঃ সূরা ফাতিহাকে কুরআনের সমতূল্য বলার কারণে কেউ কেউ শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করাকেই যথেষ্ট মনেকরে। এব্যপারে আপনার বক্তব্য কি?

জবাবঃ পার্থিব ব্যাপারে দেখা যায় কারো যদি একশ' টাকা থাকে তবে তিনি দু'শ টাকার আকাংখা করেন। কারো হাতে যদি এক হাজার টাকা আসে তবে তিনি দশ হাজার টাকার মালিক হতে চান। কিন্তু কুরআনের ব্যাপারে তাদের কাছে মর্যাদার মাপকাঠি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাদের যখন বলা হলো সূরা ফাতিহা গোটা কুরআনের সমতূল্য, অমনি তারা ভাবলো, গোটা কুরআন পড়ার

আর দরকার কি? একবার সূরা ফাতিহা পড়ে নিলেই হলো। চিন্তার এপদ্ধতি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। দুনিয়াদারীর ব্যাপার হলে যতো পাই ততো চাই। কিন্তু দীনের ব্যাপার হলে যতোই কম হোক তাতেই পরিতুষ্ট! এ এক বিস্ময়কর ব্যাপার! এধরনের চিন্তা সংশোধন করা উচিত।

সূরা ফাতিহার মর্যাদা গোটা কুরআনের সমতুল্য হওয়াটা তো আপনার জন্যে সৌভাগ্যের ব্যাপার। এতে আপনি দ্বিগুণ সওয়াবের মালিক হতে পারছেন। একদিকে গোটা কুরআন পড়ার সওয়াব। অপর দিকে সূরা ফাতিহা পড়ায়, তদ সমতুল্য সওয়াব। এতে আপনি অধিক ফায়দা এবং বরকত লাভ করছেন। কিন্তু এখানে যদি আপনি কেবল সূরা ফাতিহার উপর পরিতুষ্ট হয়ে যান, তবে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আপনার অন্তরে যতো কার্পণ্য আছে তা কেবল কুরআনের জন্যে। অথচ, পার্থিব ব্যাপারে আপনার লোভ সীমাহীন। বাড়ী একটা হলে আরেকটা করতে চান। গাড়ী একটার মালিক হলে আরেকটা সংগ্রহের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেন। এক হাজার টাকা হাতে এলে দশ হাজার টাকা পেতে চান। অথচ কুরআনের ব্যাপারে আপনি এতোটা অল্পে পরিতুষ্ট যে, কেবল সূরা ফাতিহা পড়াকেই যথেস্ট মনে করেন আর গোটা কুরআন পড়ার জরুরত অনুভব করেন না। প্রকৃতপক্ষে এ চিন্তা পদ্ধতি পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

১২৯. আল্লাহ তাআলা কি সুদ প্রদান করেন?

প্রশ্নঃ কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা বান্দাদের কাছে করজ চেয়েছেন এবং ফেরতের পরিমাণ নির্ধারণ করেননি। অবশ্য করজ যা দেয়া হবে তার চাইতে অধিক ফেরত দানের ওয়াদা করেছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে করজ যে পরিমাণ দেয়া হয়, ফেরত প্রদানের সময় তার চাইতে অধিক দেয়াটা কি সুদ নয়? অথচ সুদ দেয়া নেয়া সম্পূর্ণ হারাম?

জবাবঃ 'সূদ'তো মামুলী ব্যাপার! আল্লাহ তাআলা এর চাইতে সাংঘাতিক কাজ করেন! যেমন, তিনি নিষ্পাপ শিশুদের মেরে ফেলেন! এমন লোকদের তিনি মেরে ফেলেন যাদের ছোট ছোট সন্তানরা ইয়াতীম হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা এই কাজগুলো করেন বলে আপনার জন্যেও কি সেগুলো বৈধ হয়ে যাবে? আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের কাজ থেকে কিছু নিয়ে তার পরিবর্তে তাকে যদি আরো অধিক দান করেন, তবে এ অধিকার তো তাঁরই রয়েছে। এটা যদি 'সুদ' হয়, তবে এর অধিকার আল্লাহ তাআলার রয়েছে। আল্লাহ তাআলা

করজ নিয়ে অধিক ফেরত দানের ওয়াদা করেছেন বলেই বান্দার জন্যে সুদ বৈধ হয়ে যেতে হবে, এমনটির কোনো অবকাশ নেই। কারণ এটাকে যদি দলিল মনে করা হয় তবে এর পরিণাম কি হবে চিন্তা করে দেখুন। আল্লাহ তাআলা মানুষকে মারেন, সে কারণে আপনি কাউকে হত্যা করে একথা বলতে পারেন কি যে, আমি ভুল করিনি? একথাতো আপনি কিছুতেই বলতে পারেন না। সুতরাং বুঝা গেল, যুক্তি গ্রহণের এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আল্লাহ তাআলা জনপদের পর জনপদ বিরান করে দেন। সামুদ্রিক জাহাজ ডুবিয়ে দেন। উড়োজাহাজ ধ্বংস করে দেন। এসব কাজকি আপনার জন্যে বৈধ হবে? আপনি কি আল্লাহর মতোই এসব কাজের পরিণাম ফল সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন?

১৩০. আলে রাসূল কারা?

প্রশ্নঃ একটি হাদীসে এসেছে, 'আলে রাসূলের' জন্যে যাকাত গ্রহণ করা হারাম। প্রশ্ন হচ্ছে, 'আহল' এবং 'আলের' মধ্যে পার্থক্য কি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনয়নকারী সকলেই কি 'আলে রাসূল নন?

জবাবঃ হাদীসের যে স্থানে এশব্দটির প্রয়োগ হয়েছে, সেখানে এর অর্থ নবী করীমের (সা) বংশের সেই সব লোক যারা তার অনুসারী। 'আল' এবং 'আহল' শব্দ দুটি আরবী ভাষায় দুটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোনো ব্যক্তির বংশধরকে 'আহল' বলা হয়, তারা তার অনুসারী হোক বা না হোক তাতে কিছু আসে যায় না। আর খান্দানের যেসব লোক তাদের পূর্ব পুরুষের অনুসারী, তারা তার সর্বোত্তম 'আল'। অর্থাৎ তারা যেমনি তার বংশধর, তেমনি তার অনুসারী। তাই, অনেক স্থানেই 'আলে রাসূল' মানে রাসূলুল্লাহর (সা) সেইসব বংশধর যারা তাঁর পথে চলে, তাঁর অনুসারী।

এথেকে এশিক্ষাই পাওয়া গেল যে, কোনো ব্যক্তি সাইয়েদ হয়েও যদি কাফির হয়ে যায়, তবে সে আলে রাসূল থেকে খারিজ হয়ে যায়। 'আলে রাসূল' সে আর থাকে না।

১৩১. যাকাতের নৈতিক গুরুত্ব

প্রশ্নঃ একটি হাদীসে যাকাতের মাল বা সদাকাকে ময়লা বলা হয়েছে। কথাটা বুঝতে পারলাম না। যে জিনিস মালকে পবিত্র করে স্বয়ং সে জিনিস

কেমন করে ময়লা হয়? সাত্যিই যদি এটা ময়লা হবে, তবে যারা তা গ্রহণ করে, তারা কি ময়লা ভক্ষণ করে? মেহেরবাণী করে বিষয়টি ব্যাখ্যা করুন।

জবাবঃ যে জিনিস কোনো পাত্রকে পরিষ্কার করে, সে জিনিস নিজের সাথে পাত্রের ময়লাও বের করে নিয়ে যায়। সে জিনিস যদি নিজের ময়লা বের করে না নেয় তবে কেমন করে পাত্র পরিষ্কার হবে? এ উপমার ভিত্তিতে অনুমান করে দেখুন, কোনো ব্যক্তি যে সম্পদ সঞ্চয় করে রাখেন আর তা যখন বছর অতিক্রম করে, তখন তার মধ্যে অপবিত্রতা পয়দা হবার আশংকা থাকে। এখন সে যদি তা থেকে যাকাত বের করে দেয়, তবে সে আশংকা দূরীভূত হয়ে যায়। পবিত্র হয়ে যায় তার সম্পদ। অন্য কথায়, তার সম্পদে যে মালিন্য পয়দা হবার আশংকা ছিলো, যাকাত নিজের সংগে তা বের করে নিয়ে গেলো। যাকাতকে যে ময়লা বলা হয়েছে তার মানে এই নয় যে, সম্পদ থেকে যাকাতের যে অর্থ বা টাকা পয়সা বের করা হয়েছে স্বয়ং সেটাই ময়লা বা অপবিত্র। বরঞ্চ তার অর্থ তাই যা আমি এখানে বলেছি। কোনো ব্যক্তি যখন দান খয়রাত বা ভিক্ষা গ্রহণ করে তখন তার মর্যাদার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে একটা পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে যায়। একারণে নবী করীম (সা) যাকাত বা খয়রাত গ্রহণ করা পসন্দ করেননি। কেননা এতে তাঁর নবী হিসেবে যে মর্যাদা, তা ক্ষুণ্ন হয়। শুধু তাই নয়, বরঞ্চ তিনি তাঁর বংশধরদের জন্যেও যাকাত এবং দানসদাকা প্রভৃতি নিষিদ্ধ করে দেন। কেননা তাঁর মৃত্যুর পর, তাঁর বংশধররা যদি তাঁর নামে মানুষের কাছে হাত পাতে তাতেও তাঁর মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, মানুষ যাকাত বা সদাকা হিসেবে যে অর্থ দান করে স্বয়ং সেটাই অপবিত্র এবং কোনো মুসলমানই তা গ্রহণ করতে পারবে না।

১৩২. আলে হাশিম এবং যাকাত

প্রশ্নঃ উলুভী খান্দানকে হযরত আলীর (রাঃ) সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়। কিন্তু সে খান্দানের সূত্রপাত হযরত ফাতিমা (রাঃ) থেকে হয়নি, হয়েছে হযরত আলীর (রা) দাসী হানফিয়া থেকে। এই খান্দানের লোকদের জন্যেও কি যাকাত হারাম?

জবাবঃ বনি হাশিম এবং বনি মুত্তালিবের জন্যে যাকাত হারাম। আর আলী (রাঃ) যেহেতু বনি হাশিম খান্দানের লোক, সুতরাং তাঁর সন্তানরাও বনি হাশিম। তারা তাঁর যে স্ত্রীর গর্ভজাতই হোকনা কেন তাতে কিছু যায় আসে না।

একইভাবে আব্বাসীয়দের জন্যেও যাকাত হারাম। কেননা তারাও বণি হাশিমেরই লোক।

১৩৩. যাকাত কি জরিমানা?

প্রশ্নঃ সাহাবী ও ইমামগণের একটি দল যাকাতকে জরিমানা বা টেক্স বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁদের এ বক্তব্য কি যথার্থ? ইমাম শাফেয়ী এবং তাঁর স্বমতের লোকেরা নাবালেগ শিশুদের থেকেও যাকাত (মাসিক 'ফিকর ও নযর' পত্রিকার ভাষায় টেক্স) আদায় করা জরুরী মনে করেন। অপরপক্ষে কিছু লোক যাকাতকে ইবাদত বলে উল্লেখ করেছেন। যেসব সাহাবী বা ইমাম এটাকে ইবাদত মনে করেছেন, তাঁরা কোন্ অর্থে এটাকে ইবাদত মনে করেছেন? যাকাত কি ইসলামের একটি মৌলিক স্তম্ভ এবং এতে কোনো মতবিরোধ নেইতো?

জবাবঃ আপনি বেশ দীর্ঘ প্রশ্ন করেছেন। আমি হ্রস্বাকারে এর জবাব দিচ্ছি। কোনো কোনো ইমাম বলেছেন, নাবালেগ শিশুর সম্পদ যদি তার ওলীর ব্যবস্থাধীন থাকে, তবে শিশু যতোদিন নাবালেগ থাঁকে ততোদিন ওলীকে শিশুর সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করে দিতে হবে। আবার কোনো কোনো ইমাম বলেছেন, যতোদিন নাবালেগ শিশুর সম্পদ তার ওলীর তত্ত্বাবধানে থাকবে, ততোদিন সে সম্পদের যাকাত দেয়া ঠিক হবে না, বরঞ্চ শিশু বালেগ হবার পর তাকে বলে দিতে হবে, তোমার এতো পরিমাণ সম্পদ এতো এতো বছর আমার তত্ত্বাবধানে ছিলো এবং এতো বছরে সেগুলোর যাকাতের পরিমাণ এই হয়েছে। এভাবে যাকাত দেয়ার ক্ষমতা শিশুর হাতে ছেড়ে দিতে হবে। তৃতীয় একদল লোক বলেছেন, নাবালেগের উপর যাকাত ফরযই হয় না। সে বালেগ হবার পরই কেবল তার উপর যাকাত ফরয হয়।

এ হচ্ছে বিভিন্ন ফকীহ্‌র বিভিন্ন মত। এসব মতামত প্রদানকালে তাঁদের কারোই যাকাত যেহেতু একটি জরিমানা বা ট্যাক্স তাই তা সর্বাবস্থায়ই আদায় করতে হবে, এমন কোনো মনোভাব ছিলোনা। তিনটি মতের পিছেই রয়েছে বলিষ্ঠ যুক্তি প্রমাণ। তাঁদের এক দল মনে করেছেন, না বালেগ যেহেতু মুসলমান, তাই তার সম্পদ থেকে তার ওলীর যাকাত আদায় করে দেয়া উচিত। আরেক দলের মতে বালেগ হবার পূর্বে যেহেতু তার উপর যাকাত ফরযই হয়না, তাই তার যাকাত আদায় করা জরুরী নয়। তৃতীয় দলের বিবেচনা এই ছিলো যে,

নাবালেগ বালেগ হবার পর তার সম্পদে কতো পরিমাণ যাকাত আসে তা তাকে বলে দিতে হবে এবং যাকাত দেয়া না দেয়ার ব্যাপারটা তার দায়িত্বে ছেড়ে দিতে হবে। ওলী যেমন তার নামায আদায় করে দেয় না, তেমনি যাকাতও আদায় করবেনা।

এখন চিন্তা করে দেখুন, এ ধরনের বিষয়কে যদি লোকেরা না বুঝে শুনে উল্টা সিধা মনে করে আর যাকাতের অর্থ টেক্স মনে করে, তবে এটাক অজ্ঞতা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? মুশকিল হলো, এসব লোকেরা বিদেশের কুফরী শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ডক্টরেট নেয় আর দেশে এসে মুজতাহিদ সেজে বসে।

আপনার প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশটি যাকাত ইবাদত হওয়া সম্পর্কিত। যাকাত ইবাদত হবার ব্যাপারে কোনো মতভেদ সৃষ্টি হবারতো প্রশ্নই উঠে না। কারণ কুরআনের অসংখ্য স্থানে নামায এবং যাকাতের নির্দেশ একত্রে দেয়া হয়েছে। সুতরাং নামায যদি ইবাদত হয়ে থাকে, তবে যাকাতও অবশ্যি ইবাদত। যাকাতের তুলনায় অন্যান্য ইবাদতের কথা কুরআনে কমই আলোচিত হয়েছে, যেমন রোযা। কুরআনের এক স্থানেই মাত্র রোযার কথা আলোচিত হয়েছে, যেখানে রোযা ফরয হবার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এমনি করে হজ্ব সম্পর্কেও যাকাতের তুলনায় কম আলোচনা হয়েছে। কিন্তু নামায আর যাকাতের কথা বলা হয়েছে বার বার। তাই সাহাবী এবং ইমামগণের মধ্যে কারোই যাকাত ইসলামের স্তম্ভ এবং ইবাদত হবার ব্যাপারে কোনো মতবিরোধ নেই। মুজতাহিদ ইমামগণের কেউ যাকাতকে টেক্স বলেছেন এমন কথাও আমার জানা নেই।

১৩৪. ঋণ করে মেহেমানদারী করা

প্রশ্নঃ কেউ যদি দীনি ভাই হিসেবে দাওয়াত করে আর মেহমানদারীর জন্যে ঋণ গ্রহণ করে কিংবা সামর্থ না থাকা সত্ত্বেও দাওয়াত করে, তবে দাওয়াত গ্রহণ করা কি উচিত হবে?

জবাবঃ আপনি যদি আগেই জানতে পারেন যে তিনি এমনটি করছেন, তবে এমনটি না করার জন্যে তাকে বুঝাবেন। বুঝ না মানলে বাধ্য হয়ে দাওয়াত গ্রহণ করতে অস্বীকার করবেন। আর যদি পূর্বে জানতে না পারেন এবং পরবর্তীতে জানতে পারেন, তবে তাকে নসীহত করবেন যে, এধরনের কাজ ঠিক নয়।

১৩৫. অহী অবতীর্নের কষ্ট

প্রশ্নঃ অহী অবতীর্ণের সময় নবী করীম (সা) এর উপর যে কঠিন ও কষ্টকর অবস্থা অতিবাহিত হতো তার কি কারণ ছিলো? অথচ আল্লাহর কালামতো আল্লাহর একটি বিরাট রহমত? মেহেরবানী করে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলুন।

জবাবঃ আল্লাহর কালাম নিঃসন্দেহে আল্লাহর বিরাট অনুগ্রহ। কিন্তু আল্লাহ নিজেই বলেছেন এ এক ভারী কালাম (اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً) এর ওজন এতে বেশী যে স্বয়ং কুরআন এ সম্পর্কে বলেছেঃ

لَو اَنزَلنَا هٰذَا القُراٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّن خَشيَةِ اللّٰهِ

অর্থাৎ পাহাড় পর্যন্ত কুরআনের ওজন সইতে সক্ষম নয়। আসল কথা হলো কুরআন মানুষের উপর যে বিরাট দায়িত্ব ন্যস্ত করছে, মানুষ যদি তা সত্যিই অনুভব করে, তবে নিঃসন্দেহে একালাম তার জন্যে এক বিরাট ভারী কালাম। একই কুরআন আবার হিদায়াতের আলো প্রদান করে। যদি মানুষ সত্যিই কুরআন প্রদর্শিত হিদায়াতের মর্যাদা উপলব্ধি করে, তবে নিঃসন্দেহে সে এটাকে এক বিরাট রহমত বলেই অনুভব করবে। সুতরাং একটা জিনিসেরই দুইটা দিক। একদিকে কুরআন আল্লাহর অসীম রহমত অপর দিকে বিরাট গুরুদায়িত্বের বোঝা।

১৩৬. যিকরুল্লাহ

প্রশ্নঃ মন বার বার আল্লাহর স্মরণ (যিকর) থেকে দূরে সরে যায়। গাফ্‌লতি আমার উপর প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। ইবাদতে এবং নামাযে মন আল্লাহর প্রতি বিনষ্ট হয় না। আমার জন্যে দোয়া করবেন আর এরোগের নিরাময় কিসে হবে তা আমাকে বলে দেবেন?

জবাবঃ অন্তরে আল্লাহ তাআলার স্মরণকে তাজা করবার কোশেশ করার মাধ্যমেই এরোগের নিরাময় হতে পারে। আল্লাহর স্মরণই মানুষকে নেকী ও কল্যাণের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং রক্ষা করে মন্দ ও অকল্যাণ থেকে। কারো মন যদি আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরে যেতে চায়, তবে তার মনকে আল্লাহর স্মরণে বাধ্য করা উচিত। আসলে মানুষের অন্তরে যখন ইচ্ছাশক্তি দুর্বল হয়ে যায়, তখনই শয়তান তার মনকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল করার সুযোগ পেয়ে

যায়। এসুযোগে সফলতা অর্জন করার পর সে মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় অন্যায় ও মন্দের প্রতি। মানুষের ইচ্ছাশক্তিই শয়তানকে প্রতিহত করে। এটাই তার আসল শক্তি। কিন্তু কেউ যখন এ শক্তি হারিয়ে ফেলে, তখন শয়তানকে প্রতিহত করার মতো আর কোনা জিনিস তার কাছে থাকে না। তাই নিজের পুরো ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহর স্মরণে হৃদয়মনকে সিক্ত রাখতে এবং ইবাদত ও অন্যান্য নেক কাজে নিবিষ্টচিত্ত হতে নিজেকে নিজে বাধ্য করা প্রত্যেকেরই উচিত। এভাবে কিছুদিন যখন কেউ নিজেকে নিজে বাধ্যকরে, নিজের মনের সাথে নিজে যুদ্ধ করে স্বীয় মনকে আল্লাহর স্মরণের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, তখন ধীরে ধীরে তার মধ্যে প্রতিরোধ শক্তি বাড়তে থাকবে এবং অবশেষে শয়তানকে পরাজিত করার পুরো শক্তি তিনি অর্জন করবেন।

১৩৭. খাশিয়াতুল্লাহ

প্রশ্নঃ নিয়্যতের নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও কোনো কোনো সময় আমার দ্বারা মন্দ কাজ সংঘটিত হয়ে যায়। এতে অন্তরে অনুশোচনার উদ্রেক হয় এবং লজ্জিতও হই। কিন্তু মনে আল্লাহর ভয় জাগেনা। দীর্ঘদিন থেকে আমি এ গুণাহগুলো থেকে বাঁচতে চাই এবং আমার বড় খাহেশ, আল্লাহ এবং বিচার দিনের কথা স্মরণ হতেই আমি কান্নায় ভেংগে পড়ি। কিন্তু আজো আমার মধ্যে সে অবস্থা সৃষ্টি হয়নি।

জবাবঃ কান্না সম্পর্কে একটি কথা মনে রাখবেন। তা হলো এই যে, কেবল চোখ ভরে অশ্রু ঝরানোটাই কান্না নয়। অন্তরের কান্নাই হচ্ছে আসল ও প্রকৃত কান্না। কারো কারো অবস্থা এমন হয়ে থাকে যে গুনাহের অনুশোচনার কারণে অশ্রুপাত করাতো দূরের কথা, এমনকি তার একান্ত আপনজন মরে গেলেও তার চোখে পানি আসেনা। অথচ তার মন ব্যথায় এবং আঘাতে ছটফট করতে থাকে। মূলত এটি হচ্ছে প্রকৃতিগত (PHYSICAL) ব্যাপার। অশ্রু কারো ঝরে আবার কারো ঝরে না। বিভিন্ন লোকের অবস্থা ও প্রকৃতি বিভিন্ন হয়ে থাকে। দেখার বিষয় হচ্ছে, গুনাহ হয়েছে অনুভব করার পর ব্যক্তির মন আল্লাহর ভয়ে কেঁপে উঠেছে কি না? এতে সে অনুতপ্ত কি না? সত্যিই যদি তার মধ্যে অনুতাপ অনুশোচনা এবং আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হয়, সংঘটিত গুনাহটির জন্যে মনে কোনো প্রকার আনন্দ সৃষ্টি না হয় এবং সেই অপরাধে পুনরায় লিপ্ত না হয়, তবে এটাই

খাশিয়াতুল্লাহর (আল্লাহর ভয়ের) দাবী পূর্ণ করে। তওবার জন্যে এটাই যথেষ্ট, চোখের পানি ঝরা জরুরী নয়।[১]

১৩৮. তারতীলে কুরআন

প্রশ্নঃ আপনি 'তারতীলে কুরআন' কথাটির তাৎপর্য বলতে গিয়ে বলেছেন, এ হচ্ছে, ধীরে ধীরে থেমে থেমে বুঝে বুঝে এবং চিন্তা করে করে পড়া। ব্যাপার যদি তাই হয় তবে আমাদের অবস্থা কি হবে? আমরাতো তারতীলের খিলাফ পড়ে পড়ে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এতে আমাদের কোনো গুনাহ হবেনাতো?

জবাবঃ আমি মনেকরি তারতীলের খিলাফ পড়া হলে কুরআন না বুঝে পড়া হলে। কেউ যদি বুঝে শুনে কুরআন পড়েন, তবে তিনি এ কালামকে ঝটপট হটাহট পড়ে যেতে পারেননা। কেবল না বুঝে পড়লেই এভাবে পড়া যেতে পারে। আর এভাবে পড়লে তিলাওয়াতকারীর খেয়ালই থাকেনা যে, তিনি কি তিলওয়াত করছেন? মর্মার্থের প্রতি তার দৃষ্টিই নিবদ্ধ হয়না। এরূপ তিলাওয়াতকারীর অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, তিনি কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করতে করতে যখন কোনো প্রশ্নবোধক আয়াত এসে পড়ে, তখন তিনি তা এমনভাবে তিলাওয়াত করেন যেনো এখানে কোনো প্রশ্নই করা হয়নি। এতে বুঝা যায়, তিনি কি জিনিস পড়লেন তা তার মনমগজেই ঢুকেনি। অথচ তিনি যদি বুঝে বুঝে আয়াত উচ্চারণ করতেন, তবে প্রশ্নবোধক বাক্য প্রশ্নবোধক ভংগিতেই উচ্চারণ করতেন। এমনি করে এধরনের পাঠকদের আপনি দেখবেন, ভয়ানক আযাবের দুঃসংবাদবহ আয়াতকে তিনি এমনভাবে তিলাওয়াত করছেন, যেনো তাতে সুসংবাদ রয়েছে। তার দেহমনে কোনো প্রকার ভয়ভীতির অবস্থাই সৃষ্টি হয়না। প্রকৃত পক্ষে না বুঝে পড়ার কারণেই এ অবস্থা হয়ে থাকে। কিন্তু কেউ যদি এ কুরআন বুঝে শুনে তিলাওয়াত করেন, তবে কিছুতেই তিনি তা ঝটপট পড়ে যেতে পারেন না, কিংবা এমনভাবে তিনি একিতাব তিলাওয়াত করতে পারেন না যেনো একালামের কোনো প্রভাবই তার উপর পড়ছেনা।

কেউ কেউ কৃত্রিম তারতীলও করে থাকে। না বুঝে টেনে হিঁচড়ে উচ্চস্বরে গেয়ে গেয়ে অসংগতিমূলক ভাব ভংগিমায় তারা কুরআন তিলাওয়াত করে। একটি আয়াতাংশ তিলওয়াত করে মিনিটখানেক চুপ করে থাকে। এধরনের

---

[১] আইন ১৬ নভেম্বর ১৯৬৮ইং।

তিলাওয়াতও তারতীলে কুরআন নয়। প্রতিটি শব্দকে তার যথার্থ হক আদায় করে এবং সব ধরনের যতি চিহ্নকে তার যথার্থ ভংগিতে উচ্চারণ করে লাগাতার তিলাওয়াত করে যাওয়াটাই হচ্ছে তারতীলে কুরআন। একটি বাক্য উচ্চারণ করে কয়েক মিনিট থেমে থাকাটা তারতীল নয়। এতে করে গানের শোভা অক্ষুণ্ন থাকে বটে, কিন্তু ভাবের প্রভাব খতম হয়ে যায়। যেমন ধরুন, কোনো একটি বাক্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বিবরণ রয়েছে। এখন তিলাওয়াতকারী যদি মাঝখানে এতোটা থেমে থাকলেন যে পূর্ববর্তী বিষয় সম্মুখেই এলোনা, তখন এতে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়। বক্তব্যের পরবর্তী অংশ পরতবী অংশের সাথে সম্পর্কিত না হওয়া পর্যন্ত তো আসলে মূল বক্তব্যই স্পষ্ট হয়না। এটাও তারতীলে কুরআনের নিয়ম নয়।

১৩৯. যাকাত বনাম করয

প্রশ্নঃ কোনো ব্যক্তি যদি কাউকেও যাকাতের অর্থ যাকাতের নিয়্যতেই দেয়, কিন্তু দেবার সময় করয বলে দেয় যাতে করে প্রাপক তা চিন্তাভাবনা করে খরচ করে, অপব্যয় না করে কাজে লাগায়, তবে তার যাকাত আদায় হবে কি?

জবাবঃ আপনি একটি লোককে যাকাত দিচ্ছেন, অথচ অনর্থক তাকে ধারণা দিচ্ছেন ভ্রান্ত। বলছেন, আমি তোমাকে করয দিচ্ছি। অর্থাৎ একটা নেকীর সাথে একটি বদী শামিল করে দিচ্ছেন। আপনার ধারণা, এর দ্বারা লোকটির কল্যাণ হবে। কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখুন, যাকে আপনি যাকাতটা দিচ্ছেন, সে এটাকে করয চিন্তা করে প্রশান্তির সাথে তা খরচও করতে পারবে না। লোকটি হলো দরিদ্র। আপনি তাকে দিলেন যাকাত। বললেন, করয। এতে করে তার মগজে করয আদায়ের ধান্দা চেপে বসবে এবং দুশ্চিন্তায় নিমজ্জিত হবে। মানে যাকাত দিয়ে আপনি তার অশান্তি বাড়িয়ে দিলেন। এখন এতে যদি সত্যিই কোনো কল্যাণ থেকে থাকে, তবে সেটা আপনি ভাল বুঝতে পারেন।

১৪০. ওয়াজিব সদাকা ও নফল সদাকা

প্রশ্নঃ একটি হাদীসে বলা হয়েছে, সদাকা অর্থাৎ যাকাত কোনো ধনী ব্যক্তির জন্যে হালাল নয়। 'সদাকা' মানে কি শুধু যাকাত? আমাদের এই অঞ্চলে এই প্রথা চালু আছে যে, লোকেরা আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু বিলায় এবং ধনী আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু বান্ধবের বাড়ীতেও তা পাঠায়। একাজ কি বৈধ?

জবাবঃ 'সদাকা' শব্দটি দুটি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ 'ওয়াজিব সদাকা' ও 'নফল সদাকা' দু ধরনের সদাকার ক্ষেত্রেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ওয়াজিব এবং নফল সদাকার কোনোটাই ধনীর পক্ষে গ্রহণ করা ঠিক নয় এবং তাকে দেয়াও ঠিক নয়। সদাকা ছাড়া অন্য কোনো নিয়্যতে যদি কেউ কিছু দান করে, যেমন শোকর আদায়ের জন্যে কেউ খাবার পাক করে বিলিয়ে দিলো, তবে তা থেকে সে নিজেও খেতে পারে এবং অন্যদেরকেও দান করতে পারে। কিন্তু যদি সদাকার নিয়্যত করে, তবে তা কেবল গরীবদেরকেই দিতে হবে।

১৪১. অনুপযুক্ত প্রার্থীকে দান করা

প্রশ্নঃ দামী বেশভূষাধারী ও সবল সুস্থ দেহের অধিকারী লোকদের সদাকা দেয়া কি বৈধ?

জবাবঃ বেশভূষা এবং সুস্থসবল দেহ ধনী গরীব হবার মানদন্ড নয়। এধরনের যেসব লোক মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে ভিক্ষা প্রার্থনা করে তাদের মধ্যে যাদের ব্যাপারে আপনি বুঝতে পারেন, সত্যিই এরা গরীব, ভাল বেশভূষা এবং সুস্থ সবল দেহ হওয়া সত্ত্বেও তারা সদাকা পাবার উপযুক্ত, তবে তাদেরকেও সদাকা প্রদান করবেন। কিন্তু এ ধরনের কোনো ভিক্ষুক যদি দরিদ্র না হয়ে থাকে, অথচ মাথা কুটে কুটে আপনার কাছে বারবার চাচ্ছে, ফলে বাধ্য হয়ে তাকে কিছু দিতে হয়, এমন ব্যক্তিকে অন্য ধরনের দান খয়রাতও করতে পারেন। যাকাতের অর্থ তাকে দেয়া ঠিক হবেনা। বিষয়টি আপনার বিচার বিবেচনা (JUDGMENT) ও যাচাই বাছাইর উপর নির্ভর করবে যে, সত্যি লোকটি যাকাত পাবার উপযুক্ত কি না? আপনি যদি নিশ্চিন্ত হন যে, লোকটি যাকাত পাবার উপযুক্ত, তবে ইচ্ছা করলে তাক দিতেও পারেন আবার নাও দিতেপারেন।

১৪২. ভুল কাজ দেখলে মনে কষ্ট লাগা

প্রশ্নঃ জানিনা কেন আমার এমন হয়, কাউকেও ভুল কাজ করতে দেখলে আমার খুব রাগ হয়, মনে বড় ব্যথা পাই। অথচ ঐকাজটার সাথে আমার তেমন কোনো সম্পর্কও নেই, কিন্তু মনে আমার দারুণ কষ্ট হয়। যেমন, কাউকেও নামায না পড়তে দেখলে, আমি মনে ভীষণ কষ্ট পাই। আমার এরোগের কোনো চিকিৎসা আছে কি?

জবাবঃ আসলে আপনার এটাতো কোনো রোগই নয়। সুতরাং চিকিৎসা করবেন কিসের? এটাতো সুস্থতারই লক্ষন। কাউকেও নামায না পড়তে দেখে আপনি যদি মনে কষ্ট অনুভব না করতেন, তবেই এ আশংকা থাকতো যে আপনিও হয়তো একদিন নামায ত্যাগ করবেন। আপনার মধ্যে অবশ্যিই এধরনের কষ্টানুভব হওয়া উচিত। বরঞ্চ এর চাইতেও অগ্রসর হয়ে তাকে উপদেশ দান করা এবং তার দায়িত্ব ও কর্তব্য তাকে স্মরণ করিযে দেয়া উচিত। অবশ্য রাগ করা এবং ব্যথানুভব করার একটা সীমা আছে। এরাগ আসা এবং ব্যাথানুভব করার কারণে আপনি যদি ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে তাকে উপদেশ দিয়ে যান তবে এ রাগ করা এবং ব্যথা অনুভব করা নিঃসন্দেহে কল্যাণকর। কিন্তু এর ফলে যদি আপনি তার সাথে কোনো প্রকার ঝনঝাট বা জটিলতা সৃষ্টি করে বসেন, তবে তা হবে অবিবেচনা প্রসূত ভ্রান্ত রাগ।

এখানে একথা পরিষ্কার থাকা দরকার যে, আমি সব ধরনের রাগকেই বৈধ বলছিনে। তবে উল্লেখিত ধরনের রাগ কারো মধ্যে না এলে সেটা ঈমানের দুর্বলতারই লক্ষন।

১৪৩. দুই এবং তিন তালাকের বিধান

প্রশ্নঃ দু' বছর পূর্বে এক ব্যক্তি রাগের মাথায় তার স্ত্রীকে বললো, আমি তোমাকে প্রথম তালাক দিলাম। দু'বছর পর ঝগড়া ঝাটির সময় সে পুনরায় বললো, আমি তোমাকে দ্বিতীয় তালাক দিলাম। এরূপ তালাকের শরয়ী বিধান কি?

জবাবঃ এটা পরিষ্কার কথা যে, এমতাবস্থায় দ্বিতীয় তালাকও কার্যকর হয়ে যাবে। এখন জীবনে কখনো তার মুখ থেকে তার বিবির জন্যে তালাক শব্দটি বের হলেই পরিপূর্ণ তালাক হয়ে যাবে। কারণ এর ফলে তিন তালাক কার্যকর হয়ে গেলো। সুতরাং তৃতীয়বার তালাক শব্দ উচ্চারণ করার পূর্বে তাকে ভালভাবে চিন্তা ভাবনা করে নিতে হবে, সত্যি সে চিরজীবনের জন্যে তার বিবিকে ত্যাগ করবে কি না?

১৪৪. রাগের মাথায় স্ত্রীকে মা বলা

প্রশ্নঃ রাগের মাথায় স্ত্রীকে মা বললে তো কাফফারা আদায় করতে হয়। কিন্তু কেউ যদি মুখে না বলে মনে মনে বললো, তাকেও কি কাফফারা দিতে হবে?

জবাবঃ মনে মনে বললে কাফফারা দিতে হয়না। কিন্তু তার মনে এরূপ কোনো কল্পনা হয়ে থাকলে তা দূর করে ফেলা উচিত এবং এসব ধারণা কল্পনা থেকে মনকে সবসময় পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করা উচিত। শরয়ী বিধান কেবল তখনই কার্যকর হয়, যখন কেউ কার্যত কোনো কথা বলে ফেলে কিংবা কোনো কাজ করে ফেলে। মানুষের মনে তো কতো চিন্তাই উঁকি মারে। এমনকি কোনো কোনো সময় শিরকী এবং কুফরী চিন্তা পর্যন্ত উঁকি মারে। এসব চিন্তার উপর কোনো শরয়ী বিধান আরোপিত হয় না। কারণ এগুলোতো কেবল চিন্তা। মনে উদ্রেক হয় আবার চলে যায়। অবশ্য এসব কুচিন্তা মনে স্থান দেয়া ঠিক নয়। আল্লাহর নিকট এগুলো থেকে পানাহ্ চাওয়া উচিত।[১]

১৪৫. নবীদের নিষ্পাপ হবার তাৎপর্য

প্রশ্নঃ কুরআন মজীদে ইউনূস (আঃ) সম্পর্কে যে বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে বুঝা যায় তিনি তাঁর কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেননা। আর যদি অবহিত থেকেই থাকেন, তবে কি তিনি জেনে বুঝে জনপদ ত্যাগ করেছিলেন? যদি তাই হয় তবে নবী কিভাবে নিষ্পাপ থাকলেন? বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করুন। কারণ এতে আল্লাহ তা'আলার নবী মনোনীত করার ব্যাপারেও প্রশ্নের সৃষ্টি হয়?

জবাবঃ আপনার প্রশ্নের একটি জবাবতো হচ্ছে এই যে, এধরনের সকল অভিযোগ আপত্তি একত্র করে আল্লাহর নিকট পাঠিয়ে দিন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করুন, আপনি এটা কি কাজ করলেন?

আসলে আপনি যে প্রশ্ন করেছেন তার জবাব খুবই স্পষ্ট ও পরিষ্কার।

একস্থানেই নয়, বরঞ্চ কুরআন মজীদে বহুস্থানেই আল্লাহ তা'আলা এধরনের ঘটনা উল্লেখ করেছেন, যা কোনো না কোনো নবীর দ্বারা সংঘটিত হয়েছে এবং সে ঘটনা যে আল্লাহ তা'আলার অপছন্দনীয় তাও তিনি উল্লেখ করেছেন। যেমন,

---

১. আইন ১৬ নভেম্বর ১৯৬৮ ইং।

হযরত নূহ (আঃ) নিজের পুত্রকে পানির উত্তাল তরঙ্গে নিমজ্জিত হতে দেখে আল্লাহ তাআলার কাছে তাকে রক্ষার জন্যে ফরিয়াদ করেন। তাঁর এই আবেদনের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে কঠোর ভাষায় সতর্ক করে দেন। সূরায়ে হুদে সাবধান বাণীটি এভাবে উচ্চারিত হয়েছেঃ "ইন্নি আয়িযুকা আন্ তাকূনা মিনাল জাহিলীন–আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, তুমি জাহিলদের মতো কথা বলো না।" আদম (আঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ "ওয়া আসা আদামু রাব্বাহু ফাগাওয়া–আর আদম তার রবের নাফরমানী করলো এবং প্ররোচিত হলো।" একইভাবে হযরত দাউদ (আঃ) এবং ইউনূস (আঃ) সম্পর্কে ব্যবহারিত বাক্য কুরআনে বর্তমান রয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, নবীর দ্বারা যে এরূপ কাজ সংঘটিত হবে তাকি আল্লাহ তা'আলা জানতেন না? যদি না–ই জানতেন এবং পরবর্তীতে যখন কোনো এক সময় ঘটনা ঘটে যাবার পর তিনি জানতে পারলেন (মায়'যাল্লাহ্) তখন তো আল্লাহ তা'আলার উপরই অভিযোগ আরোপিত হয়? অর্থাৎ নুবয়্যতের পরিবর্তে খোদায়িত্বই (উলূহিয়্যত) অভিযোগের বিপদে আক্রান্ত হয়। আর আল্লাহ যদি ঘটনা জানতেনই তবে জেনে বুঝে নবীর দ্বারা সে ধরনের কাজ সংঘটিত হতে দেবার অর্থ কি, যা তাঁর পছন্দনীয় নয়? নবীকে নিষ্পাপ রাখার দাবীতো এটাই ছিলো যে, এধরনের কাজ সংঘটিত হবার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তা সংঘটিত হবার পথ বন্ধ করে দিতেন। ছেলের জন্যে সুপারিশ করার পূর্বেই নূহ (আঃ)কে সুপারিশ থেকে বিরত রাখতেন। মুহাম্মদ (সা) কর্তৃক নিজের জন্যে মধু হরাম করার পূর্বেই এব্যাপারে তাঁকে সতর্ক করে দিতেন।

এগুলোই তো ছিল নবীর নিষ্পাপ হবার দাবী। কিন্তু কুরআন সাক্ষী দিচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীদের দ্বারা কিছু অপছন্দনীয় ঘটনা সংঘটিত হতে দিয়েছেন। কারো দ্বারা একটি আবার কারো দ্বারা দু'টি সংঘটিত হতে দিয়েছেন এবং সংঘটিত হয়ে যাবার পর সেবিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করেছেন। তাছাড়া সতর্কীকরণের কাজটাও চুপিসারে করেননি। এমনটি হয়নি যে, জিব্রাঈল (আঃ) এসে চুপিচুপি বলে গেছেন, একাজ আপনি ঠিক করেননি। বরঞ্চ সতর্কীকরণের কাজটিও আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ্যে সকলকে জানিয়ে করেছেন এবং তা স্বীয় কিতাবেরও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ঐ কিতাবের অন্তর্ভুক্ত করেছেন যা আমরা আপনারা সবাই পড়ি এবং কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ পড়তে থাকবে।

আল্লাহ তা'আলার একর্মনীতির অর্থ আমি এটাই বুঝি যে, তিনি মানুষকে এই শিক্ষাই দিতে চান, নবীগণ তাদের ব্যক্তি ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের দিক

থেকে খোদায়ী গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেননা। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সত্তা যেমন সকল প্রকার দোষ ক্রটির উর্ধে, তেমনিভাবে নবীদের ব্যক্তিসত্তা সকল প্রকার দোষ ক্রটি এবং দুর্বলতার উর্ধে নয়। কারণ তা না হলে তো আল্লাহ এবং নবীদের মধ্যে কোনো পার্থক্যই বাকী থাকেনা। নবীরা নিষ্পাপ, তবে তা তাদের ব্যক্তিসত্তার দিক থেকে নয়, বরঞ্চ নবুয়্যতী মর্যাদার দিক থেকে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ভুল ক্রটি ও দুর্বলতা থেকে রক্ষা করেন। আর এটাই নবীদের নিষ্পাপ হবার অর্থ। 'ইসমত' শব্দের অর্থ রক্ষাকরা, নিষ্পাপ হওয়া নয়। অর্থাৎ নবীদের ভুল–ক্রটি যদি না হয়ে থাকে তবে তা এজন্যেই হয়না যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে রক্ষা করেন। খুঁটি নাটি দু একটি ক্রটি হয়ে যাওয়া এবং আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তা সংঘটিত হবার পথ বন্ধ না করা, বরঞ্চ সংঘটিত হয়ে যাবার পর সেবিষয়ে সতর্ক করা এবং তা কুরআন মজীদে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, মানুষ যেন এশিক্ষাই গ্রহণ করে, নবীরা মানুষ ছিলেন, ইলাহ খোদা বা মা'বুদ ছিলেন না।

কুরআনে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এই শিক্ষা দিচ্ছেনঃ 'নবীরা মানুষ ছিলেন। কিন্তু আমি তাদের দ্বারা কাজ আদায় করে নিতে চেয়েছি বলে তারা ভুল ক্রটির উর্ধে ছিলো। তারাও যদি ভুল ক্রটি করতো তবে কিভাবে পৃথিবীর সংশোধন করতে পারতো? তাই আমি তাদেরকে ভুল ক্রটি থেকে রক্ষা করেছি। কিন্তু দেখ, কিছু সময়ের জন্যে আমার রক্ষা রজ্জু (ইসমত) একটু ঢিলা দেবার ফলে তাদের দ্বারাও ভুল ক্রটির কাজ সংঘটিত হয়ে গেছে।' এতে বুঝাগেল, তাঁরা মানুষ ছিলেন। আল্লাহর রক্ষা করার ফলেই তারা রক্ষা পেয়েছেন। তাঁরা নিজেরাই ইলাহ ছিলেন না। নবীদের নিষ্পাপ হবার তাৎপর্য আমি এটাই বুঝি। কেউ যদি উপরোল্লেখিত আয়াত অংশগুলো থেকে এর চাইতে অধিকতর যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারেন তবে আমি সবসময় তা গ্রহণ করার জন্যে প্রস্তুত রয়েছি। আমিতো এসম্পর্কে ততোটুকুই বললাম, গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করার পর আমি যা বুঝতে পেরেছি।

প্রশ্নঃ নবীদের থেকে এমন সব দুর্বলতা প্রকাশ হয়েছিল যারপর আল্লাহ তা'আলা তাদের কঠিন শাস্তি দিয়েছিলেন। এমনটি হবার পর নবীদের নিষ্পাপ হবার আকীদা কি নিরর্থক হয়ে যায়না?

জবাবঃ এধরনের চিন্তা পদ্ধতি দ্বারা যে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাকেই অভিযুক্ত করা হয়, তা ভেবে দেখার জন্যে আপনাকে আহ্বান জানাচ্ছি। চিন্তা করে দেখুন, স্বয়ং কুরআন মজীদ বলছে ইউসূস (আঃ) কে মাছের পেটে নিক্ষেপ করা হয়েছে। তাঁর সম্পর্কে কুরআনঃ 'ইয্ আবাকা ইলাল ফুলকিল মাশহুন' শব্দ ব্যবহার করেছে। আরবী ভাষায় অভিজ্ঞ সকল ব্যক্তিই জানেন 'আবাকা' শব্দটি পালিয়ে যাওয়া দাসকে বুঝানোর জন্যে ব্যবহার করা হয়। আবাকা অর্থ সেই দাস যে স্বীয় মনিবের কাজ বা নিয়ন্ত্রণ থেকে ভেগে যায়।

হযরত ইউনুস (আঃ)কে মাছের পেটে নিক্ষেপ করা হয় এবং স্পষ্টভাবে বলা হয়, 'সে যদি আমাকে না ডাকতো এবং আমি স্বীয় অনুগ্রহ দ্বারা তাকে রক্ষা না করতাম তবে তার এইরূপ চরম বিপদ হতো।' প্রশ্ন হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা কি বিনা কারণেই লোকদের শাস্তি দেন। যেখানে কোনো শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয় এবং শাস্তির কোনো যুক্তিসংগত কারণ না থাকে, তবে সেখানে তো আল্লাহর প্রতিই এই অভিযোগ আরোপিত হয় যে, তিনি বিনা অপরাধে মানুষকে কঠিন শাস্তি প্রদান করছেন। এখন ভেবে দেখুন, কুরআনের আয়াতের আলোকে নবীর নিষ্পাপ হবার অর্থ কি হতে পারে। এরপর একথাও চিন্তা করে দেখুন, নবীর নিষ্পাপ হবার আকীদা আপনি নিজেই উদ্ভাবন করেছেন, না কি আল্লাহর কুরআন এবং নবীর (সাঃ) হাদীস থেকে লাভ করেছেন? এই আকীদা যদি আপনার মমগড়া হয়ে থাকে তবে এর দায় দায়িত্ব আপনার। যতো ইচ্ছা এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আপনি করতে থাকুন। আর যদি এই আকীদা কুরআন হাদীস থেকে গ্রহণ করে থাকেন তবে তা এতদসংক্রান্ত কুরআনের আয়াত এবং রাসূলের (সাঃ) হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যশীল হতে হবে, সাংঘর্ষিক নয়।

কোনো আকীদাকেআপনি নিজেই যদি নিজের মনে একটা রূপদান করেন, আর তা যদি কুরআনের আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তবে আপনার আকীদাই সংশোধনযোগ্য। কুরআনের আয়াত নয়।

১৪৬. রোযার কষ্ট ও বিশেষ দিনের রোযা

প্রশ্নঃ রোযা আশূরার দিন রাখা হোক কিংবা অন্য কোনো দিন, সর্বাবস্থায় রোযা রাখার কষ্টতো একই রকম হয়ে থাকে। তবে বিশেষ বিশেষ দিন রোযা রাখার পুরস্কার বড় হয়ে থাকে কেনো?

জবাবঃ নেক কাজ যখনই করা হোক, তার জন্যে পুরস্কার রয়েছে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ দিনের সাথে নেকীকে সম্পৃক্ত করার কয়েকটি কারণ থাকতে পারে। যেমন আশূরার রোযা। এইদিন ফেরাউনের মতো দুর্ধর্ষ শাসক এবং তার বাহিনীকে বনী ইসরাঈলীদের চোখের সামনে পানিতে নিমজ্জিত করে আল্লাহ তাদেরকে তাদের গোলামী থেকে মুক্ত করেন। তাই হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহর কৃতজ্ঞতা (শুকরিয়া) প্রকাশ করার জন্যে এইদিন রোযা রাখতেন। এখন কেউ যদি ঐ বিরাট ঘটনার স্মরণে সেদিনটিতে রোযা রাখে, তবে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এই দিনকার রোযা দ্বারা তার অন্তরে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তা সৃষ্টি হওয়া অন্য দিনকার রোযা দ্বারা সম্ভব নয়। এজন্যেই এদিনকার রোযার অধিক মর্যাদা রয়েছে। একইভাবে আরাফার দিনের রোযাও মর্যাদাশীল। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এদিনকার রোযাও অন্য যেকোনো দিনকার রোযার মতোই। কিন্তু চিন্তা করে দেখুন, এই দিনটিতে আপনি এখানে বসে আছেন। অথচ একই সময় ওখানে হজ্ব হচ্ছে। মানুষ আরাফাতের ময়দানে সমবেত হয়েছেন। এই দিনটিতে রোযা রাখার অর্থ এই দাঁড়ায়, আপনার অন্তর আরাফাতের ময়দানে ছুটে গিয়েছে। আপনার মন আরাফার হাজীদের মতোই আল্লাহর দরবারে হাজিরা দিচ্ছে। এখন এই দিনটির রোযা আপনার মনের মধ্যে যে অবস্থা সৃষ্টি করবে তা কি অন্য দিনের রোযা দ্বারা সম্ভব?

১৪৭. মান্নতের রোযা

প্রশ্নঃ এক ব্যক্তি রোযা রাখার মান্নত করেছে। কিন্তু রোযা রাখার শক্তি তার নেই। এমতাবস্থায় তার পক্ষ থেকে তার মা, ভাই কিংবা অন্য কেউ রোযা রাখতে পারে কি?

জবাবঃ যে ব্যক্তি মান্নত করলো তার পক্ষ থেকে অন্য কেউ রোযা রাখলে মান্নতপূর্ণহবেনা।

১৪৮. মানুষের ফিতরাত

প্রশ্নঃ কুরআন মজীদে এরশাদ হয়েছেঃ فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا এই আয়াত থেকে বুঝা যায় মানুষকে নেক স্বভাব প্রকৃতির (ফিতরাত) উপর সৃষ্টি করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, মানুষকে যদি নেক ফিতরাতের উপরই সৃষ্টি

করা হয়ে থাকে, তবে হিদায়াত কবুল করার জন্যে প্রতিটি মানুষকে কেন শরহে সদর (অন্তরের প্রশস্ততা ও উন্মুক্ততা) দেয়া হয় না?

জবাবঃ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যদি প্রত্যেক মানুষের অন্তরকে প্রকৃতিগতভাবেই প্রশস্ত করে দেয়া হয়, তবে পৃথিবীতে তার পরীক্ষা হবে কোন্ পন্থায়? মানুষকে তখনই অন্তরের প্রশস্ততা দান করা হয়, যখন সে স্বীয় ফিতরাতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, বিচ্যুত হয়না। সে যখন ফিতরাত থেকে বিচ্যুত হতে থাকে তখন সে নিজের হিদায়াতের দায়ীত্ব নিজেই গ্রহণ করে এবং এতে আল্লাহর দরবারে পাকড়াও হবার অবকাশ সৃষ্টি হয়ে যায়। অতপর অন্তরের প্রশস্ততা তখনই দেয়া হয়, যখন সে সতর্ক হয়ে আলাহর দিকে ফিরে আসে। কিন্তু সে যদি ঈমানদারী এবং নিষ্ঠার সাথে ফিরে না আসে, তবে সে তা লাভ করতে পারবেনা। কারণ অন্তরের প্রশস্ততা '(শরহে সদর') এমন কোনো ব্যক্তি লাভ কতে পারেনা, যে তা লাভ করার জন্যে আকাংখী হয়না। আল্লাহ কাউকে তোষামোদ করে তার অন্তরে এজিনিস ঢুকিয়ে দেননা।

১৪৯. মানুষ এবং পার্থিব জীবনের অবিরাম চেষ্টা

প্রশ্নঃ হিংসা বিদ্বেষ এবং লোভ লালসা অন্তরকে আচ্ছন্ন করে আছে। ঈমানের দূর্বলতা অনুভব করছি। নামায পড়ি, কিন্তু তাতে মন বসেনা। আমার মতো হাজারো মানুষ এই রোগে নিমজ্জিত। এই রোগের কার্যকর চিকিৎসা বলে দিন এবং আমার জন্যে দোয়া করুন।

জবাবঃ আল্লাহ তা'আলা প্রশ্নকর্তাকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা দান করুন এবং নফসের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন। আসলে পৃথিবীতে মানুষ একটি চিরস্থায়ী সংঘাতে নিমজ্জিত রয়েছে। শয়তান তাকে একদিকে টানছে আর তার আত্মিক শক্তি তাকে আরেক দিকে টানছে। উভয় জিনিসের টানাটানিতে মানুষের এই পরীক্ষা হচ্ছে যে, সে তার শক্তি সামর্থকে কোন্ দিকে ব্যয় করছে। শয়তান যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে তাকে হাঁকিয়ে নেবার জন্যে সে কি তার লাগাম ঢিল দিয়ে রেখেছে? নাকি সে নিজের ইচ্ছা শক্তি ও চেষ্টা সংগ্রামকে ঐদিকে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত করেছে, যে দিকে তার আত্মিক শক্তিসমূহ তাকে নিয়ে যেতে চাচ্ছে? এর মধ্যে রয়েছে মানুষের পরীক্ষা। এপরীক্ষায় কেউ অপর কারো দোয়া বা প্রভাবে ততোক্ষণ পর্যন্ত কামিয়াব হতে পারেনা যতোক্ষণনা সেই সাথে সে নিজেও কামিয়াবীর জন্যে প্রাণান্তকর চেষ্টা সংগ্রাম চালিয়ে যায়। দোয়া তো তখুনি

কার্যকর হয়, যখন দোয়ার সাথে মানুষের চেষ্টাও যুক্ত হয়। দোয়ার সাথে যদি মানুষের প্রচেষ্টা যুক্ত না হয়, তবে দোয়া কোন্ কাজটিকে কল্যাণ দান করবে? আপনি তো সেই দেহই প্রস্তুত করলেননা যাতে আত্মা ঢুকানো হবে?

কারো যদি অসুখ হয়, আর তিনি যদি ঔষধ না খান, বেছে গুছে না চলেন এবং ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ না করেন, তবে দোয়া তাকে কোন্ কাজে কল্যাণ দান করবে? যে কাজটি করার দায়িত্ব আপনার, আপনি সেটি সম্পাদন করার জন্যে সাধ্যমতো চেষ্টা করে যান। তবেই আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সাহায্য করবেন। আর দোয়া কার্যকর হবার পন্থাও এটাই।

১৫০. পানাহারের বস্তুতে মাছি বসলে করণীয়

প্রশ্নঃ পানাহারের বস্তুতে মাছি পড়া সম্পর্কে যে হাদীস আছে সেটা কি সহী শুদ্ধ হাদীস? পানাহারের বস্তুতে মাছি পড়লে তাকে পুরোপুরি ডুবিয়ে দেয়াটা কি অভদ্রতা এবং অরুচিকর নয়?

জবাবঃ হাদীসটি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ। সকলেরই এই হাদীসের উপর আমল করা কর্তব্য। খাবার জিনিসে মাছি পড়লে মাছিটিকে পুরোপুরি ডুবিয়ে নিয়ে ফেলে দিতে হবে। অতপর সে খাবার খেতে হবে। তরকারীর পাত্রে যদি মাছি পড়ে, আর আপনি মাছিটি বের করে সেই তরকারী না খান, তবে প্রশ্ন জাগে, আপনার একাজের উদ্দেশ্য কি? আপনার উদ্দেশ্য তো এটাই হতে পারে যে, এখন আপনি সেই তরকারী আপনার চাকর, কর্মচারী কিংবা কোনো গরীব ব্যক্তিকে খেতে দেবেন। মাছি পড়ার কারণে যে তরকারী আপনি নিজে খেলেননা, সেই তরকারী চাকর, কর্মচারী কিংবা কোনো গরীব ব্যক্তিকে খেতে দেয়া কি সঠিব কাজ হতে পারে? অথবা আপনি তরকারীগুলো ফেলে দিলেন। ফেলে দেয়ার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, অধিক ধন সম্পদের কারণে আপনি অহংকারে নিমজ্জিত হয়েছেন। আপনার ঘরে যদি দারিদ্র্য থাকতো, আপনি যদি অর্থনৈতিক টানাপোড়নে থাকতেন, তবে আপনি কখানো তরকারীগুলো ফেলে দিতেন না। অর্থাৎ এমতাবস্থায় আপনি দু' ধরনের কাজ করতে পারেন।

১) হয় আপনি নিজেকে এতোটা উচ্চ মর্যাদার লোক মনে করেন যে, এরূপ জিনিস খাওয়া আপনার পক্ষে শোভা পায়না। কিন্তু আপনার চাকর বাকর কিংবা ফকির গরীব লোকদের মর্যাদা এতো তুচ্ছ মনে করেন যে, এরূপ জিনিস খাওয়া

তাদেরই কাজ ২) কিংবা জিনিসগুলো ফেলে দিয়ে আপনি ধন সম্পদের অহংকারে নিমজ্জিত হয়েছেন বলে প্রমাণ করলেন। উভয় অবস্থাতেই এর চিকিৎসা হচ্ছে তাই যা হাদীসে বলা হয়েছে।[১]

১৫১. জিব্রাঈলের রিপোর্ট

প্রশ্ন ঃ تَعْرُجُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ ـ আপনি সূরা মায়ারিজের এই আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, ফেরেশতাগণ এবং রূহ (জিব্রাঈল আঃ) রিপোর্ট নিয়ে আল্লাহর কাছে গমন করেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ফেরেশতারা রিপোর্ট দিলেই তিনি জিনিসগুলো অবগত হবেন, আল্লাহ তা'আলার কি এমনটির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে?

জবাবঃ জিনিসগুলো সরাসরি আল্লাহর জানা থাকা আর সেগুলো সম্পর্কে নিজেদের দায়িত্ব হিসেবে ফেরেশতাদের রিপোর্ট পেশ করা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। সংক্ষিপ্তাকারে আমি বিষয়টির ব্যাখ্যা করছিঃ

একটি উদাহরণ দিচ্ছি, এটা সকলেরই জানা যে, আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি জিনিসই সরাসরি জানেন এবং দেখেন। অমুক স্থানে অমুক ব্যক্তি অপরাধ করছে এটা তাঁর জানা রয়েছে। কিন্তু কিয়ামতের দিন যখন লোকটির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা জারি করা হবে এবং আদালতে তার মামলা পেশ করা হবে, তখন তার বিরুদ্ধে কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ দাঁড় করানো ছাড়াই তার উপর দন্ডাদেশ জারি করা কি ন্যায় ও ইনসাফের দাবী হতে পারে? আইন এবং আদালতের এটা একটা গরুত্বপূর্ণ মূলনীতি যে, বিচারক কর্তৃক সরাসরি অপরাধীকে অপরাধ করতে দেখাটা কোনো সাক্ষ্য (EVIDENCE) নয়, যার ভিত্তিতে তিনি তার শাস্তির ফায়সালা করতে পারেন। আইন, ইনসাফ এবং আদালতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, সাক্ষ্য এবং প্রমাণ সরবরাহ করা। ফায়সালা দেয়ার জন্যে বিচারকের প্রত্যক্ষ জ্ঞান নয়, বরঞ্চ সাক্ষ্য এবং রেকর্ড পত্র বর্তমান থাকা প্রয়োজন। সুতরাং কিয়ামতের দিন ফেরেশতারা সাক্ষ্য দেবে আমাদের সম্মুখে অমুক ব্যক্তি অমুক কাজ করেছিল। ফেরেশতারা প্রত্যেক ব্যক্তির আমলনামা প্রস্তুত করছে। তাদের সাক্ষ্য এবং রেকর্ড যখন একথা প্রমাণ করবে যে, লোকটি একাজ করেছিল, কেবল তখনই তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে। একইভাবে

---

১. সাপ্তাহিক আইন, ২১শে এপ্রিল ১৯৬৮।

একথাটিও মন মস্তিষ্কে খোঁদাই করে নেয়া উচিত যে, আল্লাহ তা'আলা এক বিরাট সম্রাজ্যের ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করছেন। আর সেই ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্যে তিনি নিজেই এমনসব কর্মচারী সৃষ্টি করেছেন যারা তাঁর ফরমান ও বিধান কার্যকর করছে। আল্লাহ তা'আলা নবীর নিকট ওহী পাঠানোর ফায়সালা করে নিজেই ওহী নিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হননা, কিংবা সরাসরি নবীর কানে নিক্ষেপ করেননা। বরঞ্চ একাজের জন্যে তিনি ফেরেশতা নিয়োগ করেন। ফেরেশতা ওহী এনে নবীর কাছে পৌছে দেন। এখন ফেরেশতার উপর ওহী পৌছানোর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, সেই প্রেক্ষিতে আল্লাহর কাছে ফিরে গিয়ে এই রিপোর্ট করাও তার কর্তব্য যে, আমার উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল তা আমি পালন করেছি। এটা একটা প্রতিষ্ঠিত নিয়ম যে, কর্মচারীরা নিজ নিজ কার্যসম্পাদন সম্পর্কে কর্মকর্তাকে অবহিত করবে। এটা কর্মচারীদের দায়িত্ব। কর্মকর্তা কর্মচারীর কাজ সম্পর্কে সরাসরি অবহিত হওয়া সত্ত্বেও কর্মচারীকে তার কাজের রিপোর্ট দিতে হয়। কেননা কর্মচারী বা চাকরের স্বাভাবিক কর্তব্যের মধ্যে এটাও একটি যে তাকে যে কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সে তা সম্পাদনের রিপোর্ট তার কর্মকর্তা বা মনিবকে প্রদান করবে।

১৫২. আল্লাহ এবং দৈহিক সত্তা

প্রশ্নঃ تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ 'রূহ' এবং ফেরেশতারা তাঁর দিকে গমন করে' বাক্য দ্বারা আল্লাহর দেহসত্তাধারী হবার অর্থ প্রকাশ পায়। এথেকে যেন একথা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা কোনো একটি সীমাবদ্ধ স্থানে অবস্থান করছেন, আর ফেরেশতারা রিপোর্ট নিয়ে সেখানে তাঁর নিকট পৌছে। এই জটিলতার সমাধান কি?

জবাব ঃ শুধু এই একটিই নয়, আরো অনেক জিনিস দ্বারাই এঅবস্থার সৃষ্টি হয়। যেমন মে'রাজ। রাসূলুল্লাহর (সাঃ) মে'রাজ দ্বারা কেউ এধারণা করতে পারে, আলাহ তা'আলা কোনো একটি স্থানে অবস্থান করছিলেন (নাউযুবিল্লাহ), আর নবী করীম (সাঃ) তাঁর নিকট পৌছেন। তা নাহলে তো মে'রাজ পৃথিবীতে হতে পারতো। প্রকৃত পক্ষে এগুলো এমন সব জিনিস যে, এগুলোর পিছে যতো মাথা ঘামাবেন, ততোই এগুলো আপনার জন্যে ফিতনা সৃষ্টি করতে থাকবে। এগুলো খোঁজা খুঁজি করতে গেলে আপনার মনে এমন সব প্রশ্ন সৃষ্টি হতে থাকবে, যেগুলোর জবাব পৃথিবীতে কেউ দিতে পারবেনা। মানুষ এসব প্রশ্নের যে

জবাবই গ্রহণ করুকনা কেন, তাতেই ফিতনা বিদ্যমান থাকবে। সুতরাং ভালভাবে এই মূলনীতি বুঝে নিন, যেসব জিনিস আপনার চেতনা ও অনুভূতির বাইরে সেগুলি সম্পর্কে কেবল এতোটুকুই জানবেন ও মানবেন যতোটুকু প্রকাশ করা হয়েছে। তার চাইতে বেশী ও বিস্তারিত উদ্‌ঘাটন করার জন্যে যখনই চেষ্টা করবেন তখন অবশ্যই আপনার দূর্ভাগ্য আপনাকে ডাকতে থাকবে। যেমন ধরুন কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ (বাইয়াতে রিদাওয়ানের সময়) 'আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর ছিল'। এখানে যেহেতু আল্লাহ্‌র জন্যে হাত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তখন কোনো ব্যক্তি এধারণা করে বসতে পারে যে, এর অর্থ একটি কাব্জিতে লাগানো পাঁচ আঙ্গুল বিশিষ্ট হাত যা একটি দেহের অংশ বিশেষ। এখন এখানে হাত বলতে কি বুঝানো হয়েছে কেউ যদি তা অনুসন্ধানের জন্যে আত্মনিয়োগ করে তবে সে নির্ঘাত ফিতনায় নিমজ্জিত হবে। কারণ তার কাছে তো এর প্রকৃত অর্থ নির্ণয়ের কোনো মাধ্যম নেই। আল্লাহ তা'আলা তো আমাদের ইন্দ্রিয় অনুভূতির উর্ধ্বে এক মহান সত্তা। মানুষতো কেবল সেই সব ব্যাপারেই ধারণা করতে পারে যেগুলো তার অনুভূতির আওতায় রয়েছে। কিন্তু যেগুলো তার অনুভূতির উর্ধ্বে, সেগুলো সম্পর্কে ধারণা দেয়ার জন্যে আমরা তো সেই সব শব্দ ব্যবহার করতেই বাধ্য, যেগুলো মানুষের মধ্যে প্রচলিত আছে। আর ইন্দ্রীয় অনুভূতির বাইরের জিনিসের জন্যে মানবীয় ভাষায় কোনো শব্দ নেই। মানবীয় ভাষার প্রতিটি শব্দ তো কেবল ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য জিনিসের জন্যে। এখন একথা পরিষ্কার হলো যে, ইন্দ্রীয় অনুভূতির উর্ধ্বেকার কোনো জিনিসের জন্যে যখন কোনো মানবীয় ভাষা ব্যবহার করা হয়, তখন তার অর্থ কিছুতেই তার হুবহু হয়না, যে অর্থ হয়ে থাকে মানুষের ভাষায়। মানুষ কাছাকাছি যে ধারণা পোষণ করতে পারে তা তারা এসব শব্দ দ্বারাই করতে পারে। এজন্যেই এসব শব্দ ব্যবহার করা হয়। যে ব্যক্তি এসব শব্দের অর্থ নির্ণয়ের জন্যে আত্মনিয়োগ করে, সে তো কেবল আত্ম যুলুমই করে। এজন্যেই কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, কেবল তারাই 'মুতাশবিহাতের' অর্থ নির্ণয়ে মাথা ঘামায়, যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে। যে কেউ এধরনের চেষ্টা করে সে মূলত নিজের উপরেই যুলুম করে। বড় বড় গুমরাহ্ ফির্‌কা এজন্যেই সৃষ্টি হয়েছে যে, লোকেরা মুতাশাবিহাতের অর্থ নির্ণয়ের পিছে ছুটছে। তাই আপনাকে বলছি, একাজ থেকে বিরত থাকুন। আর আমি নিজেও আল্লাহ্‌র কাছে এধরনের ফিতনা থেকে রক্ষা চাই।

১৫৩. পৃথিবীর আগুন এবং জাহান্নামের আগুনের পার্থক্য

প্রশ্ন ঃ আপনি দুনিয়ার আগুন এবং জাহান্নামের আগুনের পার্থক্য করেছেন। আপনি বলেছেন, দুনিয়ার আগুন সব কিছুকেই পুড়ে ফেলে, নেক বদ সবাইকেই জ্বালিয়ে দেয়। কিন্তু দোযখের আগুন কেবল বদকার লোকদের জ্বালাবে। নেক্কারকে স্পর্শও করবেনা। প্রশ্ন হচ্ছে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)কে তো দুনিয়ার আগুনই পোড়াতে অস্বীকার করেছিলো। এর কারণ কি?

জবাব ঃ সে আগুন আল্লাহ্‌র নির্দেশে তাঁকে পোড়াতে অস্বীকার করেছে। আগুন নিজেই এসিদ্ধান্ত নেয়নি। এটাই হচ্ছে আপনার প্রশ্নের জবাব। আরো স্পষ্ট হবার জন্যে একথা বুঝে নিন যে, সকল আগুনই নেক বদ সবাইকে পোড়ায়। তবে কোনো একটি আগুনকে বিশেষ কোনো নেক বান্দাকে না পোড়াতে নির্দেশ দেয়ার ফলে আগুনের প্রকৃতিতে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি হয়না। কারণ সকল বিধানেই কিছু ব্যতিক্রম থাকে। আর সকল বিধানই আল্লাহ্‌র হুকুমের অনুগত। আল্লাহ্ তা'আলার সাধারণ বিধান হচ্ছে এই যে, আগুন দুনিয়াতে সব কিছুকে পুড়িয়ে দেবে, চাই সে জিনিস পোড়াবার উপযুক্ত হোক বা না হোক। কিন্তু কোনো বিশেষ সময় আল্লাহ তা'য়ালা আগুনকে হুকুম দেন, এই ব্যক্তি পোড়াবার উপযুক্ত নয়। তখন আগুন তাকে পোড়ায়না।[১]

১৫৪. দাসী প্রসংগ

প্রশ্ন ঃ আল মায়ারিজ একটি মক্কী সূরা। এ সূরায় দাসীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ মক্কী জীবনে যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়নি। সুতরাং ঐ সময়ে যুদ্ধবন্দী সূত্রে দাসী থাকার প্রশ্নই সৃষ্টি হয়নি। তবে কি তখন লোকদের কাছে ক্রীতদাসী ছিলো? আর তাদের মর্যাদা কি যুদ্ধবনদী দাসীর মতোই ছিলো? মেহেরবাণী করে বুঝিয়ে বলুন।

জবাবঃ খোদার শরীয়তের মূলনীতি হচ্ছে এই যে, কোনো বিষয়ে ততোক্ষণ পর্যন্ত প্রচলিত নিয়মই চালু থাকবে যতোক্ষণনা শরীয়ত প্রণেতা সে বিষয়ে বিশেষ কোনো বিধান প্রদান করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) সময় যখন জিহাদ শুরু হয়, তখন দাসীর অর্থ অন্যকিছু হয়ে যায়। কিন্তু যতোদিন জিহাদ শুরু হয়নি এবং দাসী

---

১. সাপ্তাহিক আইন ২৮শে এপ্রিল ১৯৬৮।

প্রসংগে সুস্পষ্ট কোনো বিধান দেয়া হয়নি ততোদিন তাদের ব্যাপারে পূর্ব থেকে চলে আসা প্রথাই চালু রাখা হয়। পূর্ব থেকে আরবে এই প্রথা চলে আসছিল যে, সাধারণাভাবে প্রকাশ্যে দাস দাসী ক্রয় বিক্রয় হতো। এমতাবস্থায় যেসব দাসী বিক্রির জন্যে আনা হতো তারা কি দাসীদেরই বাংশধর, নাকি ফুসলিয়ে আনা হয়েছে? আর নাকি কোনো যুদ্ধে তাদের গ্রেফতার করে আনা হয়েছে এবং সেই যুদ্ধ বৈধ ছিলো কি অবৈধ ছিলো? এসব কিছুই জানা কঠিন ছিলো। প্রত্যেক ক্রেতার পক্ষে এসব কিছুর বিশ্লেষণ করা সম্ভব ছিলোনা। তাছাড়া সেই সমাজ কাঠামোটাই এমন ছিলো যে, দাস দাসী ছাড়া তাদের অর্থনৈতিক জীবন চলতেই পারতোনা। যেমনটি চলতে পারেনা আজকের সমাজে শ্রমিক কর্মচারী ও চাকর চাকরাণী ছাড়া। সেকালে বেতন ভোগী কর্মচারী পাওয়া যেতোনা। কেননা স্বাধীন আরবরা ছিলো বড় অহংকারী। তারা চাকুরী বাকুরী করতে রাজী হতোনা। বর্তমানকালেও তারা এমনটি করতে রাজী হয়না। আর সেকালে তো কোনো স্বাধীন আরব অপরের কোনো চাকুরী করার চিন্তাই করতে পারতোনা। এমনকি না খেয়ে মারা গেলেও একাজ তাদের জন্যে সহজ ছিলোনা। তাই বর্তমানকালে যেমন গোটা সমাজ ব্যবস্থার চাকা শ্রমিক কর্মচারী এবং চাকর বাকরদের দ্বারা চালিত হচ্ছে, তেমনি সেকালেও সমাজ ব্যবস্থা চালিত হতো দাস দাসীদের দ্বারা। একারণেই বিকল্প কার্যকরী ব্যবস্থা প্রদানের পূর্বে ইসলামী শরীয়ত এমন কোনো বিধান প্রদান করেনি যার ফলে গোটা সমাজ ব্যবস্থার কাঠামো বিচূর্ণ হয়ে যেতো। তাই এ অবস্থার প্রেক্ষিতে ইসলাম যখন দাসীদের প্রসংগে বিধান প্রদান করে তখন পর্যন্তও যেসব দাস দাসী পূর্ব থেকে চলে এসেছিলো তাদের মালিকানা বাতিল করেনি। তবে ভবিষ্যতের জন্যে এনিয়ম নির্ধারণ করে দেয় যে, যুদ্ধের ময়দান থেকে যেসব লোক বন্দী হয়ে আসবে এবং যেসব যুদ্ধবন্দীর বিনিময় হতে পারবেনা তাদেরকে লোকদের মালিকানায় দিয়ে দেয়া হবে। আর ঐ সময়টায় বিভিন্ন প্রকার কাফ্ফারা প্রভৃতির মাধ্যমে সাবেক দাসদাসীদের মুক্ত করার ব্যবস্থা করা হবে। অর্থাৎ মালিকানা বাতিল করার পরিবর্তে মানুষকে উৎসাহ দেয়া হয় যে, তোমরা যদি জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে চাও তবে দাস দাসীদের মুক্ত করে দাও। বস্তুত সাহাবায়ে কিরামের সমাজে এরূপ উৎসাহ এবং প্রেরণা দানই যথেষ্ট ছিলো। একজন সাহাবীর ব্যাপারে একথা বর্ণিত হয়েছে, তিনি তাঁর জীবনে ত্রিশ হাজার দাস দাসী ক্রয় করে মুক্ত করে দেন। তিনি যেন তার গোটা সম্পদ একাজেই ব্যয় করে ফেলেছেন। একইভাবে অন্যান্য সাহাবীরাও কেউ এক হাজার কেউ পাঁচশ' কেউ একশ' মোট কথা, নিজ নিজ

সামর্থ অনুযায়ী তারা দাস দাসী ক্রয় করে মুক্ত করে দেন এবং নিজ নিজ মালিকানাধীন দাস দাসীকেও মুক্ত করেন। এভাবে ইসলামী শরীয়ত প্রাচীন রীতিতে চলে আসা দাসদাসীদের বিষয়টি পর্যায়ক্রমে এবং হিকমতের সাথে সমাধান করে। অবশ্য যখন তাদের মালিকানা স্বীকার করা হয় তখন মালিকানার আবশ্যকীয় অধিকারগুলোও আদায় করা হয়। এমনটি হয়নি যে, মালিকানা স্বীকার করা হয়েছে অথচ সে সংক্রান্ত অধিকার ভূলুণ্ঠিত করা হয়েছে।

১৫৫. দাস দাসীর অর্থ

প্রশ্ন ঃ মেহেরবাণী করে দাস দাসীর অর্থ বুঝিয়ে দিন। বর্তমান যুগে এর প্রয়োগ কিভাবে হবে?

জবাবঃ ইসলামের দৃষ্টিতে দাস দাসী তারাই যাদেরকে যুদ্ধের ময়দান থেকে গ্রেফতার করে আনা হবে এবং তাদের দেশ ফিদিয়া বা যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের মাধ্যমে তাদের ছাড়িয়ে না নেবে। এমতাবস্থায় ইসলামী রাষ্ট্র তাদের কোনো ব্যক্তির মালিকানায় দিয়ে দেবে। এইরূপ দাসীর গর্ভ থেকে তার যেসব সন্তান হবে তারা তার আইনসংগত সন্তান হবে এবং এরা তার ঠিক তেমনি উত্তারাধিকারী হবে, যেমন হয়ে থাকে স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানরা। মালিকের মৃত্যুরপর এই দাসী আইনগতভাবে মুক্ত হয়ে যাবে। কারণ মা সন্তানের গোলাম হতেপারেনা।

বর্তমানকালে এর প্রয়োগ না হবার কারণ হলো, বর্তমানকালে যুদ্ধবন্দী বিনিময় হয়। কিন্তু বর্তমানকালে যুদ্ধবন্দী বিনিময় মূলত সমান সংখ্যক হয়ে থাকে। অর্থাৎ 'যতোজন দেবে ততোজন পাবে' এই নীতিতে হয়ে থাকে। কিন্তু এটা এবিষয়ের কোনো উত্তম ও নির্ভরযোগ্য সমাধান নয়। যেমন ধরুন, এমন একটি ঘটনা সংঘটিত হলো যে, কোনো জাতির যতোজন বন্দী অপর জাতির কাছে আটক পড়েছে, সে সেই জাতিকে পরাস্ত করে নিজ বন্দীদেরকে মুক্ত করে নিল। ফলে বিজয়ী জাতির কাছে পরাজিত জাতির যেসব বন্দী রয়েছে তাদেরকে আর বিনিময় করার কোনো প্রশ্নই উঠেনা। তাছাড়া পরাজিত জাতির পক্ষে তার বন্দীদেরকে ফিদিয়া দিয়ে ছাড়িয়ে নেওয়াও সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় বর্তমানকালের যুদ্ধনীতি অনুযায়ী বন্দীদেরকে চিরজীবনের জন্যে CONCENTRATION CAMP–এ রাখা হয়। চরম অমানবিকভাবে সেখানে

তাদের থেকে বাধ্যতামূলক শ্রম আদায় করা হয়। ইসলামী আইন এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলামী আইন অনুযায়ী এরূপ লোকদের ব্যক্তিদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয় এবং একজনকে একজনের দায়িত্বে ন্যাস্ত করা হয়। বর্তমানকালে রাষ্ট্রীয় CONCENTRATION CAMP–এ যেসব লোকদের নিক্ষেপ করা হয় তাদের থেকে বাধ্যতামূলক শ্রম আদায় করা হয়। সেখানে তাদের জীবন হয় পশুর চাইতে নিকৃষ্টতর এবং এখানে গোটা ব্যাপার এমন হয়ে দাঁড়ায় যেন মানুষকে মানুষ নয় বরঞ্চ মেশিন পরিচালিত করছে। কিন্তু ব্যক্তিকে যদি ব্যক্তির দায়িত্বে ন্যাস্ত করা হয়, তবে একজন মানুষকে পরিচালনার দায়িত্ব আর একজন মানুষের উপরই ন্যাস্ত হয়। এভাবে তাদের একজনের গুণাগুণের প্রভাব আরেক জনের উপর পড়ে থাকে। যেমন বন্দী লোকটি যদি ভালো লোক হয়ে থাকে আর তার মালিকও যদি হন উদার এবং দয়ালু, তবে তিনি অবশ্যি তার কদর করবেন। একারণেই ইতিহাসে দেখতে পাচ্ছেন, একজন লোক গোলাম হয়ে এসেছে বটে, কিন্তু তার মালিক তার কদর করেছেন, তাকে শিক্ষাদীক্ষা প্রদান করেছেন, সরকারী চাকুরীতে নিয়েছেন, কোথাও গভর্নর বানিয়েছেন, কোথাও সেনাপতি বানিয়েছেন, আবার কোথাও নিজের স্থলাভিষিক্ত করেছেন আবার কোথাও জামাই বানিয়েছেন। মূলত, ব্যক্তিকে ব্যক্তির দায়িত্বে ন্যাস্ত করার ফলেই এরূপ হতে পেরেছে। যখন একজন ব্যক্তির ব্যাপার আরেকজন ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত হয়, তখন মানবীয় গুণ বৈশিষ্ট্য উভয়ের মাঝে কাজ করতে শুরু করে। কিন্তু যেখানে হাজারো কয়েদীকে মাত্র কয়েকজন প্রহরীর দায়িত্বে ন্যস্ত করা হয় আর চারিদিকে মিনারের উপর মেশিনগান নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা হয়, যেন কেউ টু শব্দটি পর্যন্ত না করতে পারে। সেখানে আসলে মানুষের সাথে পশুর চাইতে নিকৃষ্ট আচরণ করা হয়। এখন প্রত্যেক ব্যক্তিই ফায়সালা করতে পারে যে, তার নিকট ইসলামের যুদ্ধবন্দী নীতি পছন্দনীয়, নাকি বাধ্যতামূলক শ্রম ক্যাম্প?

১৫৬. মানুষ এবং সুস্থ প্রকৃতি

প্রশ্নঃ সূরা আল মা'য়ারিজের দারসে আপনি اِنَّ الاِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (মানুষ খুবই সংকীর্ণমনা সৃষ্ট হয়েছে) আয়াতটি উল্লেখ করেছেন। মানুষ যদি সংকীর্ণমনা এবং ছোট আত্মারই হয়ে থাকে তবে সে কি করে সুস্থ প্রকৃতির হতে পারে? অনুগ্রহ করে বিষয়টি পরিষ্কার করুন।

জবাবঃ সংকীর্ণতা কমবেশী প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই থাকে। আর এটা মোটামুটি মানুষের সেইসব বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভূক্ত যেগুলো মানুষ জন্মগতভাবে লাভ করে। কিন্তু এইসব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নৈতিক দৃঢ়তা এবং উদারতাও বিদ্যমান রয়েছে। ভালমন্দ উভয়ের প্রতিই ঝোঁক প্রবণতা এসব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এক বিশেষ সাদৃশ্যের সাথে অসংখ্য জিনিসকে একত্র করে প্রত্যেকটি মানুষের প্রকৃতিতে রেখে দিয়েছেন। এখন এখানে মানুষের পরীক্ষা যে, সে তার মধ্যকার এসব গুণ কতোটা বিকশিত করছে আর কোনটিকে কতোটা দাবিয়ে রাখছে? মানুষের মধ্যে প্রতিভা ও উদারতার যে কমতি রয়েছে সে যদি উচ্চমানের এবং অতি উত্তম মানুষও হয় তবুও তার মধ্যে সে কমতি থেকে যাবে। কারণ স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা যতোটা উদার, মানুষ কোনো অবস্থাতেই সে পর্যায়ের কাছাকাছি পৌঁছতে পারেনা। মানুষতো মানুষই। কিন্তু মানুষ যদি স্বীয় প্রশিক্ষণের জন্যে ইসলামী পন্থা অবলম্বন করে এবং নিজের ইচ্ছা শক্তিকে প্রয়োগ করে স্বীয় দূর্বলতাসমূহকে দূর করার এবং উত্তম গুণাবলীকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে ইসলামী প্রশিক্ষণের পদ্ধতির উপর অবিরত আমল করে যায়, তবে তার মধ্যে মন্দ এবং সংকীর্ণ গুণবৈশিষ্ট্যের পরিমাণ কমে যেতে থাকবে। এমন কি সেগুলো প্রায় বিলুপ্ত হবার কাছাকাছি পর্যায় পৌঁছবে।

একথাও ভালভাবে বুঝে নিন যে, মানুষের মধ্যে ঐ ধরণের গুণবৈশিষ্ট্য প্রকাশ হতে পারেনা যা তার প্রকৃতিতেই বর্তমান নেই। মানুষের মধ্যে যে গুণবৈশিষ্ট্যই প্রকাশিত হয় তা মূলত তার প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত থাকে। মানুষের চরিত্রে যা কিছু প্রকাশিত হয় তা মূলত পরিবেশ এবং নিজের চেষ্টা সাধনার ভিত্তিতে তার ভিতরকার কিছু বৈশিষ্ট্যের বিকাশ এবং কিছু বৈশিষ্ট্যের অবদমনের ফলেই হয়ে থাকে। এখন মানুষ তার কোন্ ধরনের বৈশিষ্ট্য বিকশিত করতে চায় আর কোন্ ধরনের বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত হতে চায় সে সিদ্ধান্ত তাকেই নিতে হবে। সে ইচ্ছা করলে নিজের মধ্যকার সংকীর্ণ নিকৃষ্ট গুণাবলীকে বিকশিত করতে পারে আবার ইচ্ছা করলে সুস্থ ও শুভ প্রকৃতির মানুষ হবার জন্যেও চেষ্টা সাধনা করতে পারে। উভয় ধরনের গুণবৈশিষ্ট্যই তার মধ্যে কেবল ততোটা বিকশিত ও প্রষ্ফুটিত হবে, সেগুলোকে বিকশিত ও প্রষ্ফুটিত করার জন্যে সে যতোটা সচেষ্ট হবে।

১৫৭. যালিম এবং অবকাশ

প্রশ্নঃ আপনি বলেছেন, আল্লাহ তাআলা যালিম এবং কাফিরদের অবকাশ দিয়ে থাকেন। কারণ, 'হয়তো' এরফলে তারা যুলুম থেকে বিরত থাকবে এবং কুফর ত্যাগ করে ঈমানের দিকে আসবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যেহেতু আল্লাহ তাআলা অতীত এবং ভবিষ্যতের সমস্ত জ্ঞান রাখেন সে ক্ষেত্রে এখানে 'হয়তো' শব্দ দ্বারা সম্ভাবনার ভিত্তিতে তাদেরকে অবকাশ দানের তাৎপর্য কি?

জবাবঃ আলোচ্য বিষয়ের ব্যাখ্যার জন্যে এখানে 'হয়তো' শব্দটি আমি আমার নিজের পক্ষ থেকে ব্যবহার করিনি। এরূপ স্থানে কুরআন বেশীরভাগই 'লা'আল্লা' শব্দ ব্যবহার করেছে। আমি এর অর্থ প্রকাশ করেছি 'হয়তো' শব্দ দ্বারা। কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন 'যাতে করে'। কিন্তু এটা একটা তাবীল মাত্র। আসল কথা হলো যখন বহু সংখ্যক মানুষ সম্পর্কে তাদের সামনে হিদায়াত পেশ করার কথা আলোচিত হয়, তখন সকল মানুষ না সে হিদায়াত গ্রহণ করে যার জন্যে তাদের অবকাশ দেয়া হয়েছে। আর না সকল মানুষ তা প্রত্যাখ্যান করে। একারণেই এরূপ স্থানে কুরআন মজীদে 'লা'আল্লা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে (হয়তো তারা হিদায়াত কবুল করবে)। কিন্তু যদি বলা হতো যে, আমরা এই হিদায়াতের কিতাব পাঠিয়েছি যাতে করে লোকেরা হিদায়াত হয়ে যায়, অথচ বাস্তবে কিছু লোক তা অস্বীকার করে। তবে এর আরেকটি অর্থ এই দাঁড়াবে যে, আল্লাহ তাআলা যে উদ্দেশ্যে এই কিতাব নাযিল করেছেন সে উদ্দেশ্যের অবসান ঘটেছে। কেননা সকল মানুষতো তা গ্রহণ করেনি। এজন্যে যেখানে বহু সংখ্যক লোকের জন্যে কোনো কথা বলা হয় এবং কিছু লোক তা গ্রহণ করার আর কিছু লোক তা প্রত্যাখ্যান করার হয়, তবে সেসব স্থানে 'লা'আল্লা' শব্দ ব্যবহার করা হয়। আর এর অর্থই আমি করেছি 'হয়তো'।

১৫৮. নামাযে হাত নাড়াচাড়া করা

প্রশ্নঃ কোনো কোনো লোক নামাযে হাত নাড়াচাড়া করে। কেউ কেউ কাপড় ঠিকঠাক করে নেয়। কোনো কোনো সময় তাদের হাত বাঁধা থাকেনা। উভয় হাতেই জামা কাপড় ঠিক করে। এমতাবস্থায় নামায কি ঠিক থাকে?

জবাবঃ আসলে অনেক সময় শরয়ী মাসায়েল বর্ণনা করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করা হয়না। ফলে মানুষের মধ্যে চরম পন্থী দৃষ্টিভংগী সৃষ্টি হয়। কেউ যখন নামাযের মধ্যে একই সময় উভয় হাত মিলিয়ে অবিরাম কিছু সময় কাজ

করে তখন একাজটা নামাযের ত্রুটি সৃষ্টি করে। এতে করে বাহির থেকে যারা তাকে একাজটি করতে দেখে তাদের জন্যে এটা নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে যে, লোকটি কি নামায পড়ছে না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোনো কাজ করছে? দ্বিতীয়তঃ এ থেকে এধারণারও সৃষ্টি হয় যে, লোকটি নামায থেকে অমনোযোগী হয়ে অন্য কোনো কাজ করছে। উভয় কারণেই এমনটি করা ঠিক নয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, প্রকৃত প্রয়োজনেও লোকজন তার হাত পা নাড়াতে পারবে না

এক ধরনের কাজ হচ্ছে, উভয় হাত একত্র করে একটি কাজ করা। আরেক ধরনের কাজ হচ্ছে, উভয় হাতকে নিজ নিজ অবস্থানে রেখেই পৃথক পৃথক কাজ করা। এই দুই ধরনের কাজের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে এবং উভয়ের ক্ষেত্রে একই বিধান প্রয়োগ করা ঠিক নয়। ধরুন কোনো ব্যক্তির যদি দুই দিক থেকে চুলকানি শুরু হয়, তখন সে কি করবে? কিংবা কোনো ব্যক্তির দুই পাশে যদি একই সময় কোনো কিছু কামড়াতে থাকে তখন সে কি করবে? এমনি করে সিজদায় যাবার সময় কোনো ব্যক্তি যদি আরামের সাথে সিজদায় যাবার জন্যে স্বীয় তহবন্দ বা পাজামাকে দুই দিক থেকে কিছুটা উঠিয়ে নেয় তার একাজেও শুধু শুধু অভিযোগ করা ঠিক নয়। এফায়সালা দেয়া উচিত নয় যে তার নামায নষ্ট হয়ে গেছে। অবশ্য এধরনের কাজের মধ্যে এবং উভয় হাত একত্র করে একটি কাজ করার মধ্যে পার্থক্য আছে। সমাজে এরূপ চরম মানসিকতা এবং গোঁড়ামীও দেখা দিয়েছে যে, লোকেরা ছোটখাটো ব্যাপারে নামায নষ্ট হবার এবং বিরাট বিরাট গুনাহ হবার ফায়সালা দিয়ে দেয়। মাসায়েল বলার ক্ষেত্রে এধরনের কঠোরতা থেকে বিরত থাকা উচিত।[১].

১৫৯. জিহাদ কি আত্মরক্ষামূলক হয়ে থাকে না আগ্রাসী

প্রশ্ন ঃ আপনি আপনার জু'মা বক্তৃতাসমূহের (খুতবাত) জিহাদের হাকীকতে বলেছেন, জিহাদ আত্মরক্ষামূলকও হয়ে থাকে আবার আগ্রাসী বা অগ্রযাত্রামূলকও হয়ে থাকে। ব্যাপারটা একটু ভালভাবে বুঝিয়ে বলবেন কি?

জবাবঃ যেখানে আমি একথাগুলো বলেছি, সেখানে একথাগুলোও পরিষ্কার করে বলেছি যে, 'প্রতিরক্ষামূলক' এবং 'আগ্রাসন' প্রভৃতি ধরনের শব্দ জাতি পূজারী ধরনের পরিভাষা। কোনো একটি আদর্শিক মতবাদের জন্যে এরূপ

১. আইন ৫মে ১৯৬৮ইং।

পরিভাষা ব্যবহার করা ঠিকনয়। একটি আদর্শিক মতবাদের জন্যে যে যুদ্ধ করা হয়, তা একই সাথে আত্মরক্ষামূলকও হয়ে থাকে আবার আগ্রাসী বা অগ্রযাত্রামূলকও হয়ে থাকে। আর আগ্রাসী বা অগ্রযাত্রামূলক জিহাদ মূলত এক্ষেত্রে স্বীয় আদর্শ ও মতবাদকে প্রসারিত ও বিজয়ী করার জন্যে চেষ্টা সংগ্রামেরই নাম। আত্মরক্ষামূলক জিহাদের অর্থ হলো এই যে, আমি যদি নিজের আদর্শ ও মতবাদকে প্রসারিত ও বিজয়ী করার জন্যে চেষ্টা না করি তবে অপর কোনো না কোনো মতবাদ আমার উপর বিজয়ী হয়ে থাকবেই। কেননা কোনো সমাজই কোনো মতবাদ বা ধ্যানধারণা থেকে মুক্ত থাকেনা। সমাজে অবশ্যই কোনো না কোনো মতবাদ চালু থাকে। আমাদের মতবাদ যদি চালু না থাকে তবে অবশ্যই আমাদের বিরোধীদের মতবাদ চালু থাকবে। সেক্ষেত্রে আমাদেরকে তার মোকাবিলার জন্যে অবশ্যি চেষ্টা সাধনা করে যেতে হবে।

মনে করুন, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আমার একটি দৃষ্টিভংগি আছে, আবার নাস্তিক্যবাদীদেরও ভিন্ন একটি দৃষ্টিভংগি আছে। আমি যদি আমার দৃষ্টিভংগিকে বিজয়ী করার চেষ্টা সংগ্রাম না করি তবে অবশ্যই সেক্ষেত্রে নাস্তিক্যবাদীদের দৃষ্টিভংগি বিজয়ী হবে। পরিণামে তারা আমার সন্তানদেরকেও নাস্তিক্যবাদী শিক্ষা দেবে। এজন্যে আমি তাদের মতবাদকে হটাবার জন্যে চেষ্টা করতে বাধ্য। এখন এই উভয় দৃষ্টিভংগির মধ্যে যে সংঘাত, তা একদিকে যেমন আত্মরক্ষামূলক, অপর দিকে আগ্রাসী বা অগ্রযাত্রামূলকও বটে। ব্যাপারটা ঠিক এরকম যেমন, আমার পাড়ায় যদি কোনো হিংস্র জন্তু প্রবেশ করে আর আমি যদি তাকে আক্রমণ না করি, তবে অবশ্যই সে আমার সন্তানদের আক্রমণ করবে এবং ছিন্নভিন্ন করে খেয়ে ফেলবে। তাই আমাকে আত্মরক্ষার জন্যেই সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তার উপর আক্রমণ করতে হবে।

১৬০. ইমামের পিছে সূরা ফাতিহা পড়া

প্রশ্নঃ কিছু লোকের ধারাণা, ইমামের পিছে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে, এমন কোনো প্রমাণ নেই। অনুগ্রহপূর্বক বিষয়টির উপর আলোকপাত করুন।

জবাবঃ বিষয়টির উপর আমি খুবই চিন্তাভাবনা করেছি। চিন্তাভাবনা করে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌছেছি যে, ইমামের পিছে যারা সূরা ফাতিহা পড়ে তাদের নামায হয়ে যায়, আবার যারা পড়ে না তাদের নামাযও হয়ে যায়। যারা বলে, ইমামরে পিছে সূরা ফাতিহা পড়লে নামায হয়না কিংবা, না পড়লে নামায

হয়না, তারা খুবই বাড়াবাড়ি করে। ব্যাপারটি ঠিক এরকম যেন, কোনো ব্যক্তি বললো ইমাম আবু হানীফা (র) সারা জীবন নামাযই পড়েননি কিংবা অপর কেউ বললো ইমাম শা'ফেয়ী (র) সারা জীবন নামায পড়েননি।[১] একারণেই যারা ইমামের পিছে সূরা ফাতিহা পড়েন তাদের নামাযও হয়ে যায়, আবার যারা পড়েননা তাদের নামাযও হয়ে যায়। অনর্থক এবিষয়ে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হওয়া ঠিকনয়।

ইমামের পিছে ফাতিহা পড়ার পক্ষে যেসব যুক্তি প্রমাণ রয়েছে কেউ যদি সেগুলোর ব্যাপারে আশ্বস্তি লাভ করেন, তবে তিনি ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ুন। পক্ষান্তরে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা না পড়ার ব্যাপারে যেসব যুক্তি প্রমাণ রয়েছে, কেউ যদি সেগুলোকে যুক্তিসংগত মনে করেন তবে তিনি ইমামের পিছে সূরা ফাতিহা পড়া থেকে বিরত থাকুন। কিন্তু মনে রাখবেন দুই জনে দুই পন্থা অবলম্বনের কারণে ইমাম আবু হানীফা (র) বা ইমাম শাফেয়ী (রঃ) সারা জীবন নামযই পড়েননি এদাবী করার অধিকার কারোর নেই।

প্রশ্নঃ কিছু দিন আগে পিন্ডিতে ইমামের পিছে সূরা ফাতিহা পড়া না পড়ার ব্যাপার নিয়ে বিরাট সংঘাত সংঘর্ষ বেঁধে যায়। অবেশেষে কিছু সংখ্যক স্থানীয় পুলিশ অফিসারের হস্তক্ষেপে ঘটনার মীমাংমা হয়---?

জবাবঃ এটা আলেমদের অধোগতি ও লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছু নয়। তারা নিজেরাই যদি নিজেদের লাঞ্ছনার সামগ্রী সংগ্রহ করে, তবে অন্য লোকদের আর কি করার আছে? তারা হাটে বাজারে বিজ্ঞাপন দিয়ে দীনি মাসায়েল সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। অবশেষে তা থানায় ফায়সালা হয়। এর চাইতে অধোপতন আর কি হতে পারে?

১৬১. এটা ইসলামের ব্যর্থতা নয়

প্রশ্নঃ সাবা দুনিয়ার কোনো অংশে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা চালু আছে কি? সরা পৃথিবীতে বহু ইসলামী আন্দোলন থাকা সত্ত্বেও তাদের ব্যর্থতার কারণ কি?

---

১. ইমাম আবু হানীফা (র) ইমামের পিছে সূরা ফাতিহা না পড়ার মত দিয়েছেন। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র) বলেছেন সূরা ফাতিহা পড়তে হবে-অনুবাদক।

জবাবঃ এর পিছনে বহু কারণ আছে। এই সংক্ষিপ্ত সময়ে তা বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু বর্তমান অবস্থা একথার প্রমাণ নয় যে, বর্তমান যুগে ইসলাম চলতে পারেনা। বর্তমানে যে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত নেই তা ইসলামের কার্যকারিতার ব্যর্থতানয়। বরঞ্চ তার কারণ বর্তমানকালের মুসলমানদের ব্যর্থতা। বর্তমানে মুসলমানদের স্বাধীন দেশগুলোতেই ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এমন সব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যা অনেক অমুসলিম দেশেও নেই।

১৬২. ইমাম ও দাড়ি

প্রশ্নঃ ইমামের জন্যে দাড়ি রাখা কি ফরয?

জবাবঃ সৈনিক ও পুলিশের জন্যে উর্দী পরা যদি শর্ত হয়ে থাকে, তবে ইমামতির জন্যে দাড়ি রাখা জরুরী হবে না কেন? আল্লাহর শরীয়ত একজন মুসলমানের যে আকৃতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, কোনো ব্যক্তি যদি তা মেনে না চলে, তবে তাকে ইমাম বানানো ঠিক নয়। কেবল বাধ্য হলে এমন ব্যক্তির ইমামতিতে নামায আদায় করবেন। যেমন, কোথাও যদি দাড়িবিহীন ব্যক্তির ইমামতিতে জামায়াত আরম্ভ হয়ে গিয়ে থাকে, তবে জামায়াতে শরীক হবেন। কিন্তু ইমাম নিযুক্তির প্রশ্ন এলে এমন ব্যক্তিকে ইমাম নিযুক্ত করা উচিত হবেনা যে শরীয়তের বিধিবিধানের অনুগত নয়।

১৬৩. দাড়ি এবং সামরিক বাহিনীর কমিশন

প্রশ্নঃ কোনো ব্যক্তি দাড়ি রেখে সামরিক বাহিনীর কমিশন অফিসার পদে ইন্টারভিউ দিতে গেলে তার পরাজয় প্রায় নিশ্চিত। এমতাবস্থায় সে কি করবে?

জবাবঃ এব্যাপারে তার নিজেকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, সে কি সামরিক বাহিনীর কমিশন নিতে চায় নাকি দাড়ি রাখতে চায়? ব্যাপার শুধু দাড়ি পর্যন্তই সীমিত নয়। প্রায়শই দেখা যায়, যেসব স্থানে ইন্টাভিউর মাধ্যমে লোক নিয়োগ করা হয়, ইন্টারভিউর সময় ইন্টাভিউ গ্রহণকারীরা এমনসব প্রশ্ন করে, যা থেকে বুঝা যায় তাদের মধ্যে নিভূ নিভূ ঈমানটুকু পর্যন্ত অবশিষ্ট নেই। দাড়ি তো তাদের দৃষ্টিতে কোনো ব্যক্তির বিপদজনক ব্যক্তি হবার প্রকাশ্য নিদর্শন। কিন্তু দাড়ি না থাকলেও তারা এমন প্রশ্ন করে যা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় এরা

দীনের সাথে বিন্দুমাত্র সম্পর্ক রাখে না। যেমন, মদ, পর্দা প্রভৃতি যেসব বিষয়ে শরীয়তের অপরিহার্য বিধান রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে জানতে চায়, এসব বিষয়ে তোমার দৃষ্টিভংগি কি? এর জবাবে তার বিন্দুমাত্র ঈমান আছে বলে তারা অনুভব করতে পারলে তাকে বাদ দিয়ে দেয়া হয়। এসব চাকুরির প্রবেশ পথে এমনসব বাধ্যবাধকতা আরোপ করে রাখা হয়েছে যাতে কোনো প্রকৃত মুসলমান তাতে প্রবেশ করতে না পারে। দাড়ির ব্যাপারে প্রকাশ্যে কোনো বিধিনিষেধ না থাকলেও কার্যত দাড়িধারীদেরকে প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে। তাছাড়া চাকুরি হয়ে যাবার পর যারা দাড়ি রাখে তাদেরকেও বহু সংঘাত এবং জটিলতার মুকাবিলা করতে হয়। কমপক্ষে, দাড়ি রাখার কারণে তাদের পদোন্নতিতে বাধাসৃষ্টি করা হয়। দাড়ির বিরুদ্ধে এসব গোঁড়ামী ঐসব লোকদের ক্ষমতাধীনে হচ্ছে, এক সময় যারা নিজেরাও (দাড়িধারী) শিখদের অধীনে চাকুরি করে এসেছে।

আপনি প্রশ্ন করেছেন, এমতাবস্থায় করণীয় কি? এর জবাবে আমি কেবল এতোটুকুই বলবো, সবর করুন এবং এদুরবস্থার পরিবর্তণের জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করে চেষ্টা করুন। আপনি শরিয়তী বিধান ত্যাগ করুন, এরূপ পরামর্শ আমি আপনাকে দিতে পারি না। আপনি যদি নিজের দাড়ি ত্যাগ করতে চান, তবে তা নিজ দায়িত্বে করবেন। এ দায়িত্বে আমাকে শরীক করতে চেষ্টা করবেন না। এঅবস্থায় আপনি তো চাকুরি পাবেন, কিন্তু আমি যে আল্লাহর নিকট পাকড়াও হয়ে যাবো। এজন্যে কাউকেও আমি এপরামর্শ দিতে পারিনা যে, অমুক বিষয়টা বিবেচনা করে অমুক শরয়ী বিধানটা লংঘন করা যেতে পারে। কেউ যদি লংঘন করতে চায় তবে সে নিজ দায়িত্বে করবে। কিন্তু এ কাজ করার জন্যে তাকে পরামর্শ দেয়া যেতে পারে না।

১৬৪. জামায়াত কর্মীদের দাড়ি

প্রশ্নঃ দেখা যাচ্ছে, কোনো কোনো জামায়াত কর্মীর দাড়ি শরীয়ত সম্মত নয়। তাদের কারো কারো দাড়ি শরীয়ত সম্মত প্রলম্বিত নয়। দাড়ি কতোটা লম্বা হওয়া দরকার, সে বিষয়ে শরীয়তের দৃষ্টিভংগি কি?

জবাবঃ তাদের জন্যে আল্লাহর নিকট দোয়া করুন। মুখে যখন দাড়ি গজিয়েছে তা শরীয়ত সম্মতও হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। দাড়ির পরিমাপ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কথা আমি রাসায়েল ও মাসায়েল ১ম খন্ডে আলোচনা করেছি। তা পড়ে নেবেন। তবে একটা কথা আপনার দৃষ্টিতে থাকা দরকার। তা হলো, যে

শ্রেণীর লোকেরা জামায়াতে এসে দাড়ি রাখছে, সেখানকার লোকেরা সাধারনত দাড়ি রাখে না। স্বপ্নেও তারা দাড়ি রাখার কথা চিন্তা করেনি। অথচ এখানে এসে তারা দাড়ি রেখেছে। সবর করুন। তাদের মন মগজে আরো পরিবর্তন এলে দাড়িও বিকশিত হবে। এখন তো অন্তত দাড়ি কামানোর পরিবর্তে রাখার পর্যায়ে এসেছে। এজন্যে শোকর আদায় করা দরকার যে, এ লোকগুলো দীনের বিধান পরিত্যাগ করার পথ ছেড়ে, দীন মানার পথে এসেছে। এখন তাদের আরো উৎসাহিত করা দরকার। নিরুৎসাহিত করে দূরে ঠেলে দেয়া ঠিক নয়।

১৬৫. দাড়ির দৈর্ঘ্য বিষয়ক বিতর্ক এবং দীনকে বাঁচিয়ে রাখা

প্রশ্নঃ জনাব, দাড়ির ব্যাপারে আমরা দারুণ জটিলতার সম্মুখীন। কেউ কেউ দাড়ি ছোট রাখাকেও সঠিক মনে করেন। অপর পক্ষে কিছু লোক একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের চাইতে ছোট দাড়ি রাখাকে ফিস্‌ক বলে আখ্যায়িত করেন। অনুগ্রহ করে আপনার মতামত জানিয়ে প্রকৃত বিষয়টা অবহিত করবেন।

জবাবঃ আসলে আমাদের দীনদার এবং দুনিয়াদার ব্যক্তিদের মধ্যে পৃথক পৃথক পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যাবার ফলে বিষয়টি কঠোরতার রূপ ধারণ করেছে। আমাদের দীনদার শ্রেণীর লোকেরা সাধারণত এমন পরিমন্ডলের লোকদের সাথে সম্পর্ক রাখেন, যেখানে দাড়ি রাখতে কোনো সমস্যা নেই, বরঞ্চ দাড়ি না রাখাটাই সমস্যা। এখন তারা এরূপ কঠোর বাধ্যবাধকতা ঐ পরিমন্ডলের লোকদের উপরও চাপিয়ে দিতে চান, যেখানের লোকদের দাড়ি রাখা এক প্রকার জিহাদ সমতুল্য। এই পরিমন্ডলে কোনো ব্যক্তির দাড়ি রাখার অর্থ হলো, তিনি নিজের জন্যে অসংখ্য জটিলতা সৃষ্টি করে নিলেন। তার জন্যে বিয়ের দরজা বন্ধ, চাকুরির দুয়ার বন্ধ। এমনকি কখনো কখনো এমন হয়, চাকুরীর জন্যে ইন্টারভিউতে হাজির হলে তার মুখে দাড়ি দেখার সাথে সাথে কর্তৃপক্ষ মন্তব্য করে বসে, একে দিয়ে আমাদের কাজ হবে না। এই দেশে এমন চাকুরি আছে, যেখানে দাড়ি রাখার অপরাধে (!) চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দেয়া হয়। একথার বাস্তবতা অনেকেই দেখেছেন। এখন এই জটিল পরিমন্ডলের লোকদের ব্যাপারেও আপনারা 'উত্তম পরিমাপ' এর দাড়ি রাখার জন্যে জিদ ধরছেন। অথচ এইরূপ কোনো লোকের মুখমন্ডলে দাড়ি গজাতে দেখলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিত এবং তার দাড়ি দীর্ঘ হবার জন্যে দোয়া করা উচিত। কিন্তু তাদের সাথে এর সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করা হচ্ছে। তাদেরকে এই শুভ সংবাদ (!) শুনিয়ে

দেয়া হয়, মিঞা! দাড়ি রাখা সত্ত্বেও তুমি ফাসিক! তাকে যেনো জানিয়ে দেয়া হলো, তুমি দুই দিক থেকেই মারা পড়েছো। দাড়ি রেখে তো দুনিয়া খুইয়েছো আর নির্দিষ্ট পরিমাপের চাইতে ছোট দাড়ি রাখার ফলে পরকালের অশুভ পরিণতিও তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষকে ইসলাহ্ করার এটা কোন্ ধরনের তরীকা? মানুষকে ইসলাহ করার জন্যে আমাদের দীনদার তবকার লোকদের এমন তরীকা অবলম্বন করা উচিত, যা হবে হিকমত মুতাবিক এবং যাদ্বারা সত্যিই মানুষকে ইসলাহ করা সম্ভব হবে। আমি অতীতেও বহুবার বলেছি, এখনো বলছি, দীনের কাজ করার জন্যে চোখ কান খুলে চলা জরুরী। এটা এমন এক যুগ, যখন দীনের শিকড়ই কেটে ফেলা হচ্ছে। এমতাবস্থায় কিছু লোকের নিকট খুঁটিনাটি ধরনের কিছু বিষয় এতোই প্রিয় হয়ে আছে যে, তাদের দৃষ্টি কেবল সেদিকেই নিবদ্ধ হয়ে আছে, আর বাকী সকল বিষয় তা যতোই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন তাদের নিকট উপেক্ষিত হয়ে আছে। নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ (সা) মানব জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়েও পথনির্দেশ দান করেছেন। একইভাবে দাড়ি সম্পর্কেও তিনি বিধান এবং নির্দেশনা দান করেছেন। কিন্তু একটি বিষয়ের প্রতি অবিশ্যই দৃষ্টি রাখতে হবে। তা হলো, রাসূলুল্লাহ (স) এইজন্যে প্রেরিত হননি যে, লোকেরা দাড়ি রাখতো না এবং তিনি লোকদের দড়ি রাখানোর জন্যে এসেছেন। বরঞ্চ তিনি যে মহান উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন তা হলোঃ

(ক) লোকেরা আল্লাহ তাআলার দাসত্ব ও আনুগত্য থেকে বিমুখ হয়ে গিয়েছিল। তিনি আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যের প্রতি তাদের আহ্বান করেন এবং তাদের সকল কর্মকান্ড ও জীবনযাপন পদ্ধতি এক আল্লাহর বিধান কেন্দ্রিক করেদেন।

(খ) মানুষ পরকালের কথা ভুলে গিয়েছিল। তিনি তাদের মধ্যে পরকালীন জবাবদিহির অনুভূতি জাগ্রত করে দেন। তিনি তাদেরকে পরকালীন সাফল্যের পাগল বানিয়ে দেন।

আজ এই দেশে এমন সংকটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যে দীন নিয়ে এসেছিলেন, যে দীনকে প্রাণান্তকর সংগ্রামের মাধ্যমে রক্তঝরা পথ পেরিয়ে প্রতিষ্ঠিত ও বিজয়ী করে গিয়েছিলেন, এখানে সেই দীনের ভিতই উপড়ে ফেলা হচ্ছে। কিন্তু এই ভয়াবহ অবস্থায়ও আমাদের দীনদার তবকার

কিছুসংখ্যক লোকের অবস্থা দেখে বিস্মিত হতে হয়! তারা খুঁটিনাটি বিষয়ের চিন্তায় এতোই নিমগ্ন যে, মূল দীনকে ধ্বংস করার যে ষড়যন্ত্র চলছে তা তাদের চোখেই পড়ে না। আর এমতাবস্থায় তাদের প্রকৃত দায়িত্ব ও কর্তব্য কি তাও ভাববার সময় তাদের নেই। একারণেই আমি বারবার এদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আপনারা সময়ের দাবী উপলব্ধি করুন এবং সে অনুযায়ী প্রকৃত দায়িত্ব পালন করার জন্যে অগ্রসর হোন। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, মূল দীন উপেক্ষিত হবার ফলেই দাড়ির পরিমাপ বিষয়ক এরূপ খুঁটিনাটি বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে।[১]

১৬৬. তাকলীদ এবং ফিকাহর প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্ন কোনো একজন মাত্র ইমামের তাকলীদ করা কি বৈধ? কুরআন এবং হাদীস বর্তমান থাকতে ফিকাহর প্রয়োজন কি? কোনো একজন ইমামের ফিকাহ কেন অনুসরণ করতে হবে?

জবাবঃ মাঝখানের এটি খুবই মজার প্রশ্ন। কুরআন হাদীস বর্তমান থাকতে ফিকাহর কি প্রয়োজন? আসলে বুঝে শুনে কাজ করাকে ফিকাহ বলে। এখন আপনিই চিন্তা করে দেখুন ফিকাহর প্রয়োজন আছে কি না?

কেউ যখন কুরআন হাদীস নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে, এগুলোর উদ্দেশ্য বুঝার চেষ্টা করে এবং সেগুলো থেকে বুঝার চেষ্টা করে যে, আসলে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা) আমাদের কাছ থেকে কি চান এবং সে অনুযায়ী চলার জন্যে আমাদের কি কর্মপন্থা অবলম্বন করা উচিত, তখন একাজটিকেই বলা হয় ফিকাহ। ফিকাহর কি প্রয়োজন? প্রশ্নটি ঠিক ঐ ব্যক্তির প্রশ্নের মতো, যে বলে, কুরআন হাদীস বুঝার এবং সেগুলো নিয়ে চিন্তা গবেষণা করার প্রয়োজন কি? এবার চিন্তা করে দেখুন, পরিভাষাগত দিক থেকে ফিকাহ কোন্ জিনিসকে বলে?

এতে কোনো সন্দেহ নেই, সাধারণ মানুষের পক্ষে কুরআন হাদীসের উপর চিন্তা গবেষণা করে মাসায়ালা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। সব মানুষের এতোটা সময়ও নেই এবং এপর্যায়ের যোগ্যতাও সকলের নেই। আল্লাহর কিছু বান্দা

---

১. সাপ্তাহিক আইন, ১০ অক্টোবর ১৯৬৮

দীনের যথার্থ বুঝ ও ধারণা লাভ করার জন্যে এবং সেই বুঝ ও ধারনাকে বিস্তারিতভাবে গ্রন্থাবদ্ধ করে রেখে যাবার জন্যে জীবন কাটিয়ে দেন। তারা কুরআন, রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস, তাঁর যুগের গোটা পরিবেশ ও অবস্থা, সাহাবায়ে কিরামের আমল, এবং তাবেয়ীনগণের ফতুয়াসমূহকে সংগ্রহ করে, এই সবগুলোকে সামনে রেখে সেগুলোর উপর ব্যাপক চিন্তা গবেষণা করে শরীয়তের বিধান এবং মাসায়েল বের করেন। মূলত এসব বিধান ও মাসায়েলকে উপরোক্ত সবগুলো জিনিসের সার নির্যাস বলা যেতে পারে। তাঁদের এই অতুলনীয় অবদান ও মেহনত অসংখ্য লোকের জন্যে দীন ইসলাম পালন করা সহজ করে দিয়েছে। অজ্ঞতা বশত বর্তমানকালে অনেক লোক তাঁদের এই বিরাট খেদমতকে অভিযোগ ও সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখছে। একথাটাতো সকলের কাছেই পরিষ্কার, যিনি নিজে ইলমের অধিকারী নন এবং সরাসরি কুরআন হাদীস থেকে মাসায়েল অবগত হওয়ার যোগ্যতাও রাখেন না, তাকে বাধ্য হয়েই কারো না কারো উপর নির্ভর করতে হবে। তার দায়িত্ব হলো, যিনি কুরআন হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন, তাঁর থেকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেবেন। স্বয়ং কুরআন বলে, তোমরা যদি না জানো, তবে যারা জানে তাদের কাছ থেকে জেনে নাও। এটা কোনো দোষ বা গুণাহর কাজ নয়। অবশ্য যার মধ্যে আহকাম ও মাসায়েল ইস্তেমবাত করার যোগ্যতা রয়েছে, যিনি কুরআন হাদীসের উপর গবেষণা করতে পারেন, মাসায়েল জানার প্রয়োজনীয় মাধ্যম নিজের কাছে আছে, তার জন্যে সেই রকম তাকলীদ করা ঠিক নয়, যেমনটি করতে হয় সাধারণ লোকদের। এমন লোকের কর্তব্য হলো, কোনো ফিকাহর মাসায়ালা মেনে নেয়ার আগে সেটার দলিল প্রমাণ কতোটা মজবুত এবং কুরআন হাদীসের সাথে কতোটা সামঞ্জস্যশীল প্রথমে সে বিষয়ে অবগত ও আশ্বস্ত হওয়া। দলিল প্রমাণের মাধ্যমে যদি তিনি অনুভব করেন, অমুক মাসায়ালাটির ব্যাপারে অমুক ফিকাহর যুক্তি প্রমাণ দুর্বল, তখনো যদি জেনে বুঝে তিনি সেটির অনুসরণ করেন তবে এটা হবে তার জন্যে একটি ভুল কাজ। আপনি দেখবেন তাকলীদপন্থীগণ প্রত্যেকটি মাসয়ালার তাকলীদের ক্ষেত্রে যুক্তি প্রমাণ পেশ করেন। তারা বলে দেন কিসের ভিত্তিতে অমুক ফিকাহর অমুক মাসায়ালাটি সঠিক। এভাবে তাদের দলিল পেশ করা থেকে এটাই বুঝা যায় যে, তারা অন্ধ মুকাল্লিদ নয়, বরঞ্চ বুঝে শুনে অনুসরণ করেন। সুতরাং কোনো ব্যক্তি আবু হানীফা (র), সানাউল্লাহ (র), বুখারী (র), ইবনে তাইমিয়া (র), মাওঃ ইব্রাহীম শিয়ালকোটী (র) প্রমুখের মধ্যে যারই তাকলীদ করুক না কেন তাতে কোনো অসুবিধা হতে পারেনা। যিনি নিজে ইলম

রাখেননা তার জন্যে কোনো আলেমের কথা শুনা এবং সেই অনুযায়ী আমল করা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না।

১৬৭. দাতা ও দস্তগীর

প্রশ্নঃ কেউ কেউ বলেন, কোনো ব্যক্তিকে দাতা বা দস্তগীর বলা নাযায়েয। কারণ এটি আল্লাহর সিফাত। একইভাবে রহীম, করীম এবং আদেলও তো আল্লাহর সিফাত। কিন্তু আমরা যে বলি নবী করীম (সা) বড় রহীম (দয়ালু) ছিলেন। কিংবা নওশেরাওয়াঁ বড় আদেল (ন্যায় পরায়ন) ছিলেন। এগুলো কি নাযায়েয এবং শিরকী কাজ?

জবাবঃ যে অর্থে রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) 'রহীম' বলা হয়। আল্লাহ তাআলাকে সেই অর্থে রহীম বলা হয়না। কেউ যখন কাউকে দাতা বা দস্তগীর বলে, তখন সে কোন্ মনোবৃত্তি নিয়ে বলে তার কাছে থেকে তা জেনে নিন এবং তার ভিত্তিতে কোনো মত প্রতিষ্ঠা করুন। শুধুমাত্র দাতা বা দস্তগীর শব্দের ভিত্তিতে রায় প্রতিষ্ঠা করা ঠিক নয়। কেউ যদি এমন দৃষ্টিভংগিতে মানুষের জন্যে এশব্দটি ব্যবহার করে যাতে শিরকের আশংকা থাকে। তখন তাকে এমনটি বলতে নিষেধ করুন। কিন্তু তার দৃষ্টিভংগিতে যদি শিরকের কোনো গন্ধই না থাকে, তবে শুধু শুধু তার সাথে বিবাদে লিপ্ত হবার দরকার নেই। এধরনের শব্দ ব্যবহারের সময় অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। কিন্তু এগুলো নিয়ে তর্ক বহছের তুফান উঠানো যাবে না। কিছু লোক এমন আছে যারা সবসময় ছিদ্র অন্বেষণ করে বেড়ায়। তর্ক বহছে লিপ্ত হবার ছুতো খুঁজে বেড়ায়।

১৬৮. সিনেমা এবং ব্যাংকের চাকরি

প্রশ্নঃ সিনেমা এবং ব্যাংকের চাকরি কি বৈধ?

জবাবঃ সিনেমা এবং শারাবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সিনেমা অশ্লীলতার আড্ডা খানা। কি ভাবে এর চাকরি বৈধ হতে পারে? প্রশ্নের ঢং দেখে মনে হয় মদ্যপান বৈধ কি না সামনের দিকে লোকেরা সেই প্রশ্নও করবে।

ব্যাংকের চাকরিও সিনেমার চাকরির মতোই। কারণ তা সূদের ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। আর সূদ এমন একটা অপরাধ যার চাইতে বড় অপরাধ কেবল শিরক এবং মানুষ হত্যা।[১]

১৬৯. আবজাদ হরফসমূহের তাবীয

প্রশ্নঃ আবজাদ হরফসমূহের হিসাবের ভিত্তিতে 'আসমাউল হুসনা' এবং কুরআন পাকের অন্যান্য শব্দাবলীর সংখ্যা বের করে যে তাবীয লেখা হয় তার শরয়ী মর্যাদা কি? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং সাহাবায়ে কিরোমের যামানায় এরূপ তাবীয লেখার প্রচলন ছিলো কি?

জবাবঃ আল্লাহর অনুগ্রহে রাসূলুল্লাহর (সাঃ) যামানায় মুসলমানগণ জ্ঞানও লাভ করেছিলেন এবং বিবেক বুদ্ধিও লাভ করেছিলেন। তাই সে যামানায় কারো মনমস্তিষ্কে এধরনের চিন্তা কল্পনা প্রবেশ করতেই পারেনি। এধরনের সংখ্যা বের করার উদাহরণ হচ্ছে তাই, যেমন, আপনি খাবার খেতে বসে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলার পরিবর্তে '৭৮৬' বলে খাবার খেতে শুরু করলেন। একইভাবে নামায পড়তে দাঁড়ালেন এবং নামাযে যা কিছু পড়া হয়, সেগুলো না পড়ে সেগুলোর সংখ্যা পড়ে নিলেন। রাসূল (সাঃ) এবং সাহাবা কিরামের যুগের মুসলমানদের নিকট জ্ঞান এবং বুদ্ধি বিবেচনা থাকার ফলে এ ধরনের নিরর্থক কাজ তাঁরা করেননি। বর্তমানকালে মানুষ সব কিছুর সার নির্যাস বের করে নিচ্ছে। ইবাদত বন্দেগীর সাথেও সেই আচরণ করতে চাচ্ছে।

১৭০. একটি জটিলতা

প্রশ্নঃ কিছু লোক 'গায়রে মসনূন' দরূদ পড়ে থাকে। যেমনঃ
الصلوة السلام عليك يارسول الله এর পক্ষে তারা নামাযে পঠিত এই সালামকে দলিল হিসেবে পেশ করেঃ السلام عليك ايها النبي এ সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

---

১. এ প্রশ্নের জবাব যখন দেয়া হয়, তখন ইসলামের নীতিমালার ভিত্তিতে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকে চাকুরীর ব্যাপারে এমন্তব্য প্রযোজ্য হবে না। –অনুবাদক

জবাবঃ কিছু লোক 'ইয়া রাসূলুল্লাহ' বলার সময় এই দৃষ্টিভংগী পোষণ করে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সরাসরি তার সম্বোধন শুনছেন। এটা একটা ভ্রান্ত আকীদা ইসলামী আকীদা নয়। নামাযে যখন 'আসসালামু আলাইকা আইউহান্নাবীউ' পড়া হয়, তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সরাসরি তা শুনছেন, একথা ধরে নেয়া হয় না। এতে মূলত মানুষ তার মনমস্তিষ্কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে যে ধ্যান ও কল্পনা রয়েছে তাকেই সম্বোধন করে, সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা) কে সম্বোধন করে না। এর উদাহরণ হচ্ছে ঠিক তাই, যেমন, কোনো নারীর ছেলে মরে যাবার পর তিনি "বাবা তুই কোথায় গেলি" বলে চীৎকার করেন।

এখানে মহিলা মূলত তার মনে ছেলের যে ধ্যান, চিন্তা ও কল্পনা রয়েছে সেটাকেই সম্বোধন করেন, সরাসরি ছেলে তাঁর কথা শুনছে এটা তিনি মনে করেননা। এটা মূলত মানুষের ভাষা ও সাহিত্যের একটা স্টাইল যে, মানুষ কখানো কখনো তার কল্পিত বস্তুকে সম্বোধন করে। যেমন কোনো রাজনৈতিক নেতা সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে কোনো রাষ্ট্র প্রধানকে সম্বোধন করে বলেন, "তুমি এটা করছো, তুমি ওটা করছো," অথচ সেই রাষ্ট্র প্রধান সেই সভায় উপস্থিত নেই। তাহলে এরূপ বলার তাৎপর্য কি? আসলে মানুষের মনে যখন কোনো বিশেষ ব্যক্তির চিন্তা বা কল্পনা উদয় হয় সেটাকেই সে সম্বোধন করে থাকে। এটা একটা সাহিত্যিক সৌন্দর্য। এরূপ সম্বোধনের মর্ম না বুঝার ফলে ভুল বশত অনেকেই এর আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করে। যারা ভাষার এই স্টাইল বুঝতে সক্ষম হননি তারা নিজেদের মনের জটিলতা দূর করার জন্যে 'আসসালামু আলাইকা আইউহান্নাবীউ'র পরিবর্তে 'আত্তাহিয়াতু' পড়ার সময় 'আসসালামু আলালন্নাবীই' পড়তে শুরু করেছেন। কিন্তু এমনটি করাটা ভুল। কেননা 'আসসালামু আলাইকা আইউহান্নাবীউ' শব্দগুলো স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) তেমনিভাবে লোকদেরকে শিখিয়েছেন, যেভাবে তিনি লোকদেরকে কুরআন হেফয করিয়েছেন। এ কারণে এগুলোতে রদবদল করা বৈধ নয়। ঐ লোকগুলো যুক্তি পেশ করে যে, রাসূলের (সাঃ) জীবিত কালে 'আসসালামু আলাইকা আইউহান্নাবীই' বলা সঠিক ছিলো। কিন্তু তার মৃত্যুরপর আসসালামু আলান্নাবীই' বলা উচিত। কিন্তু প্রশ্ন হলো, নবী করীমের (সঃ) যুগে 'আত্তাহিয়াতু' কি স্বশব্দে পড়া হতো নাকি নিশব্দে? নিসন্দেহে, তখনো এটা চুপে চুপেই পড়া হতো, শব্দ করে পড়া হতো না। তাছাড়া প্রত্যেক লোকই মসজিদে নববীতে নবীর (সাঃ) ইমামতিতে নামায পড়তেন না। অসংখ্য লোক মদীনার বাইরে নামায পড়তেন।

তারা 'আসসালামু আলালন্নাবীই' পড়তেন বলে কোনো প্রমাণ আছে কি? সুতরাং এভাবে শব্দ পরিবর্তন করা ঠিক নয়। আর যেহেতু নবী করীমের (সাঃ) শিখানো পদ্ধতিতে পড়ার মধ্যে কোনো দোষ নেই, সেহেতু তাতে পরিবর্তন সাধনের জরুরত কোথায়?

১৭১. খানায়ে খোদা

প্রশ্নঃ আজকাল বিভিন্ন শহরে 'খানায়ে খোদা' নামে একটি ফিল্ম দেখানো হচ্ছে। এতে ইসলামের সকল পবিত্র স্থান দেখানো হচ্ছে। এব্যাপারে শরয়ী হুকুম কি? এটা দেখলে কি সওয়াব হবে? কিংবা অন্তত দেখাটা বৈধ হবে কি?

জবাবঃ এর অবস্থা ঠিক সে রকম যেমন কোনো নর্তকীর ঘরে মিলাদ শরীফ হচ্ছে। এখন কেউ যদি এটাকে পবিত্র মজলিশ মনে করে সেখানে যেতে চান তবে যেতে পারেন। কিন্তু তার ধরণ হচ্ছে তা যেমনটি বললাম।

১৭২. মুশরিক কে?

প্রশ্নঃ কোনো একস্থানে যদি জু'মার নামায পড়া হয় এবং সেখানকার ইমাম যদি মুশরিক হয় তবে এমতাবস্থায় কি সেখানে পৃথক জু'মা পড়া যাবে?

জবাবঃ মুশরিক শব্দের ব্যবহার আমাদের দেশে যতোটা সহজ হয়ে গিয়েছে, আসলে তা ততোটা সহজ নয়। লোকেরা বাড়াবাড়ি করে কাউকে মুশরিক, কাউকে খারেজী, কাউকেও মুতাযিলি, কাউকে আবার অন্য কিছু বলছে। এগুলো সবই বাড়াবাড়ি। মুশরিক হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে আকীদাগতভাবে শিরক গ্রহণ করেছে এবং তাওহীদ অস্বীকার করেছে। এখানে যাদেরকে মুশরিক বলা হচ্ছে এই অর্থে তারা মুশরিক নয়। শিরকমূলক ধ্যানধারণায় নিমজ্জিত হওয়া আর মুশরিক হয়ে যাওয়া এক জিনিসি নয়।

এখন কথা হলো, আপনার ধারণা মতে যদি আপনি দেখেন, কোনো ব্যক্তি শিরকমূলক ধ্যান ধারণায় নিমজ্জিত হয়েছে, তবে তার পিছে নামায পড়ার জন্যে আপনাকে কেউ বাধ্য করে দেয়নি। আপনি সন্তুষ্ট না হতে পারলে তার পিছে নামায না পড়বেন। কিন্তু হৈ হাঙ্গামা করে প্রচার প্রোপাগন্ডা করে বেড়াবার কি প্রয়োজন আছে যে, অমুকের পিছে নামায হয় না। অনর্থক একটি ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টি করা ছাড়া এর দ্বারা আর কি লাভ হতে পারে?

১৭৩. নবীরা কি গায়েব জানেন?

প্রশ্নঃ কুরআনে তো আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমি নবীদেরকে ইলমে গায়েব প্রদান করি। এথেকে কি নবীরা গায়েব জানেন বলে প্রমাণিত হয়না? তবে এধারণার বিরোধীতা করা হয় কেন?

জবাবঃ কুরআন মজীদে যে অর্থে রাসূলদেরকে গায়েবের জ্ঞান প্রদান করা হয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে 'তাতো প্রমাণিত। আমাদের দেশের কিছু লোক যে অর্থে নবীরা গায়েব জানেন বলে দাবী করছে 'তা কখনো প্রমাণিত নয়। সূরায়ে জ্বিনের দারস প্রদানকালে আমরা এবিষয়ে আলোচনা করেছি। এক বিশেষ ধরনের ইলমে গায়েব নবীদেরকে প্রদান করা হয়, যা রিসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্যে জরুরী। এজ্ঞান সাধারণ মানুষ লাভ করেনা। শুধুমাত্র রাসূলদেরকেই তা দেয়া হয়। যেমন, আল্লাহ তা'আলার কি কি গুণাবলী রয়েছে, সে জ্ঞান সাধারণ মানুষ লাভ করে না। সাধারণ মানুষ চেষ্টা করেও এবিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে পারবেনা। তারা শুধু অনুমান করতে পারবে। আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়ায় যা কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তার সৃষ্টি জগতে যেসব নিদর্শন বর্তমান রয়েছে সেগুলো দেখে একজন মানুষ অনুমান করতে পারে যে, এই যদি হয় তার কর্ম ও সৃষ্টি তবে এরূপ শিল্পী এবং স্রষ্টার মধ্যে এই এই গুণাবলী থাকা উচিত। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এটা একটা অনুমান মাত্র। এর ভিত্তিতে কেউ এটা বলতে পারবেনা যে, তার অনুমানটাই বাস্তব এবং প্রকৃত সত্য। খুববেশী হলে সে এতোটা বলতে পারে যে, এরূপ হওয়া উচিত। একারণেই আল্লাহ তা'আলার সিফাত এবং সত্তা সম্পর্কে মানুষের মধ্যে অসংখ্য মত পার্থক্য চলে আসছে। কেননা প্রত্যেকের ধারণা অনুমান অপর জনের ধারণা অনুমানের থেকে ভিন্নতর হয়েছে এবং প্রকৃত জ্ঞান কারোর কাছেই ছিলো না।

এর জ্ঞান রাসূলদের ছাড়া আর কাউকে দেয়া হয়নি। রাসূলদেরকে এজ্ঞান এজন্যে দেয়া হয়েছে যে, তারা যেভাবে বলবেন মানুষ প্রকৃত সত্যসমূহের উপর ঠিক সেভাবেই ঈমান বিল গায়েব আনবে। প্রত্যক্ষ জ্ঞান কেবল রাসূলরাই লাভ করেন। অপর পক্ষে সাধারণ মানুষের নিকট ঈমান বিল গায়েব দাবী করা হয়। সাধারণ মানুষ যদি রাসূলগণের মতোই প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করতো, তবে তাদের জন্যে ঈমান বিল গায়েবের প্রশ্নই উঠতো না। তাছাড়া মানুষ রাসূলদের প্রতি ঈমান বিল গায়েব আনলো কি আনলোনা সেই পরীক্ষার সম্মুখীনও তাদের হতে

হতোনা। সুতরাং প্রমাণ হলো, রাসূলদেরকে ইলমে গায়েব প্রদান করা হয় এবং নবী ছাড়া সাধারণ মানুষকে গায়েবে ঈমান আনতে হয়। ফেরেশতা, পরজগত এবং গায়েবের সেই সব নিগূঢ় সত্যসমূহের ব্যাপারেও একই কথা, যেগুলোর প্রতি ঈমান আনা মানুষের মুক্তির জন্যে এবং সঠিক পথে চলার জন্যে অপরিহার্য। এসব কিছুর জ্ঞান কেবল নবীগণকেই প্রদান করা হয়।

বাকী থাকলো সেই ইলমের কথা, যা কেবল খোদায়ীত্বের জন্যে প্রয়োজন। সে সব ইল্ম নবীগণকে প্রদান করার কী প্রয়োজন থাকতে পারে? কুরআন মজীদের কোন্ স্থানে লেখা হয়েছে যে, খোদা তাআলার খোদায়ী সম্পর্কিত ইল্ম মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে কিংবা অপর কোনো নবীকে অথবা কোনো সৃষ্টিকে কখনো প্রদান করা হয়েছে? উপরোক্ত দু'টি জিনিসের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য করতে হবে। আহলি কিতাবের লোকেরা তাদের নবীদের সম্পর্কে যেসব ভ্রান্তি এবং বাড়াবাড়ি করেছে যেমন ঈসা (আঃ)কে খোদার পুত্র, এমনকি খোদা পর্যন্ত বানিয়ে ছেড়েছে, সেসব ভ্রান্তি এবং বাড়াবাড়ি থেকে মুহাম্মদ (সাঃ) এর উম্মতকে রক্ষা করতে হবে। কোনা ব্যক্তি যদি রাসূলের ইলমে গায়েব জানাকে পুরোপুরি অস্বীকার করে তবে তার এচিন্তা ভ্রান্ত, এতে তার ঈমান সন্দেহযুক্ত হয়ে যায়। অপর পক্ষে কেউ যদি মনে করে রাসূল খোদা তাআলার খোদায়ী সংক্রান্ত জ্ঞানেরও অধিকারী তবে সেও পথভ্রষ্ট।

১৭৪. ঈমান বিল গায়েব

প্রশ্নঃ আপনি বলেছেন, রাসূল প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করেন এবং রাসূল ছাড়া অন্যসব লোককে গায়েবের প্রতি ঈমান আনতে হয়। গায়েবে ঈমান আনার যে দাবী তার ভিত্তিতে সাধারণ মানুষ এবং রাসূলের মধ্যে কী পার্থক্য? ব্যাপারটা আরেকটু স্পষ্ট করে বলুন।

জবাবঃ ঈমান বিল গায়েবের দিক থেকে সাধারণ মানুষ এবং রাসূলদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, সাধারণ মানুষকে আল্লাহ তাআলা সেই জ্ঞান প্রদান করেন না, যা প্রদান করেন রাসূলগণকে। একারণেই সাধারণ মানুষকে রাসূলের প্রতি ঈমান আনতে, রাসূল যে জ্ঞান তাদেরকে শিক্ষা দেন তা মেনে নিতে এবং অনুসরণ করতে বলা হয়। সাধারণ মানুষের জন্যে হচ্ছে, ঈমান বিল গায়েব এবং রাসূলগণের জন্যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান (ইল্ম বিশ্ শাহাদাত)।

১৭৫. ঈমান ও অবিচলতা

প্রশ্নঃ অনুগ্রহকরে ঈমান ও ইয়াকীনের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা ও অবিচলতার কার্যকরী পন্থা বলে দিন।

জবাবঃ এর একটিই মাত্র পন্থা রয়েছে। তা হলো, বুঝে বুঝে কুরআন অধ্যয়ন করুন। কুরআনের শিক্ষা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করুন, কুরআন যে শিক্ষা প্রদান করেছে সে অনুযায়ী নিজের ধ্যানধারণাকে ঢেলে সাজান এবং পূর্ণাংগ জীবনকে সে অনুযায়ী পরিগঠিত করার চেষ্টা করুন। ঈমান এবং ইয়াকীনের ক্ষেত্রে অটলতা ও অবিচলতা অর্জন করার এছাড়া আর অন্য কোনো মাধ্যম নেই। মানুষের হিদায়াতের জন্যেই কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। এই কুরআনকে নিয়ে চিন্তা গবেষণা করলে, তা বুঝেশুনে অধ্যয়ন করলে এবং নিজের জ্ঞানভান্ডারকে তার অনুগত করে দিলেই মানুষের ঈমান ও ইয়াকীন লাভ হয়। নিজের জ্ঞানকে কুরআনের অনুগত করে দেয়ার অর্থ হলো এই যে, আপনার মনমগজে যেসব ধ্যানধারণা বদ্ধমূল রয়েছে, আপনি যেসব চিন্তা কল্পনা ও দর্শন পোষণ করেন, এই সবকিছু থেকে নিজের মনমানসিকতাকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে কুরআন অধ্যয়ন করুন এবং কুরআন যে জ্ঞান আপনাকে প্রদান করে সেটাকেই আপনার প্রকৃত জ্ঞান হিসেবে গ্রহণ করুন। কোনো ব্যক্তি স্বীয় মনমগজে যেসব ধ্যানধারণা পোষণ করে, সেগুলোকে স্বস্থানে বদ্ধমূল রেখেই যদি কুরআন পড়তে শুরু করে এবং কুরআনকে সেগুলোর ভিত্তিতে ঢেলে সাজাতে থাকে, তবে এর অর্থ হলো, সে কুরআন শিখতে চেষ্টা করছেনা, বরঞ্চ কুরআনকে প্রশিক্ষণ দেয়ার চেষ্টা করছে। এজন্যে এধরনের কোনো ব্যক্তি কুরআন থেকে ঈমান লাভ করতে পারে না, বরঞ্চ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব লোক গুমরাহীই গ্রহণ করে থাকে। তারা কুরআনের আয়াতের বাঁকাচোরা অর্থ গ্রহণ করে এবং পূর্ব থেকে মনমগজে যেসব ধারণা বদ্ধমূল করে রেখেছে কুরআনের আয়াত থেকে তারা সেগুলোর সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করতে থাকে। এতে করে অধিকাংশ সময়ই এরা কুরআন থেকে হেদায়াত লাভের পরিবর্তে গুমরাহীই লাভ করে।[১]

---

১. সাপ্তাহিক আইন ৩০ জুন ১৯৬৮।

১৭৬. শ্রমিক এবং সাহিত্য

প্রশ্নঃ আপনি শ্রমিকদের পড়ানোর মতো কোনো সাহিত্য রচনা করেছেন কি?

জবাবঃ আমি মানুষকে তাদের পেশার ভিত্তিতে সম্বোধন করিনি, বরঞ্চ দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে সেই পদ্ধতিই অবম্বন করেছি যা ইসলাম আমাদের শিক্ষা দেয়। গোটা মানব জাতির কল্যাণ ইসলামের উদ্দেশ্য। এ জন্যে ইসলাম মানুষকে মানুষ হিসেবে সম্বোধন করে, পৃথক পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত করে সম্বোধন করে না।

১৭৭. সহশিক্ষা

প্রশ্নঃ সহশিক্ষার ব্যাপারে জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য কি?

জবাবঃ সহশিক্ষার ব্যাপারে আমাদের চিন্তাধারা কি আপনার জানা নেই?

প্রশ্নঃ হ্যাঁ জানা আছে বটে। তবে আমি চাচ্ছি, এখানে যারা উপস্থিত আছেন তাদের সম্মুখে এসম্পর্কে আপনার মতামত এসে যাক।

জবাবঃ আমরা সহশিক্ষাকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত পদ্ধতি বলে মনে করি। পাশ্চাত্য জগত আজ যে নৈতিক অধপতন ও সামাজিক বিশৃংখলায় নিমজ্জিত হয়েছে এবং তাদের বংশীয় কাঠামো যেভাবে ধ্বংস হয়েছে তার পেছনে অন্যান্য কারণ ছাড়াও সহশিক্ষার কুফল বিরাট ভূমিকা পালন করেছে।

১৭৮. নামাযের পরের দোয়া

প্রশ্নঃ মওলানা! ফরয নামায এবং পুরো নামায শেষ করার পর দোয়া করা কি জরুরী? আরবদেশে দেখা যায়, নামাযের পর দোয়া করা হয়না। এব্যাপারে সঠিক তথ্য কোন্‌টি?

জবাবঃ ফরয নামায কিংবা পুরো নামায শেষ করার পর দোয়া করতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। অবশ্য কেউ দোয়া করতে চাইলে দোয়া করতে পারেন। দোয়া করার সময় শুধু নামাযের পরই নয়, বরঞ্চ দিনরাতের যে কোনো সময়ই দোয়া করা যেতে পারে। সফর অবস্থায়, মুকীম অবস্থায়, ঘরে, ঘরের বাইরে, চলাফেলা করার সময়, উঠাবসা করার সময়, মোটকথা, সকল স্থানে সকল সময় দোয়া প্রার্থনা করা যেতে পারে। কেবল নামাযের পরেই দোয়া

করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। যেহেতু দোয়া নামাযের কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত নয়, সেজন্যে অধিকাংশ আরব নামাযের পর দোয়া না করেই উঠে যায়

১৭৯. দশ রাকা'য়াত তারাবী

প্রশ্নঃ দশ রাকা'য়াত তারাবী এবং এক রাকা'য়াত বিতরের নামায কি শরীয়ত সম্মত? সৌদি আরবে রমযান মাসে অধিকাংশই এভাবে পড়ে থাকে।

জবাবঃ যারা দশ রাকা'য়াত তারাবী এবং এক রাকায়াত বিতরের নামায পড়েন, তারা হাদীসে উল্লেখিত এগারো রাকায়াতের দশ রাকা'য়াতকে তারাবী এবং এক রাকা'য়াতকে বিতর বলে ব্যাখ্যা করেন। যারা আট রাকা'য়াত তারাবী পড়েন তারা এগারো রাকা'য়াতের ব্যাখ্যায় আট রাকা'য়াতকে তারাবী এবং তিন রাকা'য়াতকে বিতর বলে মনে করেন। একারণেই অধিকাংশ আরবদেশে তারাবী নামায আট অথবা দশ রাকা'য়াত পড়া হয়ে থাকে। অবশ্য কিছু লোক বিশ রাকা'য়াত এবং কিছু লোক ছত্রিশ রাকা'য়াতও পড়ে থাকেন। বিশ এবং ছত্রিশ রাকা'য়াতও সাহাবায়ে কিরাম থেকে প্রমাণিত।

১৮০. মুসলমান হত্যা এবং ঋণ

প্রশ্নঃ মওলানা! এক ব্যক্তি কোনো খাঁটি মুসলমানকে হত্যা করে ফেললো কিংবা কারো কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করলো এবং ঋণ পরিশোধ করা ছাড়াই মৃত্যুবরণ করলো। এমতাবস্থায় ইচ্ছাকৃত মুসলিম হত্যা কিংবা এই ঋণ আল্লাহর দরবারে মাফ হবে কি? ইচ্ছাকৃত হত্যাকারী যদি দুনিয়াতেই তওবা করে নেয় এবং গোটা জীবনকে পরিপূর্ণভাবে সংশোধন করে নেয় তবুও কি সে আল্লাহর দরবারে পাকড়াও যোগ্য অপরাধী থাকবে?

জবাবঃ কেউ যদি জেনে বুঝে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুসলমানকে হত্যা করে, তবে তার নেক আমলও তাকে ক্ষমার যোগ্য বানাতে পারবেনা। ঋণের ব্যাপারটাও একই রকম। যতোক্ষণ পর্যন্ত ঋণ গ্রহীতার ঋণ পরিশোধ করা হলোনা কিংবা ঋণ দাতা ঋণ মাফ করে দিলোনা, ততোক্ষণ পর্যন্ত এই ঋণের বোঝা মৃত ব্যক্তির ঘাড়ে চেপে থাকবে। ইচ্ছাকৃত হত্যা এবং এরূপ ঘাড়ে চেপে থাকা ঋণের পরিবর্তে পরকালে মৃত ব্যক্তির নেকীসমূহ নিহত মুসলমান ব্যক্তির এবং ঋণ দাতার হাতে ন্যাস্ত করা থাকবে।

কিয়ামতের দিন ঐ মুসলমান ব্যক্তি বড়ই হতভাগা এবং দরিদ্র হবে, যার নেকীসমূহ বান্দার হক পরিশোধ করার জন্যে বন্টন করে দেয়া হবে এবং তার নিজের ভান্ডার হবে শূন্য। ইসলামী জগতের কল্যাণে যতো বড় অবদানই কেউ রেখে যাক না কেন তা দ্বারা ইচ্ছাকৃত মুমিন হত্যার অপরাধ ক্ষমা করিয়ে নেয়া যাবেনা।

১৮১. সুদখোর এবং ঘুষখোরের ঘরে খানা খাওয়া

প্রশ্নঃ সুদখোর এবং ঘুষখোরের ঘরে খানা খাওয়া যেতে পারে কি?

জবাবঃ যারা ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন তারা এই ধরনের লোকদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে বাধ্য। তারা যদি এদের সাথে মেলামেশা না করেন, তবে কেমন করে তাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌছুবেন? ইসলাম থেকে বিচ্যুত হওয়া লোকদের জন্যেই তো ইসলামের দাওয়াত। আপনারা যদি এসব বিপথগামী লোকদের নিকট যাওয়া থেকে বিরত থাকেন, তবে তাদের নিকট দীনের দাওয়াত কিভাবে পৌছানো যাবে? সাক্ষাতের সময় কোনো সুদখোর বা ঘুষখোর যদি আপনার সামনে চা হাজির করে, তবে আপনি তা গ্রহণ করতে কিভাবে অস্বীকার করবেন? সাধারণ অবস্থায় এইসব লোকদের খাবার গ্রহণ করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকা উচিত। কিন্তু যতোদিন আপনি তাকে দীনের পথে আনার প্রচেষ্টায় নিরত থাকবেন ততোদিন এধরনের অবস্থার সৃষ্টি হলে তার ওখানে পানাহার করতে অস্বীকার করা উচিত নয়।[১]

১৮২. নামাযে একাগ্রতা

প্রশ্নঃ মওলানা! কিভাবে একাগ্রতা লাভ করা যায়? নামায এবং পড়া লেখা করার সময় আমি মনোযোগী এবং একাগ্রচিত্ত হতে পারিনা। এজিনিস কিভাবে লাভ করা যাবে?

জবাবঃ এ উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্যে নিজের ইচ্ছা শক্তিকে কাজে লাগান। বার বার ব্যর্থ হবার পরও বার বার চেষ্টা চালিয়ে যান। সাহস হারাবেন না, নিরাশ হবেন না এবং প্রচেষ্টাও পরিত্যাগ করবেন না। নামায পড়ার সময় এই

১. এশিয়া লাহোর ১৯ ডিসেম্বর ১৯৭৬।

কথাটার প্রতি মনোযোগী হবেন যে, আপনি আপনার মহান স্রষ্টার সামনে দাঁড়িয়েছেন এবং তাঁর সাথেই কথাবার্তা বলছেন। একইভাবে পড়া লেখা করার সময় এক সাথে বিভিন্ন বিষয়েরও বিভিন্ন প্রকারের পড়া লেখা একত্রে করবেন না। SYSTEMATIC অধ্যায়ন করুন। নিজের জীবনের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে অধ্যয়ন করুন। ইনশাল্লাহ একাগ্রতার মহান নিয়ামত আপনি লাভ করবেন।

১৮৩. মনের প্রশান্তি

প্রশ্নঃ আমি অনেক বই পুস্তক পড়াশুনা করেছি, কিন্তু মনের প্রশান্তি লাভ করতে পারছিনা?

জবাবঃ মনের প্রশান্তি লাভ করার জন্যে কুরআন মজীদের চাইতে উত্তম কোনো বই নেই। কোনো ব্যক্তি যদি কুরআন মজীদ অধ্যয়ন করে এবং বুঝে বুঝে কুরআন পড়ে তাহলে মনের প্রশান্তির মত মহান সম্পদ সে লাভ করতে পারে। কিন্তু সে যদি কুরআন অধ্যয়ন করার পরও এই মহান সম্পদ থেকে বঞ্চিত থাকে তবে এই জিনিস লাভের জন্যে দ্বিতীয় কোনো গ্রন্থের নাম আমি জানিনা।

১৮৪. হযরত ইয়াকুব (আঃ) এবং ইউসুফ (আঃ)

প্রশ্নঃ মাওলানা! ইয়াকুব (আঃ) যে তাঁর পুত্র ইউসুফের (আঃ) মহব্বতে এতোটা নিমজ্জিত হয়েছিলেন তা কি তাঁর নবুয়্যতের মর্যাদার সাথে অসামঞ্জস্যশীল ছিলোনা?

জবাবঃ এই মহব্বতের কারণ এটা ছিল যে, হযরত ইয়াকুবের (আঃ) ধারণা ছিল পরবর্তীতে হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর উত্তরাধিকার এবং নবুয়তের কাজ আঞ্জাম দেয়ার যোগ্যতা লাভ করবে। একজন নেক পিতার নেক সন্তানের প্রতি অধিক মহব্বতই হয়ে থাকে। বিশেষ করে যখন তিনি দেখতে পান অপরাপর সন্তানরা এইসব সৎগুণাবলী অর্জন করেনি। ইউসুফের (আঃ) প্রতি ইয়াকুবের (আঃ) যে মহব্বত ছিলো, প্রকৃতপক্ষে সেটা তাঁর মিশনকে মহব্বত করারই প্রমাণ। এখানে পিতা কর্তৃক পুত্রের প্রতি মহব্বতের চাইতে পিতা যে নিজ দায়িত্ব কর্তব্যকে অধিকতর মহব্বত করতেন তাই প্রকাশ পেয়েছে। [১]

---

১. আইন ৩০ এপ্রিল ১৯৭৫।

১৮৫. নামাযের কাতার

প্রশ্নঃ নামাযের কাতারে পায়ের আঙ্গুলের সাথে আঙ্গুল মিলানো কি জরুরী?

জবাবঃ হাদীসে একথার উল্লেখ নেই। অবশ্য কাঁধের সাথে কাঁধ এবং টাকনুর সাথে টাকনু মিলানোর কথা অবশ্যই হাদীসে আলোচিত হয়েছে। মিলানোর অর্থ এই নয় যে, স্পর্শও করাতে হবে। বরঞ্চ এর অর্থ হলো, কাছাকাছি করা, যাতে করে নামাযের কাতার সোজা হয়ে যায়। আঙ্গুল মিলানোর ভিত্তিতে কাতার সোজা করার চেষ্টা করা হলে তাতে কাতার সোজা হবে না। কারণ, সকলের পা সমান নয়। কারো পা লম্বা, কারো পা খাটো আবার কেউ বয়স্ক, কেউ বালক। সুতরাং এসব ধরনের লোকদের আঙ্গুল মিলানোর ভিত্তিতে কেমন করে কাতার সোজা হবে? কাতার সোজা করার সেই পদ্ধতিই সঠিক যেটা হাদীসে বলা হয়েছে।

১৮৬. তাকলীদের সীমা

প্রশ্নঃ মাওলানা। তাকলীদের সীমা কতটুকু?

জবাবঃ যারা আলিম নন। কুরআন সুন্নাহ সম্পর্কে সরাসরি জ্ঞান রাখেননা, এমন লোকদের জন্যেই তাকলীদ। ওলামায়ে কিরাম, যারা কুরআন সুন্নাহ্ সম্পর্কে অধ্যয়ন করে নিজেরাই তাহাকীক করতে সক্ষম, তাকলীদ তাদের জন্যে নয়। যে সব লোক আরবী ভাষার জ্ঞান রাখেননা এবং সরাসরি কুরআন সুন্নাহর অধ্যয়ন ও উপলব্ধি করতে সক্ষম নন, তাদের জন্যে নিরাপদ পথ হলো এই যে, তারা কোনো বিশ্বস্ত আলিমের তাকলীদ করবেন। নিজেদের অপূর্ণাংগ ইল্‌মের ভিত্তিতে নিজেরাই কোনো মসলক অবলম্বন করা তাদের জন্যে বৈধ নয়।

১৮৭. মুসলমানদের ঐক্যের জন্যেই জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা

প্রশ্ন ঃ অধিকাংশ মাসয়ালার ক্ষেত্রে আমি দেখতে পাচ্ছি, বিভিন্ন দৃষ্টিভংগির মধ্যে আপনি সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেন। এর ফলে বিভিন্ন দীনি মহলের চিন্তাভাবনায় যে সংকীর্ণতা প্রকাশ পায় তা খতম হয়ে যায়?

জবাবঃ কিতাব ও সুন্নায় যে উদারতা ও প্রশস্ততা রয়েছে তাকে সংকীর্ণ করার কি কারণ থাকতে পারে? যেসব দীনি ব্যাপারে বিভিন্ন দৃষ্টিভংগি পোষণ করা বৈধ সেখানে কেবলমাত্র একটি দৃষ্টিভংগিকে সঠিক মনে করার যুক্তি নেই। একইভাবে অনেক আলিম কেবল একটি দৃষ্টিভংগিই পেশ করে থাকেন। আবার অনেকে দীনের অংশ বিশেষের তাবলীগ এবং প্রচার করে থাকেন। অথচ ইসলাম পূর্ণাংগ দীন এবং এই দীন সংকীর্ণ নয়, উদার। একারণেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, জামায়াতে ইসলামী কোনো মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে পক্ষ অবলম্বন করেনা। বরঞ্চ সকলের ঐক্যই জামায়াতের কাম্য।

১৮৮. সাহাবায়ে কিরামের (রাঃ) সমালোচনা

প্রশ্নঃ মওলানা! আপনার কোনো কোনো লেখায় সাহাবায়ে কিরামের সমালোচনা পাওয়া যায়। এমনটি হলো কেন?

জবাবঃ ইসলামের পূর্ণাংগ আদর্শ ও মূলনীতিকে স্পষ্ট ও পরিষ্কার করে তোলার জন্যেই আমার সমস্ত প্রচেষ্টা নিয়োজিত। ইসলামের ইতিহাসে যদি এর বিপরীত কোনো উদাহরণ পাওয়া যায়, তবে সেটাকে বৈধ করার জন্যে ইসলামের আদর্শ ও মূলনীতিকে কাটছাট ও সংকুচিত করা যেতে পারে না। কিছু লোক কোনো কোনো ভ্রান্ত উদাহরণকে নেকী ও সওয়াবের কাজ মনে করে গ্রহণ করেছে। যা কোনো অবস্থাতেই বৈধ হতে পারে না। সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) মানুষ ছিলেন। কোনো বিষয়ে তাঁদের কারো যদি অসতর্কতা কিংবা ইজতেহাদী ত্রুটি হয়ে গিয়ে থাকে, তবে সেটাকে অনুসরণযোগ্য উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করা ঠিক নয়। কারো সমালোচনা কিংবা ত্রুটি বর্ণনা করা কখনো আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বরঞ্চ ইসলামের শাশ্বত সেরা আদর্শকে সুস্পষ্ট করাই আমাদেরউদ্দেশ্য।

সাহাবায়ে কিরামের (রাঃ) মধ্যেও কোনো কোনো বিষয়ে মতপার্থক্য হতো। কিন্তু কোনো ভুলকে তাঁরা কখনো উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করেননি। বরঞ্চ তাঁরা দৃঢ়তার সাথে ভুলকে চিহ্নিত করেছেন। ইজতেহাদী ভুলকে সঠিক কাজ বলার ফলে ইসলামের আদর্শ যদি কালিমাযুক্ত হয়ে পড়ে তবে তাতে লাভ হবে কার? ইসলামের আদর্শ ও নীতিমালার হেফাযতই আমাদের কাজ। একাজ যদি আমরা না করি তবে মানুষের মনমগজে ইসলামের ভ্রান্ত চিত্র অংকিত হয়ে যাবে।

মুসলমানদেরকে ইসলামের সুদৃঢ় আদর্শ ও নীতিমালার অনুসারী বানাবার চেষ্টা করাই আমাদের কাজ। ইজতেহাদী ভ্রান্তির অনুসারী বানাবার চেষ্টা করা উচিত নয়।[১]

১৮৯. ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা

প্রশ্নঃ মওলানা! আপনার গ্রন্থাবলী পড়ে আমি বুঝতে পারলাম, ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি আপনি অধিক জোর দিচ্ছেন। এর কারণ কি?

জবাবঃ আমি এই জন্যেই ইসলামী শিক্ষার প্রতি অধিক জোর দিচ্ছি, যেহেতু আমি মনে করি জাতির শিশু কিশোর ও যুবকরা যতোদিন ইসলামী শিক্ষা ও নৈতিক চরিত্রে পরিগঠিত না হবে, ততোদিন পর্যন্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। কেননা ভবিষ্যতের রাষ্ট্র ব্যবস্থাতো আজকের শিশু কিশোরদেরই চালাতে হবে। আজকে যারা ক্ষমতায় আছে তারাতো চিরদিন বেঁচে থাকবেনা। একদিন তাদেরকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতেই হবে। অতপর আজকের নওযোয়ানদেরকেই দেশের বাগডোর হাতে নিতে হবে।

১৯০. দলাদলি ও জামায়াতের সাহিত্য

প্রশ্নঃ মাওলানা! আপনি আপনার গ্রন্থাবলীতে ফেরকাবাজী ও দলাদলির তীব্র বিরোধীতা করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর প্রতিরোধ কল্পে মুসলমানদের কি পন্থা অবলম্বন করা উচিত?

জবাবঃ প্রশ্নটি করে মূলত আপনি একটি ব্যাথাতুর শিরায় হাত রাখলেন। আমরা যখন কোনো বিষয়ের অন্ধকার দিক চিহ্ন করি তখন তার আলোকিত দিকও চিহ্নিত করা উচিত। আমি আমার গ্রন্থাবলীতে বিভিন্নভাবে এবিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, সম্ভবত তা আপনার নযরে পড়েনি। (কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর মাওলানা পুনরায় বললেন) প্রত্যেক নবীই দীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে বলেছেন, আল্লাহ এবং তাঁর নবীর প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের দীন একটিই। আর তা হচ্ছে ইসলাম। শেষ নবী (সাঃ) বলেছেন, ইসলামের প্রতি যেই ঈমান আনুক না কেন, সেই মুসলিম। একইভাবে সেই লোক সমষ্টির নাম মুসলিম

---

১. এশিয়া লাহোর ৩০ অক্টোবর ১৯৭৭।

উম্মাহ যারা আলাহর প্রতি ঈমান এনেছে। দীনি মাসায়েলের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য হওয়া স্বাভাবিক। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যেও মতপার্থক্য হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে রায়গত পার্থক্য ছিল এবং ব্যাখ্যাগত পার্থক্যও ছিল। কিন্তু এসব পার্থক্য ছিল প্রাসংগিক বিষয়ে এবং প্রক্রিয়াগত। মৌলিক বিষয়ে নয়। কোনো কোনো বিধানের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরামের বিভিন্ন রকম আমল পাওয়া যায়। সব রকমের আমলই প্রমাণিত। এই কর্ম পদ্ধতিগত এখতেলাফ থাকা সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে ফেরকাবাজী এবং দলাদলি ছিলোনা। তাঁরা একত্রে নামায পড়তেন। মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এক মসজিদেই নামায পড়তেন। তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করা হতো, আপনাদের মাযহাব কি? তখন মত ও আমলের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাঁরা একই জবাব দিতেন। বলতেন, আমাদের মাযহাব ইসলাম। আমাদের দীন ইসলাম। আমাদের মসলক ইসলাম। আমাদের ফেরকা (দল) হচ্ছে মুসলমানের ফেরকা। আমরা সবাই মুসলমান। আমাদের সকলের নেতা ও ইমাম মুহাম্মদ (সাঃ)।

মাওলানা কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। অতপর বললেন, আমরা তাঁরই তাকলীদ করি। ইসলামের সকল আলিম এবং খাদেমগণ আমাদের নিকট সম্মানযোগ্য। আমরা তাদের সমানভাবে সম্মান করি। সকলের যুক্তিসংগত কথাই আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য। অমুক ইমামকে মানি আর অমুক ইমামকে মানিনা, এটা আমাদের কাজ নয়। আমরা ইসলামের সেই মহান খাদেমগণের প্রত্যেককেই সম্মান করি এবং প্রত্যেককেই আমাদের ইমাম মনে করি এবং প্রত্যেকের কাছে থেকেই একই দৃষ্টিভংগিতে ফায়দা হাসিল করতে চাই। তাদের মধ্যে মর্যাদাগত পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। এমনটি নবীগণের মধ্যেও ছিল।[১]

১৯১. পাকিস্তানে কেন ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়নি?

প্রশ্নঃ আচ্ছা মাওলানা! পাকিস্তান তো ইসলামের নামে অর্জিত হয়েছে। কিন্তু এতো বছর পরেও কেন পাকিস্তানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়নি?

জবাবঃ ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা আল্লাহর এক মহা অনুগ্রহ। সে জাতিই এ মহান অনুগ্রহ লাভ করতে পারে, যারা এর তীব্র আকাংখা পোষণ করে। যে যেটা চায়না, সে কি করে সেটা লাভ করতে পারে? কোনো দেশের

---

১. এশিয়া লাহোর ১০ জানুয়ারী ১৯৭৮।

জনগণ তীব্রভাবে আল্লাহর আইনের শাসন চাইলে তারা কিছুতেই ইসলামী হুকুমাত থেকে বঞ্চিত হতে পারেনা। কিন্তু জনগণ যখন চায় চরিত্রহীন, অসৎ, গুন্ডাবদমায়েশ লোকেরা তাদের শাসক হোক, সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হোক, তাদের কর্মকান্ডের বিচার বিশ্লেষণ না হোক, তারা যা ইচ্ছা তাই করার স্বাধীনতা লাভ করুক, তখন আল্লাহ তা'আলা কেমন করে আমাদের থলের মধ্যে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ঢুকিয়ে দেবেন?

১৯২. ইসলামী আন্দোলন করে লাভ কি?

প্রশ্নঃ বাহ্য দৃষ্টিতে যখন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা দেখা যায়না, তবে আর ইসলামী আন্দোলন করে লাভ কি?

জবাবঃ মুসলমানের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, সে দায়িত্ব পালন করে যাওয়াটাই তার জন্যে সফলতা। ইসলামকে বিজয়ী করে দিতে হবে এটা তার দায়িত্ব নয়। তার দায়িত্ব হলো এজন্যে আপ্রাণ চেষ্টা সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। আপ্রাণ চেষ্টা সংগ্রাম চালিয়ে যাবার পর ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না হলেও তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অবশ্যি লাভ করবে। আর এটাইতো প্রকৃত বিজয় ও সাফল্য। প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও যদি আপনার হাতে ইসলাম বিজয়ী না হয়, তবে এর জন্যে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে না। বিজয়ের কোনো সম্ভাবনা দেখা যায়না বলে ঘরে বসে পড়া সম্পূর্ণ কাপুরুষতা এবং ঈমানের দাবীর খেলাফ।

যেকোনো মূল্যে ইসলামকে বিজয়ী করতে হবে, এমন দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা স্বয়ং রাসূলুল্লাহর (সাঃ) প্রতিও অর্পণ করেননি। বরঞ্চ বার বার তাঁকে বলেছেন, রিসালাতের দায়িত্ব পালন করাটাই আপনার দায়িত্ব। বলা হয়েছে 'বাল্লিগ' তুমি পৌছে দাও। তারা যদি না মানে, তবে তাতে তোমার কোনো দোষ নেই। 'ওয়ামা আলাইকা আন্‌লা ইয়াযযাক্‌কা'–তরা পরিশুদ্ধ না হলে, তাতে তোমার কোনো দায়দায়িত্ব নেই।

১৯৩. ইসলামী রাষ্ট্র এবং ফিল্ম, টিভি ও গানবাদ্য

প্রশ্নঃ এদেশে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে ফিল্ম, রেডিও, টেলিভিশন এবং গানবাদ্যের ভবিষ্যত কি হবে?

জবাবঃ ইসলামী শরীয়ার ভিত্তিতে এগুলোর ভবিষ্যত নির্ধারিত হবে। সমাজের বুকে কোনো অন্যায় যদি পাহাড়ের মতোও শিকড় গেড়ে থাকে, তবু আমরা তার সম্মুখে মাথা নত করবার লোক নই। যদি তাই হতো তবে জামায়াতে ইসলামী সংগঠিত করার প্রয়োজন ছিলোনা।

জামায়াতের হাতে দেশ শাসনের দায়িত্ব এলে সে শরীয়াহ সমর্থিত ফিল্ম চালু রাখবে। রেডিও টেলিভিশনকে জনগণের সংশোধন ও প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য কল্যাণকর কাজে ব্যবহার করবে। এগুলো হচ্ছে সেই সব প্রভাবশালী গণমাধ্যম, যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর বান্দাদের অসংখ্য কল্যাণ সাধিত হতে পারে। মানুষের কল্যাণের জন্যেই আল্লাহ তাআলা এগুলো দান করেছেন। ইনশাল্লাহ আমরা আল্লাহ প্রদত্ত এইসব নিয়ামতকে অবশ্যি ব্যবহার করবো। আমরা পৃথিবীকে দেখাতে চাই, রেডিও দ্বারা যেমন পরিবেশকে নোংরা করা যেতে পারে, তেমনি আবার পবিত্র করার কাজও করা যেতে পারে। টেলিভিশনের মাধ্যমে যেভাবে সমাজে বিরাট বিপর্যয় ছড়ানো হচ্ছে, তেমনি তা মানুষের ধ্যানধারণা ও ইবাদাতের সংশোধন এবং শিক্ষাদীক্ষা প্রসারের কাজেও ব্যবহার করা যেতে পারে। বাদ্যের ব্যাপারে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, বাদ্যযন্ত্র ভাংগার জন্যে, আমাকে পাঠানো হয়েছে।

১৯৪. ইসলাম এবং গান

প্রশ্নঃ ইসলাম কি এমন গান বা সংগীত পরিবেশনের অনুমতি দেয়, যাতে কোনো অশ্লীলতা নেই?

জবাবঃ গানে যদি অশ্লীল কথা এবং আকীদা বিশ্বাস বিনষ্টকারী কোনো বিষয় না থাকে আর বাদ্যযন্ত্র বাজানো না হয়, তবে ইসলামে সেরকম নির্দোষ গানের নিষেধাজ্ঞা নেই। বাদ্যযন্ত্র এবং ক্ষতিকর বিষয়বস্তু সম্বলিত গানের অনুমতি ইসলামে নেই।

১৯৫. বিজয়ের পর বিরোধীদের সাথে আচরণ

প্রশ্নঃ ক্ষমতায় আসার পর বিরোধীদের সাথে জামায়াত কি ধরনের আচরণ করবে?

জবাবঃ সেই আচরণ করবে, যা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কা বিজয়ের পর তাঁর নিকৃষ্টতম দুশমনদের সাথে করেছিলেন। যে রাসূল পাক (সাঃ) একথা বলে কাফির ও মুশরিকদের ছেড়ে দিয়েছিলেন যে, لَاتَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ (আজ আর তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই)। অথচ এরাই রাসূলকে (সাঃ) বছরের পর বছর ধরে নিদারূন দুঃখ কষ্ট দিয়েছিলো। দীর্ঘদিন থেকে এরা ছিলো তাঁর রক্ত পিপাসু। বলুন দেখি, সেই রাসূলের অনুসারীরা তাঁর মহান নীতি ত্যাগ করে অন্য কোনো কর্মনীতি কেমন করে অনুসরণ করতে পারে?

আমরা যদি প্রতিশোধ গ্রহণকারীই হতাম, তবে এখন যারা আমাদেরকে গালি দেয়, তাদের গালির জবাবে তাদেরকে অন্তত গালিও দিতাম। কখনো আমরা এরূপ আচরণ করেছি বলে কেউ বলতে পারবে কি? দীর্ঘদিন থেকে লোকেরা আমাকে গালি দিচ্ছে, অথচ আমি আমার কাজ করে যাচ্ছি।

১৯৬. জামায়াতে ইসলামীর মেনিফ্যাস্টো

প্রশ্নঃ একটি পত্রিকায় রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে, জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতায় এলে, ধনী গরীবের পার্থক্য মুছে ফেলবে এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতনের তফাৎ মুছে দেবে। ব্যাপারটা স্পষ্ট করে বলুন।

জবাবঃ ক্ষমতায় এলে জামায়াতে ইসলামী কি কি কাজ করবে তা সে স্পষ্ট করে তার মেনিফ্যাস্টোতে বলে দিয়েছে। মেনিফ্যাস্টো ছাপা হয়ে প্রকাশ হয়েছে। যে কেউ তা পড়ে দেখতে পারেন। কোনো দলকে বুঝা ও জানার জন্যে যেখানে তার মেনিফ্যাস্টো বর্তমান রয়েছে, সেখানে আপনি সংবাদপত্রের রিপোর্টের উপর কেন নির্ভর করবেন। জামায়াতের মেনিফেস্টোর বিভিন্ন অংশ পৃথক পৃথকভাবেও প্রকাশ করা হয়েছে। আমাদের অর্থনৈতিক কর্মসূচীর মধ্যে আমরা লিখেছি, আমাদের দেশের বেতন কাঠামোতে এক এবং একশ'র পার্থক্য রয়েছে। আপনি শুনে আরো বিস্মিত হবেন যে, কমিউনিস্ট রাশিয়ার বেতন কাঠামোতে এক এবং একশ' পাঁচের পার্থক্য বর্তমান। আমরা চাচ্ছি এই পার্থক্যকে প্রথমত, এক এবং বিশের মধ্যে নামিয়ে আনা হবে এবং ধীরে ধীরে এপার্থক্য এক এবং দশের মধ্যে থাকতে দেয়া হবে। ধনী গরীবের পার্থক্য মিটিয়ে দেয়ার ব্যাপারে কথা হলো, যতোটা ধনী এবং গরীব থাকাটা আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল সেটাকে কখনো মিটিয়ে দেয়া যতে পারেনা এবং সেটাকে মিটিয়ে দেয়ার দাবীও

আমরা করিনি। আমরা চাচ্ছি, দরিদ্রকে ধনী থেকে ততোটা অংশ আদায় করে দেয়া হবে যদ্বারা সে মৌলিক প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম হবে। আর ধনী কেবলমাত্র বৈধ উপায়েই ধনী হতে পারবে। অবৈধ উপায়ে ধনী হবার সকল পথ বন্ধ করে দেয়া হবে। আমাদের মেনিফ্যাস্টোতে আমরা এই সিদ্ধান্তও ঘোষণা করেছি, যারা অবৈধ উপায়ে ধনী হয়েছে তাদের সম্পদের হিসাব নেয়া হবে এবং অবৈধ পথে উপার্জিত অর্থসম্পদ তাদের থেকে আদায় করে নেয়া হবে।

১৯৭. ভ্রাতৃত্বের নামে ভোট দাবী

প্রশ্নঃ ভ্রাতৃত্বের নামে ভোট দাবী ইসলামে কেমন? প্রার্থী ভালো হোক কিংবা মন্দ হোক ভ্রাতৃত্বের নামে ভোট দাবী করা যাবে কি?

জবাবঃ ইসলামের দৃষ্টিতে ভ্রাতৃত্বের নামে ভোট দেয়া বা নেয়া যদি বৈধই হতো তবে রাসূলুল্লাহর (সাঃ) যুগে যারা ইসলামের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল তারা তো তাঁরই আত্মীয় স্বজন ছিলো। তিনি ভ্রাতৃত্বের নামে তাদের কাছে সাহায্যের আবেদন করতে পারতেন। কিন্তু তাদের সমর্থন নেয়া তো দূরের কথা, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পর্যন্ত তিনি কুণ্ঠিত হননি। জামায়াতে ইসলামীকে যারা ভোট দেবেন তাদের দেখা উচিত, তারা যাদেরকে ভোট দিচ্ছেন, তারা ইসলামের আদর্শের অনুসারী কিনা? ভোটে জিতার পর তারা আল্লাহর দীনের খেদমত করবে, না কি স্বীয় স্বার্থের খেদমত করবে? তাদের বাহ্যিক জীবনধারা কি তাদের দাবীসমূহ সত্য হওয়ার সাক্ষ্য দিচ্ছে? যে ব্যক্তি এসবদিক থেকে উপযুক্ত মনে হবে ভোটদাতাদের উচিত তার পক্ষে ভোট প্রদান করা। আর যে ব্যক্তি এসব দিক থেকে যোগ্য হবেনা সে ভোটারের সহদোর হোকনা কেন, ইসলাম তার পক্ষে ভোট প্রদানের অনুমতি ভোটারকে দেয়না। ইসলাম প্রার্থির বন্ধুতা ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে কোনো ফায়সালা করেনা, বরঞ্চ ফায়সালা করে হক ও বাতিলের ভিত্তিতে।

১৯৮. জামায়াতে ইসলামী এবং যুগের দাবী

প্রশ্নঃ কিছু লোকের ধারণা জামায়াতে ইসলামীর কর্মীরা আধুনিক যুগের জটিল রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনা করার উপযুক্ত নয়। জামায়াতে ইসলামীর

প্রতিনিধিদের মধ্যে আধুনিক যুগের দাবী বুঝতে পারে এমন লোক আছে কি?

জবাবঃ জাতীয় পরিষদ এবং দেশের উভয় অংশের প্রাদেশিক পরিষদে জামায়াতে ইসলামী যাদেরকে নমিনেশান দিয়েছে মেহেরবাণী করে তাদের তালিকাটা একবার দেখে নিন। তাদের মধ্যে আইনজীবি রয়েছেন। সকল বিষয়ের গ্রাজুয়েট এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট রয়েছেন। তাছাড়া রয়েছেন ওলামায়ে কেরাম। অন্যান্য পার্টিতে হয়তো শুধু দীনি শিক্ষিত লোক রয়েছে কিংবা শুধুমাত্র আধুনিক শিক্ষিত লোক রয়েছে। কিন্তু জামায়াতে ইসলামী এমন একটি দল যেখানে দীনি শিক্ষিত এবং আধুনিক শিক্ষিতদের বিপুল সমাবেশ ঘটেছে। প্রথম দিন থেকেই আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, দীনি শিক্ষিত এবং আধুনিক শিক্ষিতদের একসাথে মিলিয়েই এই সংগঠন পরিচালিত করবো। জামায়াতে ইসলামীই প্রথম দল, যে দলে ওলামা এবং আধুনিক শিক্ষিত উভয় ধরনের লোক সমানভাবে পলিসি তৈরীতে অংশগ্রহণ করে। এর আগে আলেমরা যেসব দলে শরীক হয়েছিলো, সেসব দলের পলিসি তৈরীতে তাদের কোনো হাত ছিলোনা। একদল আলিম কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন কিন্তু কংগ্রেসের নির্বাহী কমিটিতে তাদের একজনকেও নেয়া হয়নি। কংগ্রেসের পলিসি তৈরীতেও তাদের কোনো হাত ছিলোনা। আরেক দল আলিম মুসলিমলীগে যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু কেউই মুসলিমলীগের নির্বাহী কমিটিতে ছিলেননা এবং সে দলের পলিসি তৈরীতেও তাদের কোনো অংশ ছিলোনা। কিন্তু জামায়াতে ইসলামীর নির্বাহী কমিটি উভয় ধরনের লোক দ্বারাই গঠিত। এখানকার পলিসি তৈরীতে উভয় ধরনের লোকই শামিল রয়েছেন। সুতরাং আমরা এদাবী করতে পারি, জামায়াতে ইসলামীই একমাত্র দল, যে দল একটি সর্বাধুনিক রাষ্ট্রকে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে পরিচালনা করার যোগ্যতা রাখে।

কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর মাওলানা মুচকী হেসে বললেন, যেদেশে ড্রাইভার পর্যন্ত মন্ত্রী হচ্ছে সেখানে আপনি জামায়াতের প্রতিনিধিদের যোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন করছেন? ঘটনা হলো এই যে, জামায়াতের প্রতিনিধিরা দেশের নামজাদা রাজনৈতিক নেতাদের চাইতে শিক্ষা দীক্ষা এবং জ্ঞান গরিমার দিক থেকে কোনো অংশেই কম নয়।

১৯৯. ইসলামী রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের অবস্থা

প্রশ্নঃ ইসলামী রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুরা কতটুকু নিরাপত্তা লাভ করবে? ভারতের শুদ্রদের যে অবস্থা পাকিস্তানে ইসলামী রাষ্ট্র হলে, এখানকার খৃষ্টানদেরও কি সে অবস্থা হবে?

জবাবঃ এদেশের বয়স কয়েক দশক হয়েছে। কেউ বলতে পারবে কি এখানে খৃষ্টান এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদের সাথে ঠিক সে আচরণ করা হয়েছে, যেমনটি করা হচ্ছে ভারতে? এখানে যদিও মুসলমানদের সরকার রয়েছে, কিন্তু সত্যিকার অর্থে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত নেই। তারপরও সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে ভারতের তুলনায় এখানকার অবস্থা এতোটা সুন্দর। এবার দেখুন আমাদের বিকৃত মুসলমানদের মনও ভারতের বড় বড় নেতাদের তুলনায় কতোটা উদার। আর সত্যিকার অর্থে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে সংখ্যালঘুদের সাথে যে উন্নত উদার আচরণ করা হবে, তার দৃষ্টান্ত বর্তমান বিশ্বে নেই।

মুসলমানরা স্পেনে আটশ' বছর শাসন করেছে। এদীর্ঘ সময়কালের মধ্যে মুসলমানদের পক্ষ থেকে তাদের উপর গণহত্যাও চালানো হয়নি আর কোনো প্রকার বিধিনিষেধও আরোপ করা হয়নি। সেখানে মুসলমানরা তাদের প্রতি এতোটা উদারতা দেখিয়েছে যে, খৃষ্টান পাদ্রীরা মুসলমান আলেমদের নিকট ইঞ্জিল পড়তে আসতো। খৃষ্টান নাগরিকরা পরস্পরের নিকট আরবী ভাষায় চিঠিপত্র লিখতে ভালবাসতো। কিন্তু সেখানে খৃষ্টানরা পুনরায় যখন ক্ষমতা দখল করে, তখন মুসলমানদের উপর এমন জঘন্য গণহত্যা পরিচালনা করে যে, এক সময় সেখানে একজন মুসলমানও আর অবশিষ্ট রাখেনি। জেনারেল ফ্রাঙ্কো ক্ষমতায় আসার আগে কোনো অস্পেনী মুসলমানের সেখানে এক বছরের অধিক অবস্থানের অনুমতি ছিলোনা।

২০০. ব্যাংকের চাকুরী

প্রশ্নঃ মাওলানা! বর্তমান সুদী ব্যাংকে চাকুরী করা কি বৈধ?

জবাবঃমওলানা মৃদু হেঁসে জবাব দিলেন, মদের কারখানায় চাকরি করাটা কেমন?

২০১. ব্যাংকিং শিক্ষা

প্রশ্নঃ মাওলানা! ব্যাংকের চাকুরি করা যখন বৈধ নয়, তখন ব্যাংকিং সম্পর্কে শিক্ষালাভ করা কি বৈধ?

জবাবঃ ব্যাংকিং সম্পর্কে অবশ্যই শিক্ষালাভ করবেন। কেননা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর যখন ইসলামী পদ্ধতিতে ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হবে তখন এই লোকদের প্রয়োজন হবে। শুধুমাত্র বর্তমান সূদী ব্যাংক ব্যবস্থার একটি অংগ হবার উদ্দেশ্যে এশিক্ষা লাভ করা ঠিক নয়।

২০২. ওকালতি পেশা

প্রশ্নঃ ওকালতী পেশা সম্পর্কে আপনার মত কি?

জবাবঃ এপেশায় যদি সত্যতা ও সততার আদের্শের প্রতি কঠোরভাবে দৃষ্টিরাখা হয়, মিথ্যা মোকদ্দমা গ্রহণ করা না হয় এবং সরল সঠিক পন্থা অবলম্বন করা হয়, তবে উপার্জনের অন্য কোনো পন্থা পাওয়া না গেলে এ পেশা অবলম্বন করাতে কোনো দোষ হবে না।

২০৩. ক্রোধান্বিত হয়ে স্ত্রী তালাক দেয়া

প্রশ্নঃ মাওলানা! কেউ যদি অধিক ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, তবে এর ফায়সালা কি?

জবাবঃ অধিক খুশীর বশবর্তী হয়ে কেউ তালাক দেয় নাকি? এই ব্যক্তি যদি আগামীকাল ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কাউকে হত্যা করে আর বলে হত্যা হয়নি। কারণ হত্যার কাজ সে ক্রোধের বশবর্তী হয়ে করেছিলো। তবে কি আপনি তার এবক্তব্য মেনে নেবেন? সুতরাং ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তালাক দিলেও তালাক হয়ে যায়।

২০৪. মুনাফার ব্যাখ্যা

প্রশ্নঃ মুনাফার সঠিক ব্যাখ্যা কি হওয়া উচিত?

জবাবঃ যে কোনো জিনিসের প্রচলিত ও সর্বজন স্বীকৃত ব্যাখ্যাই সঠিক ব্যাখ্যা। কিন্তু প্রচলিত ও সর্বজন স্বীকৃত ব্যাখ্যা কি, তা আপনার জানা থাকতে

হবে। সর্বশ্রেণীর জিনিসের জন্যে একই ধরনের ব্যাখ্যা প্রয়োগ করা ঠিক নয়। কেননা, যে মাল বাজারে বেশী চলে সেটার মুনাফা কম এবং যে মাল কম চলে সেটার মুনাফা বেশী হয়ে থাকে। সুতরাং সবধরনের জিনিসের ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রচলিত ও স্বীকৃত ব্যাখ্যা জেনে নেয়া উচিত।[১]

২০৫. স্ত্রীকে নাম ধরে ডাকা

প্রশ্নঃ মাওলানা! লোকেরা স্ত্রীকে নামধরে ডাকেনা। নাম ধরে ডাকলে শরয়ী দিক থেকে কোনো অসুবিধা আছে কি?

জবাবঃ এব্যাপারে শরয়ী দিক থেকে কোনো বিধি নিষেধ নেই। স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) তাঁর স্ত্রীকে 'আয়েশা' বলে ডাকতেন। প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশে স্ত্রীকে নাম ধরে না ডাকার প্রথা হিন্দুদের থেকে আমদানী হয়েছে। হিন্দুদের মধ্যে স্ত্রী স্বামীর নাম উচ্চারণ করতে পারেনা। এর প্রভাব মুসলমানদের মধ্যেও পড়েছে। ফলে মুসলমানদের ঘরে স্ত্রীরা তাদের স্বামীদেরকে 'মুন্নার আব্বা' প্রভৃতি বলে সম্বোধন করে এবং স্বামীরা স্ত্রীদেরকে সম্বোধন করে 'মুন্নার মা' প্রভৃতি বলে। অনেক সময় এগুলোর প্রতি অনর্থক কড়াকড়ি করা হয়। এ প্রসংগে একটি চুটকী খ্যাতি লাভ করেছে। এক ব্যক্তির নাম ছিলো 'রহমতুল্লাহ' তার স্ত্রী নামায শেষ করে সালাম ফিরাবার সময় 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহ'। বলার পরিবর্তে বলতো, 'আসসালামু আলাইকুম মুন্নার আব্বা'। কারণ তার ধারণা ছিল 'রহমতুল্লাহ' বললে তার বিয়ে ভেঙ্গে যাবে।

২০৬. 'হাতেবুল লাইল'

প্রশ্নঃ মাওলানা! 'হাতেবুল লাইল' কাকে বলে?

জবাবঃ 'হাতেব' বলা হয়ে থাকে কাঠুরিয়াকে। 'হাতেবুল লাইল' মানে সেই ব্যক্তি যে রাতের অন্ধকারে কাঠ কাটে। প্রচলিত অর্থে সেই ব্যক্তিকে 'হাতেবুল লাইল' বলা হয়, যে ন্যায় অন্যায় এবং ঠিক বেঠিকের মধ্যে কোনো তারতম্য না করে সবধরনের জিনিস নিয়ে নেয়।

২০৭. খলীফা এবং আমীর

প্রশ্নঃ মাওলানা! খলীফা এবং আমীর শব্দ দ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য কি?

---

১. এশিয়া ১১ অক্টোবর ১৯৭০।

জবাবঃ আমীর শব্দটি খলীফার জন্যে ব্যবহার করা হতো। যেমন, 'আমীরুল মুমেনীন'। দুটি শব্দ প্রায় একই অর্থ বা কাছাকাছি অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে। তখনকার যুগে প্রাদেশিক শাসনকর্তা এবং সেনাবাহিনীর কমান্ডারের জন্যেও আমীর শব্দটি ব্যবহার করা হতো। বর্তমানকালে শাহজাদাদের জন্যেও শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

২০৮. উমাইয়্যা এবং আব্বাসী শাসকরা কি খলীফা

প্রশ্নঃ উমাইয়া এবং আব্বাসী শাসকদের খলীফা বলা কি ঠিক?

জবাবঃ এটা একটা পরিভাষা এবং ইতিহাসে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। এজন্যেই সেই শাসকদের ক্ষেত্রে লোকেরা শব্দটি ব্যবহার করে। নতুবা একথা সকলের কাছেই স্পষ্ট যে, 'খিলাফতে রাশেদার' অর্থে তারা খলীফা ছিলেন না।

২০৯. যৌতুক

প্রশ্নঃ মাওলানা। যৌতুক সম্পর্কে শরীয়তের বক্তব্য কি?

জবাবঃ যৌতুক দেয়া নাযায়েয নয়, কিন্তু আজকাল এটাকে যেরূপ দেয়া হয়েছে তা খুবই মন্দ ও নিকৃষ্ট। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল যৌতুক দিতে বাধ্য করেননি। যৌতুক না দিলেও বিয়ে হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম সমাজে একারণেই বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল যে জিনিস করতে বলেননি, মানুষ সেটা করে। অতপর বলে, 'করতে হয়' কিন্তু আল্লাহ এবং রাসূল যেসব জিনিসের হুকুম করেছেন সেগুলোকে উপেক্ষা করা হয়। যেমন, মেয়েদের জন্যে উত্তরাধিকারের যে অংশ আল্লাহ তায়ালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা তাদের দেয়া হয়না। এ ধরনের কর্মনীতি কখনো কল্যাণকর হতে পারেনা।[১]

২১০. ব্যক্তিত্ব

প্রশ্নঃ মাওলানা। মানুষের আধ্যাত্মিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আপনি একস্থানে লিখেছেন, মানুষের দেহ তার রূহের কারাগার নয়। বরঞ্চ এটা হচ্ছে সেই উপায় উপকরণ যার মাধ্যমে রূহ তার কার্য সম্পাদন করে থাকে। এ

---

১. আইন ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬৮।

প্রসংগে একটি প্রশ্ন সৃষ্টি হয়। সেটা হলোঃ বাস্তব জীবনে মানুষের যে ব্যক্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়,তা কি তার রূহের অবস্থাকে প্রকাশ করে, নাকি দৈহিক শক্তিকে?

জবাবঃ মানুষের ব্যক্তিত্ব প্রকৃতপক্ষে এই দুটি জিনিসের সমন্বিত প্রকাশের মাধ্যমেই পরিগঠিত হয়। দু'টির কোনোটিকেই উপেক্ষা করা যেতে পারেনা। একথা সকলেরই জানা যে, রূহ ছাড়া দেহ নিরর্থক। কিন্তু রূহও দেহছাড়া নিজের শক্তিকে প্রকাশ করতে পারেনা। মনে করুন, কোনো কারণে কোনো ব্যক্তির দেহ পক্ষাঘাত ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় এই দেহের মাধ্যমে রূহ তার শক্তি ও যোগ্যতাসমূহকে প্রকাশ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

২১১. দেহ এবং রূহের শক্তি

প্রশ্নঃ মাওলানা! তবে একথা নির্ণয় করা যেতে পারে কি যে, মানুষের ব্যক্তিত্বগঠনে রূহ এবং দেহের মধ্যে কোন্‌টি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ?

জবাবঃ স্রষ্টা রূহ এবং দেহের শক্তি এবং যোগ্যতাসমূহের মধ্যে অনুপম মিল ও ভারসাম্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন। কোনো ব্যক্তিই পরিমাপ করে এটা বলতে পারবে না যে, মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনে রূহের ভূমিকা কি পরিমাণ এবং দেহের ভূমিকা কতোটা? আর এদুটির মধ্যে কোন্‌টি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ আর কোনটির গুরুত্ব কম?

প্রকৃতপক্ষে, মানুষ সৃষ্টি আল্লাহ তাআলার হিকমত ও মহাবিজ্ঞানময়তার অনুপম বিস্ময়। দেখুন, একটি শিশুর মধ্যে দারুণভাবে গ্রহণ করার যোগ্যতা হয়ে থাকে। যেমন, শিশু যেভাবে তার মায়ের ভাষা শিখে এবং এব্যাপারে যতো দ্রুত এগিয়ে যেতে পারে, একজন বয়স্ক ব্যক্তি শত চেষ্টা করেও কোনো ভাষা সম্পর্কে সেই পর্যায়ের পারদর্শিতা অর্জন করতে পারেনা। মনে হয় যেন বয়স বাড়ার সাথে সাথে মানুষের মধ্যে সেই যোগ্যতা সেই তুলনায় কমে যেতে থাকে যতোটা যোগ্যতা তার শিশু বয়সে থাকে।

২১২. জনৈক নেতার দাবী

প্রশ্নঃ মাওলানা! একটি দলের নেতা জনসভায় দাবী করে বেড়াচ্ছেন, এসময় কেবল তিনই পাকিস্তানের নেতৃত্ব প্রদান করতে পারেন। কারণ পাকিস্তান

আন্দোলনে তিনি ভূমিকা পালন করেছিলেন। আর যারা পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেনি কিংবা বিরোধীতা করেছিলো তারা জাতির নেতৃত্বের যোগ্যতাও রাখেনা,অধিকারও রাখেনা। তার এবক্তব্যকে সঠিক বলে গ্রহণ করা যেতে পারে কি?

জবাবঃ কোনো ব্যক্তি বা ব্যাক্তি সমষ্টি পাকিস্তান আন্দোলনে ভূমিকা পালন করেছিলেন বলেই তিনি এঅধিকার পেয়ে যাননি যে, পাকিস্তানের সাথে তিনি যা ইচ্ছা তাই ব্যবহার করবেন। তিনি এখন পাকিস্তানকে গড়েন বা ভাংগেন কেউ তাকে কিছু বলতে পারবেনা এমন অধিকার তিনি লাভ করেননি। তার এদাবী যদি মেনে নেয়া হয়, তবে প্রশ্ন হলো, আজ তাদেরই একজন যে ছয়দফা কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে এসেছেন, তার নেতৃত্বের ব্যাপারে আপত্তি কোথায়?

এখন এটা কোনো মৌলিক প্রশ্নই নয় যে, পাকিস্তান সৃষ্টিতে কারা অংশ নিয়েছিলেন? এখনকার প্রকৃত প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, পাকিস্তানকে বাঁচানোর জন্যে কারা কাজ করছেন এবং দেশটি যে বিপজ্জনক অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে তা দূর করার যোগ্যতা কারা রাখেন? পাকিস্তানের তেইশ বছরের ইতিহাসকে কেমন করে উপেক্ষা করা যেতে পারে?

২১৩. জামায়াতে ইসলামী ও ক্রেডিট

প্রশ্নঃ মাওলানা! কোনো কোনো লোক আমাদেরকে বলেঃ কোনো কাজে তারা জামায়াতে ইসলামীর সাথে সহযোগিতা করলে, তার সমস্ত ক্রেডিট জামায়াতে ইসলামীই পেয়ে যায়। অন্যদেরকে সন্তুষ্ট রাখাও জামায়াতের উচিত।

জবাবঃ কোনো ব্যক্তি যদি দীনের কাজ করেন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে করেন, তবে তার এধরণের প্রশ্ন উঠানো ঠিক নয়। আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাওয়ার জন্যেই ভাল কাজ করা উচিত। ক্রেডিট পাওয়ার জন্যে নয়। জামায়াতে ইসলামী পার্থিব স্বার্থে কোনো কাজই করে না, বরঞ্চ দ্বীনি কর্তব্য মনে করে জামায়াতের সাথে সহযোগিতার প্রসংগে কেউ যদি ক্রেডিটের প্রশ্ন উথাপন করেন তবে তিনি যেন এক পক্ষকে ক্রেডিট প্রদানকারী মনে করছেন এবং আরেক পক্ষকে মনে করছেন ক্রেডিট পাওয়ার অধিকারী। অথচ জামায়াত কখানো এদাবী করেনা যে, সে ক্রেডিট প্রদান করলে কেউ ক্রেডিট লাভ করবে এবং প্রদান না করলে লাভ করবেনা।

প্রকৃতপক্ষে এই কথাটি সকলেরই মনে রাখা দরকার, কোনো দীনি দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনে কোনো ব্যক্তি যদি দেশের অপর কোনো সংগঠনের সাথে সহযোগিতা করেন তবে একথা তার ভালভাবে বুঝা উচিত যে, তার একাজের পুরস্কার আল্লাহর কাছে রক্ষিত আছে। তিনিই ভাল জানেন এখানে কে কোন্ নিয়্যতে কাজ করছেন আর তিনিই এর প্রকৃত পুরস্কার প্রদানকারী।[১]

২১৪. ইসলাম ও চিন্তার স্বাধীনতা

প্রশ্নঃ ইসলামকে যারা স্বীকার করে, ইসলাম কি তাদেরকে ইউইউঋঅউ ঐঋঋউ (চিন্তার স্বাধীনতা) প্রদান করে?

জবাবঃ অবশ্যি। ইসলামকে যারা মানেন, ইসলাম যে শুধু তাদের চিন্তার স্বাধীনতা প্রদান করে তাই নয়, বরঞ্চ এর প্রতি সকলকে আহ্বানও জানায়। কুরআনে অনেক স্থানে মানুষকে চিন্তা গবেষণা এবং তাদাব্বুর ও তাফাক্কুর করতে বলা হয়েছে। (যেমন)। অবশ্য এই স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত নয়। পৃথিবীর প্রতিটি সভ্যতাকেই যেমন কিছু বিধি বিধান ও নিয়ম নীতি নির্ধারণ করতে হয়, তেমনি ইসলামও তার FOUR CORNERS নির্ধারন করেছে। কেননা, কোনো সুশৃংখল সমাজই তার সদস্যদেরকে তার বুনিয়াদী নীতিমালা থেকে বিচ্যুত হবার অনুমতি দেয়না এবং এমন কোনো স্বাধীনতাও সে বরদাস্ত করেনা যা সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত ও বল্গাহীন। যেমন পাশ্চাত্য সমাজে কোনো ব্যক্তিকে ACADEMIC FREEDOM এর নামে ডারউইনের মতবাদ থেকে বিচ্যুত হয়ে চিন্তা গবেষণা করার অনুমতি দেয়া হয়না, কিংবা এই মতবাদকে সমালোচনার লক্ষ্যে পরিণত করারও অনুমতি দেয়া হয়না। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে সমাজতন্ত্র থেকে বিচ্যুত হয়ে চিন্তা করার অবকাশ দেয়া হয়না। একইভাবে ইসলামেও ACADEMIC FREEDOM এর ক্ষেত্রে কিছু FOUR CORNERS রয়েছে। যেগুলোকে লংঘন করার অনুমতি দেয়া যেতে পারেনা। এর উদাহারণ হচ্ছে ঠিক সেই রকম, যেমন, কোনো বিপজ্জনক পাহাড়ীপথে বিপদের কিছু চিহ্ন বা সংকেত লাগিয়ে রাখা হয়, যাতে করে অনভিজ্ঞ নতুন পথিকরা দুর্ঘটনা ও ধ্বংস থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে।

১. আইন ২৯ মে ১৯৭০।

২১৫. ইসলাম ও মৌলিক তত্ত্ব

প্রশ্নঃ মাওলানা! তবে কি ইসলামের পেশকৃত মৌলিক তত্ত্ব এবং অতিপ্রাকৃত বিষয়সমূহকে চিন্তা ও গবেষণার SUBJECT বানানো যাবেনা?

জবাবঃ প্রকৃতপক্ষে ইসলাম এসব মূল তত্ত্বের উপর এক ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তাগবেষণার আহ্বান জানায়। ইসলাম বলে, কিছু মূল তত্ত্ব এমন রয়েছে যা সম্পর্কে মানুষ সরাসরি জ্ঞান লাভ করতে পারেনা। সেগুলো সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্যে মানুষ অন্যকোনো মাধ্যমের মুখাপেক্ষী। অবশ্য সেইসব মূলতত্ত্ব উপলব্ধি করার জন্যে প্রাকৃতিক জগতে এমন অসংখ্য সাক্ষ্য প্রমাণ বর্তমান রয়েছে যেগুলো এইসব তত্ত্ব সত্য হবার ব্যাপারে স্পষ্টভাবে ইংগিত করছে। ইসলাম এইসব নিদর্শনকে দেখার, যাচাই বাছাই করার এবং এগুলোকে নিয়ে চিন্তা গবেষণা করার এবং এগুলোর মাধ্যমে সেইসব মূলতত্ত্ব উপলব্ধি করার আহ্বান জানায়। ইসলাম আমাদের বলে, জীবনের অতিপ্রাকৃত তত্ত্বসমূহের জ্ঞান অহীর মাধ্যমে সরাসরি নবীগণকে প্রদান করা হয়েছে এবং তাঁরা এইসব তত্ত্ব মানুষকে অবহিত করার জন্যে নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছেন। সরাসরি সকল মানুষকে এগুলোর জ্ঞান প্রদান করা, মানুষকে পরীক্ষা করার যে উদ্দেশ্য, তার বিপরীত। আল্লাহ তাআলা যদি মানুষকে সরাসরি এই সকল অতিপ্রাকৃত তত্ত্বের জ্ঞান প্রদান করতেন, তবে তো মানুষকে পরীক্ষা করার সুযোগই আর বাকী থাকতো না। আল্লাহ তাআলা নবীগণের মাধ্যমে মানুষকে জীবনের মৌলিক তত্ত্বসমূহের সংবাদ দিয়ে আহ্বান জানিয়েছেন, তারা যেন তাদের চারপাশে ছড়িয়ে থাকা নিদর্শনাবলী ও সাক্ষ্য প্রমাণ অধ্যয়ন করে এবং চিন্তা গবেষণা করে দেখে যে, এই জিনিসগুলো সেইসব মূলতত্ত্বের সত্যতা প্রমাণ করে কিনা। কোনো ব্যক্তি যদি নিজের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে এসব তত্ত্বের সত্যতা কিংবা অসত্যতা নির্ণয় করতে চায়, তবে এটা অসম্ভব। কেননা, মানুষের ইন্দ্রিয় এসব তত্ত্ব আয়ত্ব করতে পারেনা। এমনিভাবে শুধুমাত্র জ্ঞান ও বোধি দ্বারা মানুষ এসব জিনিসের সঠিক পরিচয় লাভ করতে পারেনা। এগুলো সম্পর্কে কোনো অকাট্য বিধান স্থির করতে পারেনা। একারণে এগুলো সম্পর্কে সঠিক তথ্য ও জ্ঞান লাভ করার ব্যাপারে একটিই মাত্র পথ রয়েছে। আর তা হলো প্রাকৃতিক জগতের নিদর্শনাবলী ও সাক্ষ্য প্রমাণ সম্পর্কে চিন্তাগবেষণা করা এবং সেগুলোর সাক্ষ্য ও স্বীকৃতির আলোকে নবীগণের প্রতি ঈমান আনা।

(এ প্রসংগে একটি উপমা প্রদান করতে গিয়ে মাওলানা বলেন)ঃ আমাদের এই জড় জগতেও এমন অনেক তত্ত্ব রয়েছে যেগুলো আমরা শুধুমাত্র চিহ্ন, নিদর্শন এবং সাক্ষ্য প্রমাণ অধ্যয়নের ভিত্তিতে স্বীকার করি। নতুবা সেগুলো আমাদের ইন্দ্রিয় অনুভূতির আওতার বাইরে। যেমন, 'মধ্যাকর্ষণ সূত্র' বিজ্ঞানের একটি বিখ্যাত সূত্র। এর অর্থ হলো, পৃথিবীর আকর্ষণে যাবতীয় বস্তু উপর থেকে নীচের দিকে পড়ে। এখন কথা হচ্ছে, পৃথিবীর এই আকর্ষণ তো এমন কোনো জিনিস নয়, যা আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে দেখতে বা জানতে পারি। কিন্তু তা সত্ত্বেও সকলেই 'মাধ্যাকর্ষণ সূত্র' স্বীকার করে। এর কারণ শুধু এই যে, নিদর্শন ও সাক্ষ্য প্রমাণ এটাকে সত্য বলে প্রমাণ করছে। এগুলো বলছে, সত্যিই পৃথিবীর মধ্যে এমন কোনো আকর্ষণ শক্তি রয়েছে, যা সব জিনিসকে তার দিকে আকর্ষণ করছে। এখন যদি কেউ এইসব নিদর্শন ও সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে চোখ বন্ধ করে শুধু কেবল দার্শনিক পন্থায় চিন্তা করে যে, এই মধ্যাকর্ষণ শক্তি সত্যিই কোনো প্রকৃত জিনিস কিনা। তবে একথা পরিষ্কার, তার এধরনের চিন্তাকে যুক্তিসংগত বলা যাবেনা এবং এটাকে ACADEMIC DISCUSSIONS বলা যেতে পারে না।

২১৬. মূল্যবোধ এবং পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ

প্রশ্নঃ মাওলানা! পাশ্চাত্যের কোনো কোনো চিন্তাবিদ এবং দার্শনিক বলে থাকেন, মূল্যবোধ (VALUES) পরিবর্তন হয়ে থাকে। কোনো মূল্যবোধই স্থায়ী নয়। এদের এসব বক্তব্য কতোটা সঠিক?

জবাবঃ যে ব্যক্তি বলে, মূল্যবোধ পরিবর্তন হয়ে থাকে এবং কোনো মূল্যবোধ স্থায়ী নয়, দর্শনের অ, আ, ক, খ, জ্ঞানও তার নেই। কোনো বড় দার্শনিক কি এদাবী করতে পারবে যে, এক হাজার বা পাঁচ হাজার বছর আগে সত্য বলাটা একটা ভাল কাজ ছিল। কিন্তু এখন সত্য বলাকে অপরাধ বলে গণ্য করা উচিত? অথবা পূর্বকালে দুষ্কৃতি ছিল অপরাধের কাজ এবং বর্তমানে তা একটি ন্যায় কাজ?

২১৭. টাখনুর নীচে পরিধেয় ঝুলানো অহংকার

প্রশ্নঃ একটি হাদীসে বলা হয়েছে, পাজামা প্রভৃতি পরিধেয় টাখনুর উপরে রাখা উচিত। একথাও বলা হয়েছে যে, অহংকার থেকে বাঁচার জন্যেই এনির্দেশ

দেয়া হয়েছে। এ প্রসংগে একটি প্রশ্ন সৃষ্টি হয়। তা হলো, কোনো ব্যক্তির মধ্যে যদি অহংকার না থাকে তবে টাখনুর নীচে পরিধেয় ঝুলিয়ে দিলে তার গুনাহ হবে কি?

জবাবঃ তার মধ্যে যদি অহংকার নাই থাকে, তবে যে কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে সে তা করতে যাবে কেন?

২১৮. বণী ইসরাঈলের তাবাররুক প্রসংগ

প্রশ্নঃ মাওলানা। বণী ইসরাঈলের জন্যে কুরআনের তৃতীয় পারায় যেসব তাবাররুকের কথা বলা হয়েছে সেগুলো কি এখনো বর্তমান রয়েছে?

জবাবঃ না, সেগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। সেগুলো হযরত দাউদ (আঃ) এর পূর্বের ঘটনা। তখন পর্যন্ত এই সব তাবাররুক হাইকালে সুলাইমানীতে সংরক্ষিত ছিলো। প্রথমে বেবিলনীয়রা হাইকালে সুলাইমানী ধ্বংস করে দেয়। পরে রোমীয়রা তা ধূলিস্যাত করে। এতে সেইসব তাবাররুক ধ্বংস হয়ে যায়। এমনকি তাওরাতের মূলকপিও ধ্বংস হয়ে যায়। বণী ইসরাঈলীরা তাওরাতকে তো বেবিনীয়নদের আক্রমণের আগেই হের ফের করে ফেলে। স্বয়ং বাইবেলেই এই ঘটনার উল্লেখ হয়েছে যে, একবার নির্মাণ কাজ চলাকালে মাটির নীচের কোনা কুঠরিতে তাওরাতের মূলকপি পাওয়া যায়। তা ইয়াহুদীয়ার বাদশাহর সম্মুখে পেশ করা হলে, সেখানে এটি প্রায় একটা অচেনা গ্রন্থের মত আলোচিত হয়। এ কারণেই কুরআন বলছেঃ

"তারা আল্লাহর কিতাবকে পেছনে নিক্ষেপ করেছে।"

২১৯. মান্না সালওয়া

প্রশ্নঃ মাওলানা! বণী ইসরাঈল কি মান্না সালওয়া হেফাজত করে রেখেছে?

জবাবঃ সালওয়া নেই। ওটা এক প্রকার ক্ষুদ্র পাখি। এখন তা বিলীন হয়ে গেছে। যে অঞ্চলে বণী ইসরাঈলের উপর মান্না সালওয়া নাযিল হয়েছিল, আমি সেই এলাকা সফর করেছি। সেটি বর্তমান সাইনা উপদ্বীপ এলাকা। এখন সেখানে ঐ ধরনের কোনো পাখির নাম নিশানাও নেই। যদিও কুরআন মজীদে যেখানে

এই পাখির কথা আলোচিত হয়েছে, তা থেকে অনুমতি হয় যে, সে সময়ে এই পাখি লাখো লাখো নাযিল হয়ে থাকবে।

২২০. পাখির নাযিল হওয়া

প্রশ্নঃ তখন কি পাখিও নাযিল হতো?

জবাবঃ হ্যাঁ! আল্লাহ তাআলা যা কিছু সৃষ্টি করেন তা তাঁর পক্ষ থেকে নাযিলই হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা লৌহ সৃষ্টি করেছেন, এ সম্পর্কে তিনি কুরআন মজীদে বলেছেন, "ওয়া আনযালনাল হাদীদ–আমরা লৌহ নাযিল করেছি।"

২২১. ব্যাংকের চাকুরি অবৈধ কেন?

প্রশ্নঃ ব্যাংক কর্মচারীর বেতনে সুদ অন্তর্ভুক্ত হয় এজন্যে সেটাকে নাযায়েয ধারা হয়। কিন্তু সাধারণ সরকারী কর্মচারীরা যে বেতন পায় তাতেও তো সুদ অন্তর্ভুক্ত থাকে। তবে সেটা কি করে বৈধ হয়?

জবাবঃ ব্যাংক কর্মচারীরা যে বেতন পায় তার পুরোটাই সুদ থেকে বের হয়। অন্যান্য সরকারী কর্মচারীরা যে বেতন পায়, তার মধ্যে সুদের অংশ থাকে। এছাড়াও এ দু'ধরনের চাকুরীর মধ্যে এই পার্থক্য রয়েছে যে, ব্যাংক কর্মচারী সরাসরি সুদের কাজ করে থাকে। আর সাধারণ সরকারী কর্মচারীরা সরাসরি সুদের সাথে জড়িত কার্যসম্পাদন করেনা। একারণে ব্যাংকের চাকুরী এবং সাধারণ চাকুরী এক পর্যায়ের নয়।

(কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর মাওলানা বললেন) এতদোভয়ের মধ্যে পার্থক্য বুঝার জন্যে একটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। যেমন একটা হচ্ছে নিরেট প্রস্রাব, আরেকটি হচ্ছে একটি বড় ভান্ডের পানি তার মধ্যে কয়েক ফোঁটা প্রস্রাব মিশানো হয়েছে।

২২২. খৃষ্টানদের সাথে পানাহার

প্রশ্নঃ খৃষ্টানদের সাথে একত্রে পানাহারের অনুমতি আছে কি?

জবাবঃ এর জবাব কুরআন মজীদেই দেয়া হয়েছে যে, তাদের সাথে পানাহার করা যেতে পারে। তবে তাদের ডাইনিংএ কোনো হারাম খাদ্য থাকলে তা স্পর্শ করা যাবে না।[১]

২২৩. ইবাদত ও জিহাদ

প্রশ্নঃ নামায, রোযা, হজ্জ এবং যাকাতের উদ্দেশ্য জিহাদের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ, এ কথাটা কি ঠিক?

জবাবঃ নামায, রোযা, হজ্জ এবং যাকাতের উদ্দেশ্য আল্লাহর ইবাদত করা এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভ। জিহাদও আল্লাহর ইবাদত। নামায, রোযা মানুষকে জিহাদের জন্যে প্রস্তুত করে এটা একটা ভিন্ন কথা। যে ইবাদত ও নেক কাজ উত্তম নিয়্যত ও নিষ্ঠার সাথে করা হয়, তা মুসলমানকে অপর ইবাদত ও নেকীর জন্যে তৈরী করে।

২২৪. সৃষ্টি জগতের বৈজ্ঞানিক গবেষণা

প্রশ্নঃ কোনো মুসলমান যদি বিশ্ব জগত সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য বানিয়ে নেয় তবে তা ঠিক হবে কি?

জবাবঃ প্রশ্ন হলো, তিনি কি উদ্দেশ্যে এ গবেষণা চালাতে চান?

প্রশ্নকর্তা বললেনঃ বিজ্ঞানের সমৃদ্ধির জন্যে, কিংবা বিজ্ঞানে মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের জন্যে।

মাওলানা বললেনঃ আপনি দুইটি বিপরীত ধরনের কথা বললেন। একটি উদ্দেশ্য তো শুধু গবেষণা করা বা গবেষণা করার জন্যে গবেষণা করা। আরেকটি উদ্দেশ্য এক্ষেত্রে মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন। আপনি এ দু'টির কোন্‌টির জবাব চান?

প্রশ্নকর্তা একটু চিন্তা করে বললেনঃ উভয় উদ্দেশ্যের জবাবই দিন।

---

১. আইন ২৩ জুন ১৯৬৯।

মাওলানা বলেনঃ গবেষণার জন্যে গবেষণা সম্পূর্ণ অর্থহীন। সকল গবেষণারই কোনো না কোনো উদ্দেশ্য অবশ্যি থাকে। সে উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জন হতে পারে, খ্যাতি অর্জন হতে পারে, কিংবা জাতিকে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ করা হতে পারে। কেবল গবেষণার জন্যে গবেষণা কখনো হয়না। যেমন কোনো ছুতার যদি বলে, আমি টেবিলের জন্যে টেবিল বানাচ্ছি, তবে তার একথা সম্পূর্ণ অর্থহীন। সকল কাজেরই উদ্দেশ্য থাকে, কোনো মুসলমান যদি ইসলাম এবং মুসলমানদের কল্যাণ্যের উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালায়, তবে এটি একটি উত্তম ও কল্যাণকর কাজ।

২২৫. কুরআনী আয়াতের তরতীব

প্রশ্নঃ মাওলানা! কুরআনের আয়াতসমূহের তরতীব সম্পর্কে একথা তো চূড়ান্ত যে, বর্তমানে যে তরতীব রয়েছে তা স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কিন্তু সূরাসমূহের বর্তমান তরতীবও কি নবী (সাঃ) নির্ধারণ করে দিয়েছেন?

জবাবঃ রাসূলুল্লাহর (সাঃ) যামানায় সাহাবায়ে কিরাম পূর্ণ কুরআন হেফয্ করেছিলেন এবং নবী করীম (সাঃ) এর জীবদ্দশায় তারাবীতেও কুরআন পড়া হয়েছিলো। তবে কি তা নির্দিষ্ট তরতীব ছাড়াই হয়েছিল?

প্রশ্নকর্তা পুনরায় বললেনঃ আসলে এ প্রশ্ন এজন্যে সৃষ্টি হয়েছে যে, একজন জীবনীকার লিখেছেন, আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) যে মাসহাফ তৈরী করিয়েছিলেন, তাতে সূরাসমূহের তরতীব নির্ধারিত ছিলোনা। মাসহাফে ওসমানীতে এ তরতীব নির্ধারিত হয়। এথেকে সন্দেহ হয় যে, রাসূলুল্লাহর (সাঃ) যামানায় সূরাসমূহের তরতীব চূড়ান্ত হয়নি।

মাওলানা বলেনঃ এটা সম্পূর্ণ ভূল কথা। স্বয়ং নবী করীমই (সাঃ) আল্লাহর নির্দেশে সূরাসমূহের তরতীব নির্ধারিত করে গেছেন। তাঁর ইন্তেকালের পর এ তরতীব পরিবর্তণের কোনো প্রশ্নই উঠেনা। রাসূলুল্লাহর (সাঃ) ইন্তেকালের পর না কুরআনের আয়াতের তরতীব পরিবর্তন করা হয়েছে আর না সূরার। হযরত আবুবকর সিদ্দীকের (রাঃ) যামানায় কুরআনের যে কপি তৈরী করা হয়, তা

রাসূলুল্লাহর (সাঃ) নির্ধারিত তরতীবের ভিত্তিতেই তৈরী করা হয়। সেটিকে কপি করিয়েই হযরত ওসমান (রাঃ) শাসনকর্তাদের নিকট পাঠান।[১]

২২৬. সত্যের বিরোধিতা

বৈঠকে আলোচনার এক পর্যায়ে ইসলামী আন্দোলনের বিরোধীদের এবং বিরোধিতার কথা আলোচিত হয়। তাদের অভিযোগসমূহ আলোচিত হয়।

এ পর্যায়ে মাওলানা বলেনঃ

আমাদের শত্রুরা আসলে বুদ্ধিমান নয়। ওরা যা কিছু বলে বেড়াচ্ছে, তাতে ইসলামী আন্দোলনেরই লাভ হচ্ছে। সত্যের জন্যে বাতিলের বিরোধীতা জরুরী। বাতিল যদি হককে TOLERATE করতে শুরু করে, তবে সত্য সত্য হবার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয়।

২২৭. দীনের প্রচার এবং পূর্ণাঙ্গ ইল্‌ম ও আমল

প্রশ্নঃ মাওলানা! কেউ কেউ বলেন, কুরআন হাদীসের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান হাসিল করা ছাড়া দীন প্রচারের কোনো অধিকার নাকি আমাদের নেই। আর জ্ঞান লাভ করলেও আমল ছাড়া দীন প্রচারের অধিকার লাভ করা যায় না। যেমন, প্যান্ট পরে এবং টাই লাগিয়ে দীন প্রচারের কাজ করাটা নাকি বৈধ নয়।–এসব ধারণা কি সঠিক?

জবাবঃ যারা বলেন, কুরআন হাদীসের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান লাভ করা ছাড়া দীন প্রচারের অধিকার নেই, তাদের জিজ্ঞেস করুন, পরিপূর্ণ জ্ঞানের সংজ্ঞা কি? এর সীমাপরিসীমা ও মানদন্ড কি? কোন্ ব্যক্তি পরিপূর্ণ ইল্‌ম হাসিল করেছেন, তা কি করে জানা যাবে? যাদের গোটা জীবন কুরআন হাদীস শেখা ও শিক্ষাদানের কাজে অতিবাহিত হয়েছে, তারাও তো এদাবী করতে পারবেননা যে, কুরআন হাদীসের পরিপূর্ণ জ্ঞান তারা অর্জন করেছেন। সত্যিকার আলিমরা তো মৃত্যু পর্যন্তই শিক্ষার্থী থাকেন। 'পূর্ণাঙ্গ আলিম হয়ে গেছি' কিংবা 'পরিপূর্ণ ইলম হাসিল করে ফেলেছি' –এ ধরনের অহমবোধ কখনো তাদের মগজে ঢুকেনা। সুতরাং পরিপূর্ণ ইলম হাসিল করা ছাড়া দীন প্রচারের কাজ করা যাবেনা, একথা

---

১. আইন ২৩ জুন ১৯৫৮।

নিতান্তই ভুল। রাসূলুল্লাহর (সাঃ) যামানায় যেসব বেদূঈন এসে ইসলাম কবুল করতো এবং নিজ নিজ কবীলায় ফিরে গিয়ে দীন প্রচার করতো, তাঁরা কি পূর্ণাঙ্গ আলিম হয়ে একাজ করতো? তারা দীনের সারকথা শিখে যেতেন। কোন্টা হক আর কোন্টা বাতিল, কি কি কাজের অনুমতি আছে আর কি কি নিষিদ্ধ এবং নিজেদের কর্তব্য কাজ কি? এই কথাগুলো তারা জেনে নিতেন এবং নিজ নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে আল্লাহর দীন প্রচারের কাজ করতেন। এইসব লোকের তাবলীগের ফলেই গোত্রকে গোত্র মুসলমান হয়ে গিয়েছিল।

আপনার প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ হলো আমলবিহীন তাবলীগ সম্পর্কে। এব্যাপারে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকা কোনো শর্ত সাপেক্ষ বিষয় নয়। একটি লোকের আমলে ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও যদি সে শয়তানের পথের পরিবর্তে মানুষকে আল্লাহর পথের দিকে ডাকে, তবে এটাতো কোনো ভ্রান্ত কাজ হতে পারে না। এ কাজে তাকে বাধা দেবেন না। তার এ কাজের জন্যে অভিযোগও করবেননা। চিন্তা করে দেখুন, একটা লোক এতোটা অগ্রসর হয়েছে যে, মানুষকে আল্লাহর দীনের দিকে ডাকছে। মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করছে। তাদের সামনে সত্যদীন পেশ করছে। এই লোকটির ব্যাপারে তো এই আশাই করা উচিত যে, লোকটি যে ভালো কাজ করছে, এ কাজই একদিন তাকে তার আমলের ত্রুটি সম্পর্কে ভাবিয়ে তুলবে এবং তাকে সংশোধন করে দেবে। সে যখন দীনের প্রচার কার্য চালিয়ে যেতে থাকবে, তখন তার আমলের ত্রুটির জন্যে তার বিবেক তাকে তিরস্কৃত করতে থাকবে। তার বিবেক আমলের সংশোধনের জন্যে তাকে তাড়িত করবে। আর এভাবেই ধীরে ধীরে সে নিজেকে সংশোধন করে নেবে। যে ব্যক্তি নিজেই ভ্রান্ত পথ থেকে সংশোধনের পথে এগিয়ে আসছে, আপনি যদি তাকে বার বার ধাক্কা দিতে থাকেন, তবে তো সে পুনরায় ভ্রান্ত পথের দিকেই ফিরে যাবে। আমার ধারণা, এর ফলে আপনিই আল্লাহর দরবারে পাকড়াও হবেন। আপনি যদি এ ভালো কাজটির জন্যে এভাবে তিরস্কার করেন, তার এ কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করনে, তবে এর ফল দাঁড়াবে এই যে, সে মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকার কাজ ছেড়ে দেবে। সত্যের কথা বলবে না। আল্লাহর বন্দেগীর দিকে মানুষকে আহ্বান করবেনা। আর এটা যে গলদ কাজ, তাতে তো কোনো সন্দেহ নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহর দীনের প্রচার করে, মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান জানায়, তার

ব্যাপারে তো এ আশা পোষণ করাই উচিত যে, একদিন সে নিজেও সংশোধন হয়েযাবে।

হাদীস থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। লোকটি দিনে নামায পড়ে এবং রাত্রে চুরি করে। এই লোকটির ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কি? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ "তাকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। হয় তার চুরি তার নামায ছাড়াবে কিংবা তার নামায তার চুরি ছাড়াবে"

এখন দেখুন, কোনো ব্যক্তি যদি ভাবাবেগের বশবর্তী হয়ে এই ব্যক্তিকে বলেঃ "কমবখত্, চুরি করিস্ আবার নামায পড়িস, তোর নামায কি কাজে লাগবে?" তবে এর ফলে আসলে ঐ চুরিতে অভ্যস্ত লোকটির সংশোধনের সর্বশেষ আশাটুকুও ছিন্ন করে দেয়া হলো। চুরিতে তো সে নিমজ্জিত রয়েছেই, তদুপরি আপনি তার নামাযও ছাড়িয়ে নিতে চাচ্ছেন। তার নামাযটা হলো সেই রজ্জু, যা এখনো তাকে কিছু না কিছু ভালো কাজের সাথে সম্পৃক্ত রেখেছে। এর ফলে তার ব্যাপারে এ আশা করা যেতে পারে যে, হয়তো একদিন সে পুরোপুরিই ভালোর দিকে ফিরে আসবে। কিন্তু সংশোধনের আবেগে যদি আপনি এই শেষ রুজ্জুটুকুও কেটে দিতে চান, তবে বিরাট সংশোধনের কাজ করে ফেলেছেন বলে হয়তো আপনি আত্মতৃপ্তি বোধ করতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনি ঐ লোকটিকে জাহান্নামের পথেই ঠেলে দিলেন।

এ কারণেই নবী করীম (সা) লোকটিকে এ কথা বলেননি যে, সে যদি চুরিই করে, তবে তার নামায পড়ে লাভ কি? বরঞ্চ তিনি বলেছেন, তাকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দাও, নামাযী হবার কারণে তার চুরিকেও স্বীকৃতি দিও না, আবার চুরি করার কারণে তার নামাযকেও অস্বীকার করোনা। একটি সময় আসবে, যখন তার নামাযই তার চুরি ছাড়িয়ে দেবে কিংবা চুরি তাকে নামায থেকে দূরে সরিয়ে নেবে।

সমস্যা হলো, কিছু লোক সংশোধনের কথা বলেন ঠিকই, কিন্তু সংশোধনের জন্যে যেরূপ হিকমাতের জরুরত রয়েছে, তার প্রাথমিক দাবী

সম্পর্কেও তারা ওয়াকিফহাল নন। হিকমত বিহীন পন্থা অবলম্বনের ফলে অনেক সময় তারা লোকদেরকে ইসলাম থেকে দূরে ঠেলে দেন। [১]

২২৮. বাদশাহ এবং মোসাহেব

বৈঠকে কেউ একজন রাজা বাদশাহ এবং তাদের মোসাহেবদের প্রসংগ উত্থাপন করলে এবিষয়ে চিত্তাকর্ষক আলোচনা হতে থাকে। এ প্রসংগে মাওলানা তার মতামত ব্যক্ত করে বলেনঃ

রাজা বাদশাহদের ধ্বংসের মূল কারণ হচ্ছে, তাদের মোসাহেব এবং তোষামোদকারী ব্যক্তিরা। এরা শাসকদেরকে জনগণের প্রকৃত ঝোঁক প্রবণতা ও ইচ্ছা আকাংখা সম্পর্কে অবহিত হতে দেয়না। এরা সবসময় তাদের দূর্বল দিকগুলোর প্রতি লক্ষ্যারোপ করে। অতপর এসব দূর্বলতাকে তারা তাদের সামনে তাদের গুণ ও মহত্ব হিসেবে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে তোলে এবং তাদের থেকে তারা আরো অধিক আস্থা লাভ করে। অবশেষে একদিন তারা ডুবে মরে।

মানুষকে তার নফস শয়তানও প্রতারিত করে এবং সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা চালাতে থাকে। সেই সাথে যদি তার আশপাশেও মোটা অংকের বেতন দিয়ে অনেকগুলো বড় বড় শয়তান এই উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা হয় যে, তারা সবসময় নিজেদের মনিবের তোষামোদ করবে এবং সকল বৈধ অবৈধ কাজের প্রসংশা করে তাকে প্রতিনিয়ত বিভ্রান্ত করতে থাকবে, তবে একজন মানুষের জন্যে এর চাইতে বড় দূর্ভাগ্য আর কি হতে পারে।

এ প্রসংগে মাওলানা জনৈক নবাবের একটি আকর্ষণীয় ঘটনা শুনানঃ

নবাব নিজের সম্পর্কে এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতে থাকেন যে, তিনি অতি উঁচু দরের বুযুর্গ ব্যক্তি হয়ে গেছেন এবং তাঁর দ্বারা কেরামতও প্রকাশ হয়। নবাবের মোসাহেবরা যখন নবাবের এই দূর্বলতা উপলব্ধি করলো, তখন তারা তাকে হাওয়া দিতে শুরু করলো। তারা তাদের সূক্ষ্ম আবেদনশীল ভাষায় নবাবকে দৃঢ় আস্থাশীল করে তুলতে চেষ্টা করলো যে, হুজুরের দ্বারা সবসময়ই কেরামতি সংঘটিত হয়। এমন কি তারা তাঁকে এই আস্থাও দিতে শুরু করলো যে, নামাযের সময় তিনি গায়েব হয়ে যান এবং তাঁর এই নামায কাবা ঘরে

---

১. সাপ্তাহিক আইন ১৬ জুন ১৯৬৮ইং।

আদায় হয়। তারা আরো বললো, হারাম শরীফে অনেকেই তাঁকে নামায পড়তে দেখেছেন।

এবিষয়ে নবাবের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি করার জন্যে তারা একটি বিশেষ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে। নবাব যখন তাঁর কক্ষে নামায আরম্ভ করতেন, তখন তারা তাঁর কামরায় প্রবেশ করতো এবং পারস্পরিক হৈ হৈল্লোড় এবং হাস্য রসিকতায় মেতে উঠতো। এতে নবাব মনে করতেন আমার কক্ষে প্রবেশ করে শোরগোল করার এই সাহস এরা কোথায় পেল? তাহলে নিশ্চয়ই নামায পড়ার সময় আমি অদৃশ্য হয়ে যাই। অতপর নবাব যখনই নামাযের সালাম ফিরাতেন সাথে সাথে তারা সম্পূর্ণ নীরব হয়ে যেতো এবং মোসাহেবরা নাববকে শুনিয়ে শুনিয়ে কানা ঘুঁষা করে বলতে থাকতোঃ "এই, এই, হুজুর এসে গেছেন।" অতপর অবাক দৃষ্টিতে তারা নবাবকে সম্বোধন করে বলতো, "হুজুর আপনিতো এই মাত্র এখানে তশরীফ এনেছেন।" তখন নবাব চক্ষু বন্ধ করে বিরাট বুযুর্গানা শানে বলতেন, "হ্যাঁ আমি একটু বাইরে গিয়েছিলাম।"

ঘটনা বলার পর মাওলানা বললেনঃ

এই মোসাহেব এবং তোষামোদকারীরা ভাল সুস্থ মানুষকেও পাগল বানিয়ে ছাড়ে।[১]

২২৯. কি পরিমাণ খরচ করতে হবে?

প্রশ্নঃ "হে নবী তোমাকে জিজ্ঞেস করছে তারা কি ব্যয় করবে? তাদের বলো তাই ব্যয় করবে যা উদ্বৃত্ত থাকে।" কেউ কেউ কুরআনের এই আয়াতকে রাষ্ট্রীয় মালিকানা বা জাতীয়করণের স্বপক্ষে যুক্তি হিসেবে পেশ করে। তারা বলে, যা কিছু প্রয়োজনের অতিরিক্ত (SURPLUS) সেটা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় প্রদান করা উচিত। তাদের এই যুক্তি কতোটা সঠিক?

জবাবঃ কিছু কিছু লোক বাইরের মতবাদ গ্রহণ করে সেটাকে চালু করার জন্যে কুরআন থেকে সেটার পক্ষে যুক্তি খোঁজার চেষ্টা করে। তারা তাদের গৃহীত মতবাদের পক্ষে কুরআনের স্বীকৃতি অন্বেষণ করে। তাদের এই ধরনের আচরণের একটি উদাহরণ হচ্ছে, আপনার উদ্ধৃত আয়াতটি। প্রশ্ন হলো, যা কিছু উদ্বৃত্ত

১. এশিয়া ২২ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯।

থাকবে তা জাতীয় মালিকানায় প্রদান করার কথা এ আয়াত থেকে কেমন করে বের করা যায়? অথচ এ আয়াত এর সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যক্তি মালিকানার কথাই প্রমাণ করে। কারণ ব্যক্তি মালিকানাই যদি অস্বীকার করা হলো, তবে "কি পরিমাণ ব্যয় করবে?" কথাটির কোনো অর্থই হয়না। ব্যক্তি মালিকানায় সম্পদ থাকলেইতো এ প্রশ্নের সৃষ্টি হবে, সে কি পরিমাণ ব্যয় করবে?

দেখুন, ব্যক্তি নিজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত কি জিনিস খরচ করবে তা সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব ব্যক্তির উপরই ছেড়ে দেয়া হবে। প্রয়োজন কোনো নির্দিষ্ট জিনিস নয়। একটি ইসলামী সমাজে ব্যক্তিই সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে তার প্রকৃত প্রয়োজন কি? ইসলাম মানুষকে এই পৃথিবীতে তার আমলনামা সংকলনের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেছে। এজন্যে সে কোনো রাষ্ট্র বা ব্যক্তিকে এ ক্ষমতা প্রদান করেনি যে, ব্যক্তি কি ব্যয় করবে তা নির্ধারণ করে দেবে। কিংবা এক্ষমতাও প্রদান করেনি যে, ব্যক্তির প্রকৃত প্রয়োজন কি তা ফায়সালা করবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, নির্দেশ প্রদান করা হয়নি। বরঞ্চ যারা ব্যয় করার জযবা রাখেন তাদেরকে একটি হিদায়াত দান করা হয়েছে।

১৩০. ইসলামী রাষ্ট্র ও ব্যক্তি মালিকানার সীমা

প্রশ্নঃ ইসলামী রাষ্ট্র কি ব্যক্তি মালিকানার সীমা নির্ধারণ করে দিতে পারেনা, যাতে করে কিছু লোক অঢেল সম্পদের মালিক হতে না পারে?

জবাবঃ ইসলাম কোনো কৃত্রিম পক্রিয়ায় ব্যক্তি মালিকানার সীমা নির্ধারণের পক্ষপাতি নয়। ইসলাম কিছু মূলনীতির মাধ্যমে সম্পদ পঞ্জিভূতকরণ বন্ধ করতে চায়। যেমন, সে সম্পদ উপার্জনের পন্থাসমূহের উপর কিছু বিধি নিষেধ আরোপ করে। ইসলামী রাষ্ট্রে ঐ সকল উপায় সম্পূর্ণ রুদ্ধ করে দেয়া হবে যেগুলো শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। আজকাল যেসব উপায়ে সম্পদের পাহাড় গড়া হয় সেগুলোর মধ্যে যে অবৈধ উপায়ের ছড়াছড়ি রয়েছে তাতো আপনাদের চোখের সামনেই রয়েছে। ইসলামী সমাজে শুধুমাত্র বৈধ উপায়েই সম্পদ উপার্জন করা যাবে। ইসলামী রাষ্ট্রে সুদ, জুয়াসহ উপার্জনের কোনো অবৈধ উপায়েরই প্রশ্ন উঠেনা। এইসাথে বৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রেও ইসলামে নির্দিষ্ট বিধি বিধান রয়েছে। এব্যাপারে প্রধান বিধান হচ্ছে যাকাত। এছাড়াও ইসলাম এক ব্যক্তির উপার্জনের মধ্যে তার সন্তান সন্ততি, পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, নিকটজন

এবং ইয়াতীম মিসকীন প্রভৃতির অধিকার ধার্য করে দিয়েছে। এই সকলের জন্যে খরচ করার পর তার সম্পদের যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তবে তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার জন্যে উৎসাহিত করা হয়েছে। কিন্তু এ প্রসংগে ইসলাম বাধ্যতামূলক আইন প্রয়োগ করেনি। বরঞ্চ এ ফায়সালার ভার ব্যক্তির উপরই ছেড়ে দেয় যে, সে কি পরিমাণ সম্পদ বাঁচাবে এবং কি পরিমাণ ব্যয় করবে। ব্যক্তির নিকট থেকে যদি স্বাধীনভাবে নেক কাজ করবার ক্ষমতা হরণ করে নেয়া হয়, তবেতো আমলের জবাবদিহির ধারণা এবং বিচার দিনের প্রয়োজনীয়তা ও বৈধতাই খতম হয়ে যায়। তাছাড়া এই এখতিয়ারই তো মানুষের জন্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সুযোগ করে দেয়। মানুষ যদি নৈতিক জীবই হয়ে থাকে, তবে সেই নৈতিকতার স্থায়ীত্ব ও উন্নতির পথকে ঘায়েল করা কেমন করে ইসলামী ধারণা হতে পারে?

ইসলামী সমাজে কিছু আদর্শিক সীমারেখার মধ্যে সম্পদ উপার্জন করা এবং ব্যয় করার ক্ষেত্রে এ উদ্দেশ্যে স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে, যাতে করে মানুষ তার সেই ঠিকানা নির্বাচন করে নিতে পারে যেখানে তাকে চিরদিন থাকতে হবে। একারণেই কোনো বাধ্যতামূলক আইনের দ্বারা ব্যক্তিকে তার আমলের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা ইসলামের মেজাজ ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়।

প্রশ্নঃ মাওলানা! কেউ কেউ আশংকা প্রকাশ করেন, আইনগত বিধি নিষেধ না থাকলে কোনো ব্যক্তিকে অঢেল সম্পদ সঞ্চয় করা থেকে বিরত রাখা যেতে পারেনা।

জবাবঃ যেসব রাষ্ট্র কেবল আইনের বলে সমাজের পুনর্গঠন ও সংশোধনের চেষ্টা করেছে, তারা মানুষকে আইনের বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ করেছে বটে কিন্তু তাতে মানুষের সংশোধন ও কল্যাণের ক্ষেত্রে তারা কিছুমাত্র সফলতা অর্জন করতে পেরেছে কি? কেবলমাত্র ইসলামই সে আদর্শ যা মানুষের উপর আইন চাপিয়ে দেয়ার পরিবর্তে সরাসরি তার আত্মাকে সম্বোধন করে এবং তার মন ও বিবেক থেকে কাজের সূচনা করে। ইসলাম মানুষের মধ্যে এই অনুভূতি ও চেতনা সৃষ্টি করে যে, সে একটি দায়িত্বশীল সত্তা। স্বীয় কর্মকান্ডের জন্যে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। এভাবে ইসলাম প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে ভাল মন্দ, ন্যায় অন্যায়, এবং সত্য মিথ্যার পার্থক্য করার অনুভূতি সৃষ্টি করার পর তার কাছে

এই দাবী করে, সে যেন তার স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা যাবতীয় মন্দ এবং ভ্রান্ত জিনিসকে পরিহার করে এবং ন্যায় ও সঠিক জিনিসকে গ্রহণ করে।

কিছু কিছু লোক যদি ইসলামের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার গোটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমেও সংশোধন না হয়, তবে তাদের ব্যাপারে অনন্যোপায় হয়েই ইসলাম আইন প্রয়োগ করে। যাতে করে সমাজকে এইসব লোকের দুষ্কৃতি থেকে রক্ষা করা যায় এবং শৃংখলা ও সমাজ কাঠামো সুসংহত থাকে। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম সম্পদ উপার্জন ও সঞ্চয়ের ব্যাপারে যে আদর্শিক বিধি নিষেধ আরোপ করেছে তা সামাজিক সুবিচারের জন্যে নির্ভুল কর্মপন্থায় করেছে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অর্থনৈতিক সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা এবং ব্যক্তিকে অঢেল ধনী কিংবা অসহায় দরিদ্র হবার থেকে রক্ষা করার জন্যে এটাই সর্বোত্তম পন্থা। সমাজে যে কোনো ধরনের যুলুম ও অন্যায় হবার পথ বন্ধ করার পূর্ণ যোগ্যতা ইসলাম রাখে।

২৩১. ইসলামী রাষ্ট্রে যাকাত ও কর

প্রশ্নঃ ইসলামী রাষ্ট্র কি যাকাত উসুল করার পরও কর আরোপ করতে পারে?

জবাবঃ হ্যাঁ পারে। যাকাত ব্যয়ের খাততো নির্দিষ্টই রয়েছে। তা নির্ধারিত খাত ছাড়া অন্যকোনো খাতে ব্যয় করা যেতে পারেনা। এ জন্যে রাষ্ট্র তার অন্যান্য কাজের জন্যে কর আরোপ করতে পারে।

২৩২. পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য

প্রশ্নঃ মাওলানা! ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে পুঁজিবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে?

জবাবঃ পুঁজিবাদ কোনো মতবাদ বা ব্যবস্থা নয়। বরঞ্চ এ হচ্ছে একটি বিকৃতির নাম, যা ক্রমশ বাড়তে বাড়তে বর্তমান রূপ ধারণ করেছে। পুঁজিবাদের নিকট এমন কোনা আদর্শ বা মতবাদ নেই যা সে প্রচার করতে পারে। পক্ষান্তরে সমাজতন্ত্র এমন একটি ব্যবস্থা যা মানব সমস্যা সমাধান করার দাবী করে এবং অন্যদের নিকট নিজ আদর্শ প্রচার করে। আমাদের নিকট এদুটির উদাহরণ হচ্ছে, ধর্মীয় মিশন এবং মিশন বিহীন ধর্মের মতো। অমিশনারী ধর্মের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ করার প্রয়োজন আমাদের হয়না। কেননা সে আমাদের লোকদের নিকট

ধর্ম প্রচার করতে আসেনা। পক্ষান্তরে আমরা আমাদের ভূখন্ডে মিশনারী ধর্মের প্রতিবাদ করি। কেননা তাদের প্রতিবাদ না করলে আমাদের দেশেই তারা আমাদেরকে বিজিত করার চেষ্টা করবে।

২৩৩. দান এবং আত্মসম্মান

প্রশ্নঃ যাকাত, সদাকা এবং দান সম্পর্কে একটা সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। তা হলো এগুলোর অর্থ যারা গ্রহণ করে তাদের আত্মসম্মান আঘাতপ্রাপ্ত হয়। দীনি এবং নৈতিক দিক থেকে সমাজ যতোই উন্নত হোকনা কেন তারপরও দান সদাকা গ্রহণকারীদের অনুভূতির মধ্যে দুর্বলতা থেকেই যাবে। আরো বলা হয়, দান সদাকা সভ্য ও বিবেকবান মানব সমাজের জন্যে আদর্শ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অংশ হতে পারেনা।

জবাবঃ তা হলে আপনার দৃষ্টিতে কি সেটাই কি আদর্শ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যাতে কেউ কারো উপকারে আসবে না? না কি আপনি ঐটাকেই আদর্শ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মনে করেন, যাতে মানুষকে কলকব্জার মত ব্যবহার করা হয়? তাদের যাবতীয় প্রয়োজনও কলকব্জার মতই পূরণ করা হয় এবং মানুষ মানুষের উপকারে আসার সকল দুয়ার বন্ধ করে দেয়া হয়? অর্থাৎ মানুষের জন্যে মানুষের কোনো গুরুত্বই থাকেনা? হয়তো কেউ এটাকে আদর্শ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মনে করতে পারে। অথচ এহচ্ছে একটা মানবতা বিধ্বংসী ব্যবস্থা। এখানে মানুষের প্রতি মানুষের কোনো আকর্ষণ এবং সহানুভূতিই থাকেনা। এখানে মানুষ থেকে মানবতা শেষ হতে থাকে এবং তদস্থলে মেশিনধর্মীতা প্রবেশ করতে থাকে। এরূপ রাষ্ট্র মানবত্বকে এভাবে ধ্বংস করার অশুভ পরিণতি তখন স্বচক্ষে দেখতে পায়, যখন রাষ্ট্রের এই মেশিনারী ব্যর্থ হয়ে যায় এবং জাতির ঘাড়ে কোনো সাধারণ বিপদ চেপে বসে।

যেকোনো মানব সমাজে যে কোনো সময়ে এধরণের বিপদ আসতে পারে। মানুষ অনাহারে মরতে থাকতে পারে এবং রাষ্ট্রের হাতে রেশন পৌছাবার কোনো ব্যবস্থা না থাকতে পারে। কিংবা কোনো ঘটনায় বা দুর্ঘটনায় ব্যাপকভাবে মানুষ আহত হলো বা চরম দুর্ভোগে নিমজ্জিত হলো এবং তাদের জন্যে কোনো রিলিফ কাজ করা সরকারের জন্যে সম্ভব হলোনা। তখন অবশ্যি একজন মানুষ আরেক জন মানুষের উপকারে এগিয়ে আসা জরুরী হয়ে পড়ে। এখন প্রশ্ন হলো, তখন কি বিপদগ্রস্ত লোকদের আত্মসম্মান আঘাতপ্রাপ্ত হয়না। নিসন্দেহে

মানুষ এ ধরনের প্রয়োজন থেকে কখনো মুখাপেক্ষীহীন হতে পারেনা। কিন্তু আপনি যদি বছরের পর বছর সমাজের লোকদের এই শিক্ষা দিতে থাকেন যে মানুষ মানুষের উপকারে আসাটা একটা মন্দ কাজ এবং এতে মানুষের আত্মসম্মান আঘাতপ্রাপ্ত হয়। তবে এ ধরনের কোনো বিপদকালে আপনি তাদের থেকে শিক্ষার বিপরীত কোনো কাজ কেমন করে আশা করতে পারেন?

আজকাল কিছু লোক বলে বেড়ায়ঃ "আরে এটা একটা সমাজ হলো নাকি, যেখানে কিছু লোক খয়রাত দেয় আর কিছু লোক খয়রাত নেয়?" একথার অর্থ হলো, এমনটি করা যেন বিরাট অন্যায় কাজ। অথচ কোনো কৃত্রিম ব্যবস্থার মাধ্যমে যদি মানুষের অন্তরে একাজ সম্পর্কে এতোটা খারাপ ধারণা বসিয়ে দেন তবে যখন কোনো সর্বগ্রাসী বিপদ আসবে তখন মানুষের মধ্যে এমন কোনো চরিত্রই থাকবেনা যার ভিত্তিতে একে অপরের উপকারে আসতে পারে। কারণ প্রয়োজনের সময় অপরের সাহায্য করা যে একটা নেককাজ গোড়া থেকেই এধরনের কোনো শিক্ষা মানুষকে দেয়া হয়নি। সেকারণে একজন লোক স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করবে, যেহেতু আমার রেশনের উদ্বৃত্ত রুটি আমার নিকট রয়েছে সুতরাং সেটা কেবল আমারই। কেউ যদি নাখেয়ে মরতে থাকে তবে তার নিকট রেশন পৌছানোর দায়িত্ব সরকারের। আমি কেন তার ব্যাপারে চিন্তা করবো?

এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, পৃথিবীতে মেশিনের মানুষ বানানোর চেষ্টা করার চাইতে বড় কোনো বোকামী হতে পারে না। আর যারা এরূপ কথাবার্তা বলছে তারা মানবতাকে বুঝার চেষ্টা করেনি। তারা মানুষকে মানুষ মনে করে কথা বলেনা, বরঞ্চ এটাকে ভেড়ার পালের জন্যে খাদ্যের যোগান দেয়া মনে করে।

একজন লোক যখন আরেকজন লোককে সাহায্য করে তখন সাহায্য গ্রহণকারী এতে নিজেকে কিছুটা হালকা বোধ করে। এ জিনিসটাকেই হাদীসে বলা হয়েছে, 'গ্রহণকারী হাতের চাইতে দানকারী হাত উত্তম।' তাই একজন লোকের উচিত ততোক্ষণ পর্যন্ত তিনি দান গ্রহণ থেকে বিরত থাকবেন যতোক্ষণনা তিনি একান্ত বাধ্য হয়ে পড়েন। দ্বিতীয়ত, কিছু দান পেয়ে তিনি সরে যাবেননা, বরঞ্চ তিনি তৎপর হয়ে উঠবেন এবং নিজেকে এতোটা যোগ্য হিসাবে

গড়ে তোলার চেষ্টা করবেন যাতে করে যেভাবে তিনি দান গ্রহণ করেছিলেন সেভাবে দানও করতে পারেন।[১]

২৩৪. আদম (আঃ) কে সিজদা করার অর্থ

প্রশ্নঃ শয়তান এবং ফেরেশতারা কি দেহধারী? যদি দেহধারী না হয়ে থাকে তবে আল্লাহ যখন ফেরেশতাদের আদম (আঃ)কে সিজদা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তখন শয়তান যে হুকুম অমান্য করেছিলো এবং ফেরেশতারা সেজদাবনত হয়েছিল এসবই কি আলমে আরোয়াহে (রূহের জগত) সংঘটিত হয়েছিলো?

জবাবঃ সিজদর অর্থ শুধুমাত্র যমীনে কপাল স্থাপন করাই নয়, বরঞ্চ আনুগত্য করাও সিজদার অর্থ। যেমন, আপনারা কথাবার্তার সময় বলে থাকেন, অমুকে নতশিরে অমুকের কথা মেনে নিয়েছে। ফেরেশতাদের প্রতি আদম (আঃ)কে সিজদা করার যে হুকুম দেয়া হয়েছিল, তার অর্থ এটাই।

২৩৫. আল্লাহর ইচ্ছা এবং বান্দার ক্ষমতা

প্রশ্নঃ مَا اَصَابَكُم مِن مُصِيبَةٍ اِلاَّ بِاِذنِ اللّٰهِ ـ (আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোনো মুসীবত আপতিত হয় না) আয়াতটি তাফসীর করার সময় আপনি নিম্নোক্ত আয়াত দু'টির প্রতি লক্ষ্য রাখেননি। নিম্নোক্ত আয়াত দু'টি বাহ্যত উপরোক্ত আয়াতটির সাথে সাংঘর্ষিক মনে হয়ঃ

وَمَا اَصَابَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَت اَيدِيكُم

(তোমাদের উপর যে মুসীবতই আপতিত হয়, তা তোমাদেরই হাতের কামাই।)

ظَهَرَ الفَسَادُ فِى البَرِّ وَالبَحرِ بِمَا كَسَبَت اَيدِى النَّاسِ ـ

(মানুষের কর্মফলে জলেস্থলে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে।) মেহেরবাণী করে এই জটিলতা দূর করবেন।

জবাবঃ প্রথমোক্ত আয়াতটি সূরা তাগাবুনের আয়াত। এটি যে আলোচনা পরম্পরায় সন্নিবেশিত হয়েছে সেক্ষেত্রে এর চাইতে অধিক তাফসীর করার

---

১. আইন ২৩ জুন ১৯৬৮।

অবকাশ ছিলোনা। "সকল মুসীবত আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে" এই কথাটি "সকল মুসীবত এবং জলস্থলের বিপর্যয় মানুষের আমলের পরিণতি" কথাটির সাথে সাংঘর্ষিক নয়। একটি ঘটনা কখনো এক দৃষ্টিভংগিতে আল্লাহর প্রতি আরোপ করা হয়। সে ঘটনাটি আবার কখানো আরেক দৃষ্টিভংগিতে বান্দার প্রতি আরোপ করা হয়। যেমন কোনো ব্যক্তি যখন নেক কাজ করে তখন আপনারা বলেন, আল্লাহ্ তাআলা তাকে তৌফিক দিয়েছেন বলেই সে একাজ করতে পেরেছে। তাহলে তৌফিকদানের বিষয়টি আল্লাহর প্রতি আরোপিত হলো আর কর্ম নির্বাচন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ তো ব্যক্তির কাজ। একইভাবে কোনো ব্যক্তি গুণাহর কাজ করে। এক্ষেত্রে কাজটির সিদ্ধান্ত ব্যক্তি নিজে নেয়। যদিও আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত সে ঐকাজের দিকে একটি কদমও উঠাতে পারে না। এভাবে আল্লাহর ইচ্ছা এবং বান্দার স্বাধীনতা পাশাপাশি কাজ করে।

২৩৬. আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার তাৎপর্য

প্রশ্নঃ কুরআনে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে আল্লাহ তার অন্তরকে হিদায়াত দান করেন।" অনুগ্রহ করে আয়াতটির তাৎপর্য বলুন। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে তার অন্তরকে হিদায়াত দান করার অবস্থাটা কি? আল্লাহর প্রতি ঈমানই তো অন্তরের প্রকৃত হিদায়াত।

জবাবঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা বা না আনার ব্যাপারে কুরআনে স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে, ঈমান আনা বা কুফরী করা ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। ইচ্ছা করা বা না করার দায়িত্ব মানুষের। তাকে গ্রহণ বর্জনের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। তাই কোনো ব্যক্তি যখন নিজের ইচ্ছায় আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে তখন আল্লাহ্ তাআলা তার পথ প্রশস্ত করে দেন। কিন্তু সে যদি ঈমান না আনতে চায় সে ক্ষেত্রে তার হিদায়াতের কোনো সুযোগই থাকে না।

২৩৭. বাধ্য হবার অবস্থা

প্রশ্নঃ একটি লোক খুবই দরিদ্র। মেয়ে বিয়ে দেয়ার টাকা তার নেই। বর্তমানে এমন কোনো ছেলে পাওয়া কঠিন, যে আত্মত্যাগ করে বিয়েতে রাজি হয়। এরূপ 'বাধ্য হবার' অবস্থায় দরিদ্র ব্যক্তি সুদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করতে পারে কি?

জবাবঃ কোনো ব্যক্তি যখন খাদ্যের অভাবে তিন দিন ক্ষুধার্ত থাকার পর হারাম ভক্ষণ করা ছাড়া বেঁচে থাকার কোনো পথ দেখেনা, সেটাকে বাধ্য হবার

অবস্থা বলে। কামনা বাসনার দাবীকে বাধ্য হবার অবস্থা বলেনা। এরূপ অবস্থাকে বাধ্য হবার অবস্থা বলা বৈধ নয়।

মেয়ে বিয়ে দেয়ার সময় লোকেরা এমন ছেলে তালাশ করে যার জীবন যাপনের মান হতে হবে উঁচু দরের। ছেলের ব্যাপারে পাত্রীপক্ষের যদি এধরণের কোনো চিন্তা বা শর্ত না থাকে তবে তার জন্যে বাধ্য হবার অবস্থাও সৃষ্টি হয়না। সমাজে এরকম অনেক নেক ও ভদ্র ছেলে রয়েছে যারা বিয়েতে যৌতুক চায়না।

২৩৮. নামাযে মনোযোগ ছুটে যাওয়া

প্রশ্নঃ নামায পড়ার সময় মনের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কল্পনা এসে উঁকি মারে। এতে কোনো কোনো সময় নামায ভুলও হয়ে যায়। অনুগ্রহ করে এর প্রতিকার বলে দিবেন কি?

জবাবঃ আল্লাহর প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি করা ছাড়া এধরনের কল্পনা ও শংসয়ের আর কোনো প্রতিকার নেই আর বুঝে বুঝে কুরআন পড়া, সৎ ব্যক্তিদের সাথীত্ব গ্রহণ করা এবং মনোযোগের সাথে দীনের কাজ করার মাধ্যমেই আল্লাহর প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হতে পারে। এগুলোর মাধ্যমেই আল্লাহর প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। আর এই আকর্ষণ ও প্রভাব নামাযে অনুভূত হয়। এতে করে বর্হিমুখী চিন্তা কল্পনার সমাবেশও ধীরে ধীরে কমে যেতে থাকে। মনে রাখবেন, নামায হচ্ছে মানুষের এমন একটা অবস্থা যা শয়তানের কাছে সবচাইতে অসহ্য। তাই নামাযের উপরেই শয়তান সবচাইতে শক্তিশালী হামলা চালায়। সে নামাযী ব্যক্তির মনোযোগ ভিন্নপথে ধাবিত করার চেষ্টা করে। তাই শয়তানের মোকাবেলা করা মানুষের কর্তব্য। আর মোকাবেলা করে নিজের মনোযোগকে আল্লাহর প্রতি নিবদ্ধ করে রাখার চেষ্টা করা মানুষের কর্তব্য। এই চেষ্টা সাময়িক এবং হালকা ধরনের হলে চলবেনা। বরঞ্চ এটাতো হবে অবিরাম চেষ্টা সংগ্রাম। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই তো মানুষ চেষ্টা সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। নামাযও তারই একটা অংশ। এখানেও সেরকম চেষ্টা সংগ্রাম চালানো উচিত। যেভাবে জীবনের অন্যান্য কাজে চেষ্টা সংগ্রাম চালানো হয়। অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো কল্পনা মনে উদিত হলে সেটা আল্লাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু ইচ্ছকৃতভাবে ভাবনা চিন্তার জগতে প্রবেশ করা যাবেনা এবং কল্পনার জগতে নিমগ্নও থাকা যাবেনা। আপনার সর্বাত্মক চেষ্টা থাকতে হবে আপনার মনের কোণে কোনো কল্পনা উদিত হলে আপনি যেন সেদিকে মনোযোগ না দেন। চিন্তা কল্পনা থেকে মনকে

রক্ষা করার আরেকটি সফল পন্থা হচ্ছে এই যে, আপনি নামাযে যাকিছু পড়েন ও বলেন তার অর্থ ও তাৎপর্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখুন। নামাযে যা পড়ছেন এবং বলছেন সেদিকে মনোনিবেশ করুন।

২৩৯. খালি মাথায় নামায পড়া

প্রশ্ন ঃ খালি মাথায় নামায পড়ার ব্যাপারে আপনার মত কি?

জবাব ঃ নামাযে মাথা ঢাকার ব্যাপারে কোনো অকাট্য হুকুম নেই। হাদীসে এব্যাপারে স্পষ্ট কোনো কথা পাওয়া যায়না। কিন্তু অপরদিকে নবী করীম (সাঃ) এবং সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) কখনো খালি মাথায় নামায পড়েছেন বলে জানা যায়না। এব্যাপারে মধ্যপন্থা হচ্ছে মানুষের উচিত খালি মাথায় নামায না পড়া। কিন্তু কেউ যদি খালি মাথায় নামায পড়ে তবে তার বিরুদ্ধে কঠোরতা অবলম্বন না করা।[১]

২৪০. কবর সমতল করা

প্রশ্ন ঃ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, নবী করীম (সাঃ) নিজেই কবরের চিহ্ন অবশিষ্ট রাখতেন। অন্যদিকে তিনি কবর সমতল করার নির্দেশ দিয়েছেন বলেও হাদীস থেকে জানা যায়। এদুটি জিনিস সাংঘর্ষিক নয় কি?

জবাব ঃ মদীনায় গিয়ে ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করার পর নবী করীম (সাঃ) কবর সমতল করার নির্দেশ প্রদান করেন। যেসব কবর তিনি সমতল করার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন, সেগুলো ছিলো জাহেলী যুগের কবর। এসব কবর ইসলামী ছাঁচের কবরের সাথে বেমিল থাকার ফলেই তিনি এনির্দেশ প্রদান করেছিলেন। যে হাদীস থেকে এই নির্দেশটি জানা যায়, সে হাদীসে এঘটনাও উল্লেখ হয়েছে যে, নবী করীম (সাঃ) প্রথমে একজন সাহাবীকে মদীনার কবরসমূহ সমতল করার নির্দেশ প্রদান করলে তিনি অমুসলিম বসতীতে ফিতনা সৃষ্টি হবার ভয়ে সে নির্দেশ পালন করতে সাহস পাননি। পরে তিনি হযরত আলীকে (রাঃ) একই নির্দেশ প্রদান করেন। হযরত আলী (রাঃ) তাঁর নির্দেশ পালন করেন এবং কবরসমূহ সমতল করে রেখে আসেন। অতপর হযরত আলী (রাঃ) খলীফা মনোনিত হবার পর তিনি কুফার গভর্নরকে একই নির্দেশ প্রদান

---

[১] এশিয়া লাহোর ৭ অক্টোবর ১৯৬৭ইং।

করেন। সম্ভবত কুফায় অমুসলমানদের কবর উঁচু ছিলো। আবার এমনও হতে পারে যে, মুসলমানরা সেখানে ইসলামী রীতির তোয়াক্কা না করেই উঁচু কবর তৈরী করেছিলো।

২৪১. যাকাত ও পুঁজিবাদ

প্রশ্ন : সাধারণত বলা হয়ে থাকে, যাকাতের মাধ্যমে পুঁজিবাদ খতম হতে পারে। কিন্তু যাকাতের পরিমাণের প্রতি তাকালে একথা মেনে নেয়া কঠিন। কারণ দাউদ ইস্পাহানীদের মতো পুঁজিবাদীরা যাকাত দিতে শুরু করলেই কি তাদের পুঁজিবাদী অবস্থা শেষ হয়ে যাবে?

জবাব : যারা বলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা খতম করার জন্যে যাকাত আরোপ করা হয়েছে তাদের কথা নিতান্তই ভুল। পুঁজিবাদ নয় বরঞ্চ দারিদ্র খতম করার জন্যে যাকাত ফরয করা হয়েছে। কেউ যদি আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থান করে সম্পদ উপার্জন করে কোটিপতিও হয়ে যায় তবে সেটা তার প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। এটা কোনো দোষ বা শরীয়ত বিরোধী কাজ নয়। সেই ব্যক্তির জন্যে ফরয হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা তার সম্পদে গরীবদের জন্যে যে অধিকার আইনের মাধ্যমে নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা বের করে দেয়া।

২৪২. যাকাত এবং ঋণ

প্রশ্ন : কিছু যাকাতদাতা ব্যবসায়ী এমন আছে, যারা তাদের গরীব ঋণ গ্রহীতাদেরকে নিজেদের যাকাতের টাকা প্রদান করে সেটাকা ঋণ বাবদ উসূল করে নেয়। এভাবে কি যাকাত পরিশোধ হয়ে যায়?

জবাব : হ্যাঁ, এভাবে যাকাত পরিশোধ হয়ে যায়। এতে কোনো দোষ নেই।

২৪৩. জাকাত এবং নোট

প্রশ্ন : নোটের (টাকার) মাধ্যমে যাকাত পরিশোধ করলে যাকাত আদায় হয়ে যায় কি? নোটতো মাল নয় বরং মালের সনদ। অথচ যাকাত ফরয হলো মালের।

জবাব : এধরনের বাহানা খোঁজা ঠিক নয়। আপনি দোকান থেকে মাল ক্রয় করার পর দোকানদারকে মালের সনদই (নোট) প্রদান করেন। দোকানদারও

মালের বিনিময়ে আপনার কাছে মাল দাবী করেনা। যাকাত প্রদানকালে আপনার মনে এপ্রশ্ন জেগেছে। কোনো বিষয়ের সমাধান পাবার জন্যে প্রশ্ন জাগা অন্যায় নয়।

২৪৪. ট্যাক্স ও যাকাত

প্রশ্ন ঃ সরকারকে যে ট্যাক্স দেয়া হয় সেটা আয়ের মধ্যে গণ্য হবে কি এবং সেটারও যাকাত দিতে হবে কি?

জবাব ঃ সবধরনের খরচের পর আপনার কাছে যে অর্থ সম্পদ অবশিষ্ট থাকবে, কেবল সেটার যাকাত দেয়াই ফরয।

২৪৫. যানবাহন ও যাকাত

প্রশ্ন ঃ সাইকেল, স্কুটার, মটরকার প্রভৃতি যানবাহনের যাকাত দিতে হবে কি? না কি এগুলো যাকাতের আওতামুক্ত?

জবাব ঃ এগুলো যদি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে হয়ে যাকে তবে সেগুলো যাকাতের আওতামুক্ত আর যদি এগুলি ব্যবসা পরিচালনার জন্যে হয়ে থাকে এবং ব্যবসা সমগ্রীর অন্তর্ভূক্ত হয় তবে সেগুলোর উপর যাকাত আরোপিত হয়।

২৪৬. জ্বিন এবং পরকালীন পুরস্কার

প্রশ্ন ঃ জ্বিনেরা ইবাদত করতে এবং ইসলামের অনুশাসন মেনে চলতে নির্দেশপ্রাপ্ত। এমতাবস্থায় তারা পরকালে এর বিনিময়ে বেহেশত পাবার কোনো প্রমাণ আছে কি?

জবাব ঃ জ্বিনেরা যেহেতু ইবাদতের নির্দেশ প্রাপ্ত সেহেতু তারা এর বিনিময়ে জান্নাত পাবে বলে প্রমাণ হয়। যেভাবে মানুষের আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার শাস্তি হলো জাহান্নাম, তেমনি জ্বিনেরা যদি আল্লাহর হুকুম অমান্য করে তবে তারাও জাহান্নামে যাবে। কুরআন এবং হাদীসে যদিও অকাট্যভাবে একথা বলা হয়নি তারা জান্নাতে যাবে। তবুও যুক্তি এবং বিবেক বুদ্ধির কাছে তাদের জান্নাতে যাবার বিষয়টি পরিষ্কার।

২৪৭. মৃতরা কি শোনে

প্রশ্ন ঃ "আল্লাহ তাআলা মৃতলোকেরা যা ইচ্ছা করেন শোনেন, আর যা ইচ্ছা করেননা তা শোনেন না।" কথাটির ব্যাখ্যা পরিষ্কার করলে কৃতজ্ঞ হবো। কথাটির উৎস কি তাও বলবেন।

জবাব ঃ কুরআন এবং হাদীস উভয়টিই একথার উৎস। আপনি মনোযোগ সহকারে কুরআন হাদীস অধ্যয়ন করলে জানতে পারবেন, মৃত্যুরপর ঈমানদাররাও সবকিছু শোনেন আবার কাফেররাও সবকিছু শোনেন। একথাতো সকলের কাছে পরিষ্কার যে, মৃত ব্যক্তিরা দুই ধরনের হয়ে থাকেঃ

এক, সৎলোক, যারা মেহমান হিসেবে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়েছে।
দুই, পাপিষ্ঠ লোক, যারা অপরাধী হিসেবে উপস্থিত হয়েছে।

এখন চিন্তা করলে দেখা যাবে সাধারণ বিবেক বুদ্ধির কাছেও একথা পরিষ্কার যে, আল্লাহ তাআলা তার মেহমানদের এমন কোনো কথা শোনাতে পারেননা যাতে তাদের মনে দুঃখ এবং কষ্ট হতে পারে। বরঞ্চ এটাই স্বাভাবিক যে, পৃথিবীতে তাদের যে প্রশংসা হয় এবং তাদের নিকট সোয়াব পৌছানোর জন্যে যে দোয়া করা হয়, সেসব কথাই তাদের নিকট পৌছানো হয়। পক্ষান্তরে পাপিষ্ঠ লোকদের প্রশংসায় যদি পৃথিবীতে শ্লোগান এবং মিছিল উত্থিত হয় তবুও সেগুলো তাদের শোনানো হবেনা। বরঞ্চ তাদের প্রতি যেসব নিন্দা ও অভিশাপ বর্ষিত হয় সেগুলোই তাদের শোনানো হয়।

২৪৮. রাসূলের রওজায় চিল্লা

প্রশ্ন ঃ আপনি বলেছেন, কোনো সাহাবী রাসূলুল্লাহর (সাঃ) কবরে যাননি এবং সেখানে কোনো চিল্লাও কাটাননি। তাহলে মুসলমানদের তাঁর করবে গিয়ে লাভ কি?

জবাব ঃ কোনো সাহাবী রাসূলুল্লাহর (সাঃ) কবরে যাননি একথাতো আমি কখনো বলিনি। বরং আমি একথা বলেছিলাম কোনো সাহাবী রাসূলুল্লাহর (সাঃ) কবরে চিল্লা কাটাননি।

২৪৯. দাফন কাফন

প্রশ্ন ঃ যেহেতু কুরআন ফায়সালা শুনিয়ে দিয়েছে যে, মানুষকে পুনরুত্থিত করা হবে। তাহলে মানুষের কাফন দাফনের প্রয়োজন কি?

জবাব ঃ দাফন কাফনের ব্যবস্থা মূলত দেহকে সংরক্ষণ করে রাখার জন্যে নয়। বরঞ্চ এটা মানুষের একটা স্বভাবগত আকাংখা বা দাবী। আদমের (আঃ) একপুত্র যখন তার ভাইকে হত্যা করলো তখন লাশটা সে কি করবে তা সে বুঝতে পারছিলোনা। সেসময় তার দৃষ্টি পড়লো একটি কাকের উপর। কাকটি অপর একটি মৃত কাককে যমীনে গর্তখুঁড়ে দাফন করছিলো এবং অনুরূপভাবে সে যেন তার ভাইকে দাফন করে সেদিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলো। প্রকৃতপক্ষে এটা হচ্ছে মানবাত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন। যে ব্যক্তি কিছু সময় পূর্ব পর্যন্ত বেঁচে থাকা লোকদের সাথে পিতা পুত্রের বা অনুরূপ অন্যকানো মহব্বতের সম্পর্ক রাখতো, এখন মৃত্যুর সাথে সাথে নিজেদের হাতে আগুনে পুড়িয়ে তার ভষ্মিভূত দেহ বাতাসে উড়িয়ে দেয়াটা চরম পাষাণ্ডতা ছাড়া আর কিছুই হতে পারেনা। মানবাত্মার দাবী হচ্ছে, সময় উপস্থিত হলে যমীনের আমানত সম্মান ও মহব্বতের সাথে হুবহু যমীনকে ফিরিয়ে দেয়া।

২৫০. অনেক মৃতের একত্র জানাযা

প্রশ্নঃ আমাদেরকে মাসয়ালা দেয়া হয়েছে, বহু মৃতের জন্যে এক জানাযাই যথেষ্ট।

জবাবঃ এমনটি নিষিদ্ধও নয়, জরুরীও নয়। এক জানাযাও চলে, আবার প্রত্যেকের জন্যে পৃথক পৃথক জানাযাও পড়া যেতে পারে। ওহুদের শহীদদের প্রতি মহব্বত ও সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নবী করীম (সাঃ) তাদের প্রত্যেকের জানাযা পৃথক পৃথক পড়িয়েছিলেন।

২৫১. চক্ষুদান

প্রশ্নঃ মরোনোত্তর চক্ষুদানের ব্যাপারে আপনার মত কি?

জবাবঃ মৃত্যু পথের যাত্রী নিজেকে নিজের দেহের মালিক মনে করে। অথচ মৃত দেহের মালিক সে নয়। মৃতের উত্তরাধীকারীরাও তার দেহের মালিক নয়।

বিধানগত দিক থেকে তারা কেবল তার কাফন দাফনের দায়িত্বশীল। তাই তারাও তার দেহ কিংবা দেহের কোনো অংশ দান বা বিক্রি করার বৈধ কর্তৃপক্ষ নয়। মানবদেহের সাথে এরূপ আচরণ করা শরীয়ত বিরোধী বলেই মনে হয়।

২৫২. বেহেশত এবং দুঃখ সুখ

প্রশ্নঃ বেহেশতের জীবনে তো সুখের সীমা থাকবেনা।কিন্তু কথা হচ্ছে, যেখানে সুখের সাথে দুঃখ, আরামের সাথে কষ্ট এবং জীবনের সাথে মৃত্যু থাকেনা, সেখানে সুখ মানুষ কিভাবে অনুভব করবে? মানুষের প্রকৃতি তো এমন যে, এক অবস্থা বেশী দিন তার কাছে ভাল লাগেনা।

জবাবঃ (মাওলানা কৌতুক করে বললেন) এধরণের লোকেদের বেহেশতে যাবার পর আল্লাহর কাছে দরখাস্ত করা উচিত, তিনি যেন তাদেরকে কিছুদিনের জন্যে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেন, যাতে করে তারা জাহান্নামের শাস্তির স্বাদ ভোগ করে এসে নিশ্চিন্তে বেহেশতের সুখ উপভোগ করতে পারে।

২৫৩. জান্নাতে ইবাদত

প্রশ্নঃ জান্নাতে ইবাদত করার পন্থা কি রকম হবে?

জবাবঃ সে সম্পর্কে কোনো ধারণা করা সম্ভব নয়। পৃথিবী পরীক্ষাগার। তাই এখানে মানুষের উপর দায়িত্ব ও কর্তব্যের বন্ধন আরোপ করা হয়েছে। জান্নাতের জীবন হবে এর চাইতে ভিন্নতর। সেখানে না কর্তব্য থাকবে আর না নিষেধাজ্ঞা। কোনো প্রকারের বিধি নিষেধ ছাড়াই বেহেশতবাসীরা ভ্রান্ত কাজ থেকে মুক্ত থাকবে। তারা সুস্থ ও বিশুদ্ধ বাসনার অধিকারী হবে। তাদের মধ্যে কোনো মন্দ বাসনা থাকবেনা। তারা হবে সুশীল, বিনীত, নম্র ও শিষ্ট। যাবতীয় অশিষ্টতা থেকে তারা হবে মুক্ত। তারা তাদের প্রকৃতিগত ইচ্ছা আকাংখা দ্বারাই আল্লাহর ইবাদত করবে। এখানে বসে সে জীবন সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব নয়।

২৫৪. মানুষ এবং ফেরেশতা

প্রশ্নঃ মানুষের সাথে যেসব ফেরেশতা রয়েছে তারা প্রত্যহ পরিবর্তণ হয় বলে শুনেছি, একথা কি ঠিক?

জবাবঃ যারা এমাসয়ালা বয়ান করেছে তারা কিভাবে বিষয়টি জানলো তা আমার জানা নেই। কুরআন থেকে কেবল এতোটুকুই জানা যায়, দু'জন ফেরেশতা মানুষের আমলনামা লেখার জন্যে নিযুক্ত রয়েছে।

২৫৫. বরকত কি?

প্রশ্নঃ বরকত কি জিনিস? আর এর ফলাফলই বা কিভাবে প্রকাশ পায়?

জবাবঃ বহু জিনিস এরকম আছে যেগুলোর সংজ্ঞা দেয়া সম্ভবনয়। বরকতের আসল অর্থ বর্ধন এবং প্রাচুর্য। আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকতের অর্থ হলো, কল্যাণে আধিক্য এবং প্রাচুর্য। যেমন এক ব্যক্তি একশ' টাকা বেতন পায়। আল্লাহ তাআলা তার একশ' টাকার এতোটা প্রাচুর্য ও প্রবৃদ্ধি দান করেন যে, সে সুন্দরভাবে তা দিয়ে তার পরিবার চালিয়ে নেয়। বিপরীত পক্ষে একব্যক্তি পাঁচশ' টাকা বেতন পায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার পরিবার চলেনা। এটা প্রকৃতপক্ষে হালাল রুজি ও রিযিকে আল্লাহ প্রদত্ত বরকতের ফল।

২৫৬. লোহার আংটি এবং নামায

প্রশ্নঃ শুনলাম লোহার আংটি বা ষ্টীলের চেইনযুক্ত ঘড়ি পরে নামায পড়া মকরূহ। এর কারণ কি?

জবাবঃ এগুলো প'রে নামায পড়া মকরূহ নয়। তবে পুরুষদের জন্যে সোনার জিনিস ব্যবহার করা হারাম। এভাবে তন্ন তন্ন করে কমরূহ খুঁজে বেড়ানো ঠিক নয়।

২৫৭. দোযখ অস্থায়ী না স্থায়ী

প্রশ্নঃ দোযখ সাময়িক না স্থায়ী?

জবাবঃ কুরআনের বর্ণনাভংগি থেকে দোযখ স্থায়ী বলেই মনে হয়। যেভাবে বেহেশত স্থায়ী, তেমনি দোযখও স্থায়ী। অবশ্য দোযখের শাস্তি সব সময় একরকম হবেনা। যেমন 'আযাবে শাদীদ' (কঠোর শাস্তি) স্থায়ী হবেনা। অবশ্য দোযখে থাকাটাই একটা বিরাট শাস্তি।

২৫৮. রাসূলের জানাযা পড়ানো এবং ক্ষমা

প্রশ্নঃ আপনি বলেছেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক কারো জানাযার নামায পড়ানো তার ক্ষমা লাভের কারণ হবে। তাহলে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর ক্ষেত্রে ক্ষমা লাভের কারণ হয়নি কেন?

জবাবঃ রাসূলুল্লাহর (সাঃ) জানাযা পড়ানো দ্বারা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর যে কোনো লাভই হবেনা একথা তখনই তিনি পরিষ্কার বলে গেছেন। কারণ আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ঈমানদারদের অন্তর্ভূক্ত ছিলোনা। আলোচ্য হদীসগুলোতে যে কথাটি বলা হয়েছে তা হলো রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক ঈমানদারদের জানাযা পড়ানোটা তাদের ক্ষমা লাভের কারণ হবে। যার অন্তরে ঈমানই নাই তার জন্যে রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সুপারিশ ক্ষমা লাভের কারণ হতে পারেনা।

২৫৯. জানাযা এবং ক্ষমা

প্রশ্নঃ আপনি দারসে হাদীসে বলেছেন, চল্লিশ বা একশ' নেক্‌কার বান্দা কর্তৃক জানাযা পড়া মৃত ব্যক্তির জন্যে ক্ষমা লাভের কারণ। অথচ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর কন্যা ফাতিমা (রাঃ) কে বলেছেন, 'নিজের মুক্তির চিন্তা নিজে করো। আল্লাহর পাকড়াও থেকে কেউ তোমাকে বাঁচাতে পারবেনা।' তবে কি হযরত ফাতিমার (রাঃ) জানাযা পড়ার জন্যে চল্লিশ বা একশ ব্যক্তিকে সংগ্রহ করা সম্ভব ছিলনা?

জবাবঃ রাসূলুল্লাহর (সাঃ) বক্তব্যের এধরণের বৈপরিত্য খুঁজে বেড়ানো ঠিক নয়। ফাতিমা (রাঃ) কে তিনি যে কথা বলেছিলেন, তার অর্থ হলো, 'আমার কন্যা হওয়াটা তোমার পরকালীন মুক্তি লাভের জন্যে কোনো কাজে আসবেনা। নিজের মুক্তি ও ক্ষমা লাভের চিন্তা নিজে করো।' এই একই কথা তিনি নিজের ফুফু সুফিয়াকেও বলেছিলেন। একথার তাৎপর্য হলো এই যে, তোমারা যদি সত্যিকার মুমিন হতে পারো তবেই তোমাদের নবীর সাথের সম্পর্ক কাজে আসবে। নতুবা সেদিন এ আত্মীয়তা কোনো কাজে আসবেনা।

২৬০. কুরআন ও শপথ

প্রশ্নঃ কুরআনে অনেক কিছুর শপথ করা হয়েছে। যেমন 'আসরের শপথ' 'ধাবমান ঘোড়ার শপথ' 'বাতাসের শপথ' প্রভৃতি। এসব শপথের তাৎপর্য কি?

জবাবঃ সাক্ষ্য হিসাবে এসব শপথ করা হয়েছে। যেমন আপনারা বলে থাকেন, ঠান্ডা বাতাসের কসম খেয়ে বলছি, সাংঘাতিক শীত পড়ছে। এরূপ শপথ দ্বারা আপনি যেন ঠান্ডা বাতাসকে শীতের তীব্রতার সাক্ষ্য হিসাবে পেশ করছেন। ঠিক একইভাবে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি জগতের বিভিন্ন দৃশ্যের শপথ করেছেন। কারণ এগুলো তাঁর অসীম ক্ষমতার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য।

২৬১. গায়রে মুহাররমের কফিন

প্রশ্নঃ কোনো গায়রে মুহাররম পুরুষ কর্তৃক কোনো গায়রে মুহাররম নারীর কফিন বহন করা বৈধ কি?

জবাবঃ হ্যাঁ বৈধ। যদি বৈধই না হতো, তাহলে যেসব গাড়ী এবং বাস গায়রে মুহাররম পুরুষরা চালায়, সেগুলোতে গায়রে মুহাররম নারীদের আরোহন করা বৈধ হতোনা।

২৬২. নামায এবং কবর

প্রশ্নঃ আপনার বিগত দারস থেকে রাসূলুল্লাহর (সাঃ) কবরে জানাযা পড়ার কথা জানতে পারলাম। তাহলে সেখানে অন্যান্য নামায পড়া যাবেনা কেন?

জবাবঃ জানাযার নামাযে রুকূ এবং সিজদা নেই। অথচ অন্যান্য নামাযে রুকূ এবং সিজদা রয়েছে। আপনি যদি কবরের দিকে ফিরে নমাযের আরকান (যেমন রুকূ সিজদা ইত্যাদি) আদায় করেন তবে আপনি যেন তাঁর পূঁজা করলেন।

২৬৩. মে'রাজ এবং জাহান্নাম

প্রশ্নঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মে'রাজে গিয়েছিলেন তখন বিভিন্ন স্থানে তাঁকে জাহান্নামের চিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে। এর পেছনে কি রহস্য রয়েছে?

জবাবঃ মে'রাজ সংক্রান্ত যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তাতে এবিষয়টির কোনো ব্যাখ্যা নেই। হতে পারে সেটা অন্যকোনো পৃথিবীর মানব গোষ্ঠীর দোযখ, যাদের কিয়ামত অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং শাস্তি ও পুরস্কারের ফায়সালা সম্পন্ন করা হয়ে গেছে। কিংবা ভবিষ্যতে যা হবে তার চিত্র তাঁকে দেখানো হয়েছে। কুরআনে অকাট্যভাবে একথা বলা হয়েছে, কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবার

পরই মানুষ জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তাই এ সংক্রান্ত হাদীসগুলোর বিশ্লেষণ কুরআনের বক্তব্য ও ভাবধারার দৃষ্টিতেই করতে হবে।

২৬৪. কুরআন হাদীসের সাথে বিদ্রুপ

প্রশ্নঃ কোনো ব্যক্তি যদি রাগের বশবর্তী হয়ে বা তামাশাচ্ছলে কুরআন, হাদীস কিংবা পরকালের শাস্তি বা পুরস্কার অস্বীকার করে, কিংবা যদি বলে, শাস্তি ও পুরস্কারের ধারণা তো কেবল মানুষকে ভয় দেখানোর জন্যেই দেয়া হয়েছে আসলে এগুলো কিছু হবেনা। এমন লোকের কি অবস্থা হবে?

জবাবঃ এটা সাংঘাতিক গুণাহর কাজ। এজন্যে তাকে কঠোরভাবে পাকড়াও করা হবে। এটা কোনো তামাশা করার বিষয় নয়। কোনো ব্যক্তি যদি মজলিশে বসে নিজের বাবা মাকে নিয়ে তামাশা করা পছন্দ না করে, তবে আল্লাহর সাথে তামাশা করার সাহস কোথা থেকে পায়। একইভাবে যে ব্যক্তি রাগকে দমন না করে শাশ্বত সত্য ব্যাপারসমূহকে অস্বীকার করে বসে, তাকে নিজের বিষয়ে চিন্তা করা উচিত। সেতো রাগের বশবর্তী হয়ে মানুষ হত্যা করতে পারে। যে ব্যক্তি বলে শাস্তি ও পুরস্কার তো কেবল ভয় দেখানোর জন্যে, সেতো আসলে আল্লাহকে অপবাদ দেয়।

২৬৫. শিশুদের জান্নাত

প্রশ্নঃ আপনি দারসে কুরআনে বলেছেন , শিশুরাও জান্নাতে যাবে। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, অমুসলমানদের শিশু সন্তানরাও কি জান্নাতে যাবে?

জবাবঃ রাসায়েল ও মাসায়েল ৩য় খন্ডে এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছি। সেটা দেখে নিন। কোনো কোনো হাদীস থেকে জানা যায় অমুসলমানদের শিশু সন্তানরাও পিতা মাতাদের সাথে জাহান্নামে যাবে। কিন্তু কোনো কোনো হাদীস এর বিপরীত।

২৬৬. পৃথিবীর নেককার নারী এবং হুর

প্রশ্নঃ আপনি বলেছেন, এ পৃথিবীর পবিত্র ও নেক্কার নারীরাই হবে হুর। কিন্তু বক্তব্য পরম্পরা থেকে একথাটা স্পষ্ট হয়না।

জবাবঃ এপৃথিবীর নেককার নারীরাই হুর হবে একথা আমি অকাট্যভাবে বলিনি। এপৃথিবী থেকে যেসব বালিকা প্রাপ্তবয়স্ক হবার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে হয়তো বা তারাই বেহেশতের হুর হবে। কিংবা এমনও হতে পারে যে, এ পৃথিবীরই পবিত্র নেককার নারীদেরকে কুমারীরূপে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। অথবা এমনও হতে পারে যে হুরেরা হবে আল্লাহ তাআলার নতুন সৃষ্টি। অবস্থা এর যেটিই হোকনা কেন, একথা পরিষ্কার যে তারা হবে এমন সৃষ্টি যাদের প্রতি এপৃথিবীতে মানুষ প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে।

২৬৭. জান্নাত এবং বংশবৃদ্ধি

প্রশ্নঃ বেহেশতে ঘর সংসার করার ফলে বংশবৃদ্ধি হবে কি?

জবাবঃ (মাওলানা রসিকতা করে বলেন) জ্বী না। সেখানে পূর্ণাংগ পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি কার্যকর থাকবে। মানুষ খুবই তাড়াহুরাকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে। সে পৃথিবীতেই সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছে।

২৬৮. পাকা কবরের অসীয়ত

প্রশ্নঃ কেউ যদি মরার সময় তার কবর পাকা করার অসীয়ত করে যায়, তবে তা পালন করা কি জায়েয?

জবাবঃ শরীয়তে যেসব অসীয়ত বৈধ নয় সেগুলো পালন করাও বৈধ নয়। যেমন কেউ যদি মৃত্যুর সময় উত্তরাধিকার আইনের রদবদল করতে চায় কিংবা নারীদেরকে তার জন্যে শোক গাঁথা গাইতে বা বিলাপ করতে অসীয়ত করে যায়,তবে যেহেতু এগুলো শরীয়ত বিরোধী কাজ সেহেতু এগুলো পালন করা যাবেনা।

২৬৯. কবরে লিপি লাগানো

প্রশ্নঃ কবরে লিপি লাগানোতে দোষ আছে কি? নবী করীমও (সাঃ) তো কবরে পাথর স্থাপন করেছিলেন।

জবাব ঃ কোনো মুসলমান যখন শুনবে যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অমুক কাজ নিষেধ করেছেন, তখন সে নিষেধাজ্ঞার কারণ জানার অধিকার তার থাকেনা।

স্বয়ং শরীয়ত প্রণেতা (সাঃ) যদি সেটার কারণ বলে দিয়ে থাকেন, তবে এটা আমাদের প্রতি তার একটা বিরাট অনুগ্রহ। আর যদি কারণ না বলে থাকেন, তবে কোনো প্রকার উচ্চ বাচ্চ্য না করে তাঁর হুকুম পালন করাই আমাদের কর্তব্য।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত উসমান ইবনে মাযউনের (রাঃ) কবরে যে পাথর স্থাপন করেছিলেন তা নেহাত একটি চিহ্ন হিসেবে করেছিলেন। আর সম্ভবত তিনি মদীনায় মুসলমানদের প্রথম মৃত ব্যক্তি হবার ফলে কবরস্থানে অমুসলমানদের কবর থেকে তাঁর কবরকে পৃথক করার জন্যে রাসূল (সাঃ) একাজ করেছিলেন।

২৭০. দাফনের পর চল্লিশ কদম

প্রশ্নঃ লোকেরা মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর চল্লিশ কদম এসে দোয়া করে। এর কারণ কি?

জবাবঃ মাইয়্যেতকে দাফন করার পর দোয়া করার কথা হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু চল্লিশ কদম পিছিয়ে এসে দোয়া করতে হবে এমন কিছু আমার জানা নেই।[১]

২৭১. তাফসীর সংক্রান্ত একটি অভিযোগের জবাব

প্রশ্নঃ ১৯৬৭ সালের ১৯ নভেম্বর এশিয়া পত্রিকায় সূরা তাহরীমের যে তাফসীর আপনি করেছেন, সে সম্পর্কে একদল লোক বারবার অভিযোগ করে আসছে। তারা বলছে, 'আপনি হযরত আয়িশা এবং হযরত হাফসাকে (রাঃ) রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সাথে বাড়াবাড়ি এবং বিতর্ক করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন। অনুগ্রহ করে এশিয়া পত্রিকার মাধ্যমে এ সম্পর্কে আপনার বিস্তারিত বক্তব্যজানাবেন।

জবাবঃ শ্রদ্ধেয়! আস্‌সালামু আলাইকুম।

আপনার পত্র পেয়েছি। যে আয়াতের তাফসীর প্রসংগে আমি ঐ কথাগুলো বলেছিলাম, সে আয়াতটি নিম্নরূপঃ

اِنْ تَتُوبَآ اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ج وَاِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰهُ

---

[১] মাসিক তাজাল্লি দেওবন্দ ১৯৬২ ইং। সাপ্তাহিক এশিয়া লাহোর সূত্রে প্রাপ্ত।

وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ج وَالْمَلٰئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ ـ

শাহ রফীউদ্দীন সাহেব তাঁর তাফসীরে আয়াতটির তরজমা এরূপ করেছেনঃ

"তোমরা দু'জন যদি আল্লাহর দিকে তাওবা (প্রত্যাবর্তন) করো। কারণ তোমাদের অন্তর বক্র হয়ে গেছে। আর এরই (বক্রতার) উপর যদি তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা করো, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর দোস্ত এবং জিব্রাঈল এবং সালেহ মুসলমানরা। আর এরপর ফেরেশতারা তাঁর সাহায্যকারী।'

শাহ ওলীউল্লাহ দেহলবী আয়াতটির নিম্নরূপ তাফসীর করেছেনঃ

"হে পয়গম্বরের দু'জন স্ত্রী, তোমরা যদি তোমাদের মন্দ কাজ থেকে খোদার দিকে প্রত্যাবর্তন করো, ভাল করবে। কারণ তোমাদের দিল বক্র হয়ে গেছে। আর তোমরা যদি পয়গম্বরকে কষ্ট দেয়ার জন্যে ঐক্যবদ্ধ হও তবে অবশ্যই আল্লাহ তাঁর পৃষ্ঠপোষক এবং জিব্রাঈল ও মুসলমানদের মধ্যে সৎলোকেরা। এ ছাড়াও ফেরেশতারা তাঁর সাহায্যকারী।"

মাওলানা শিব্বীর আহমদ সাহেব আয়াতটির ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ

"এখানে হযরত আয়িশা এবং হযরত হাফসাকে (রাঃ) সম্বোধন করে বলা হয়েছে, তোমরা যদি তাওবা করো তবে অবশ্যি তাওবার সুযোগ রয়েছে। কেননা, তোমাদের অন্তর সঠিকপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে একদিকে নুইয়ে পড়েছে। সুতরাং ভবিষ্যতে এরূপ অন্যায় এবং বেঠিক কাজ থেকে বিরত থাকো।"

সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তিনি আরো লিখেছেনঃ

"বিশেষ করে নারী যদি উচুঁ ঘরের হয়, তবে স্বভাবগতভাবে তারা তাদের নিজেদের বাপ, ভাই এবং বংশের কারণে গর্ব, অহংকার ও ঔদ্ধত্য দেখায়। তাই তাদের সর্তক করে বলে দেয়া হয়েছে, দেখ তোমরা দু'জনে যদি এধরণের আচরণ করতে থাকো, তবে তাতে পয়গম্বরের কোনো ক্ষতি

হবেনা। কারণ পর্যায়ক্রমে আল্লাহ ফেরেশতা এবং নেক্‌কার ঈমানদার লোকেরা যার সাথী ও সাহায্যকারী, তার বিরুদ্ধে কোনো মানবীয় ষড়যন্ত্র বা কূট কৌশল কামিয়াব হতে পারে না। অবশ্য তোমাদেরই ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশংকা রয়েছে।"

অতপর হাফিয ইবনে কাসীরের তাফসীর দেখুন। তিনি তাঁর তাফসীরে আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রসংগে মুসনাদে আহমদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী এবং নাসায়ীর সূত্রে যে হাদীস উল্লেখ করেছেন, তার তরজমা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

"আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেনঃ 'দীর্ঘদিন থেকে হযরত উমরের (রাঃ) নিকট একথা জিজ্ঞাসা করার খুব লোভ ছিল আমার যে, রাসূলুল্লাহর (সাঃ) ঐ দু'জন স্ত্রী কে ছিলেন, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেনঃ 'তোমরা দু'জন যদি খোদার দিকে তাওবা (প্রত্যাবর্তন) করো, কারণ নিশ্চয়ই তোমাদের অন্তর বক্র হয়ে গেছে......।'

অতপর হযরত উমর (রাঃ) একবার হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। পথিমধ্যে একস্থানে তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যান। ফিরে এলে আমি তাঁকে ওযূ করাচ্ছিলাম। এই সুবাদে জিজ্ঞেস করে বসলামঃ 'আমীরুল মুমিনীন! রাসূলুল্লাহর (সাঃ) ঐ দু'জন স্ত্রী কে ছিলেন? যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেনঃ 'তোমরা দু'জন যদি খোদার দিকে তাওবা (প্রত্যাবর্তন) করো, কারণ নিশ্চয়ই তোমাদের অন্তরবক্র হয়ে গেছে.......।' তিনি বললেনঃ 'আয়িশা এবং হাফসা (রাঃ)।' অতপর তিনি পুরো ঘটনাটি বলতে শুরু করলেন। বললেনঃ 'কুরাইশরা সব সময় স্ত্রীদেরকে দাবিয়ে রাখতো। হিজরত করে মদীনায় এলে আমরা দেখতে পেলাম, এখানকার লোকদের স্ত্রীরা তাদের উপর কর্তৃত্ব করছে। তাদের দেখাদেখি আমাদের স্ত্রীরাও সে আচরণ শিখতে থাকে। একদিন আমি আমার স্ত্রীর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে কিছু বললাম। কিন্তু উল্টো সে আমাকে দু'কথা শুনিয়ে দিলো। তার এ আচরণ আমার খুবই অপছন্দনীয় হলো। সে বললোঃ আপনার কথার পাল্টা জবাব দেয়া আপনি অসন্তুষ্ট হবেন কেন? আল্লাহর কসম রাসূলুল্লাহর (সাঃ) স্ত্রীরাও তাঁর কথার পাল্টা জবাব দেয়। তাঁদের কেউ কেউ তো তাঁর সাথে রাতদিন তর্কে লিপ্ত থাকে।' তার বক্তব্য শুনে আমি বেরিয়ে পড়লাম। হাফসার (রাঃ) ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি কি

রাসূলুল্লাহর (সাঃ) মুখের উপর কথা বলো? সে বললো, 'হ্যাঁ।' জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমাদের কেউ কি দিনভর রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সাথে তর্কে লিপ্ত থাকে?' সে বললো, হ্যাঁ।' আমি তাকে বললাম, তোমাদের যে-ই এমনটি করুকনা কেন সে সম্পূর্ণ ব্যর্থকাম হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হলে, তাঁর প্রতি যে আল্লাহর গযব নাযিল হবে এবং সে যে ধ্বংস হয়ে যাবে সেভয় কি তোমাদের নেই? কখনো রাসূলুল্লাহর (সাঃ) মুখের উপর কোনো কথা বলোনা এবং তাঁর কাছে কিছু চেয়োনা তুমি যা চাও আমার নিজের সম্পদ থেকে চেয়ে নাও।'

হযরত উমর (রাঃ) আরো বলেনঃ 'একজন আনসার আমার প্রতিবেশী ছিলেন। সে একদিন রাত এশার সময় আমার দরজায় এসে টোকাদিয়ে উচ্চস্বরে আমাকে ডাকে। আমি বাইরে এলে সে বললো, 'বিরাট ঘটনা ঘটে গেছে......। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দিয়েছেন।' আমি বললাম হাফসা (রাঃ) ব্যর্থ হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে। এমনটি ঘটবে বলে আমি আগে থেকেই আশংকা করছিলাম।"

আমি আল্লাহ তাআলার বাণীটি দু'জন খ্যাতনামা আলিম সেটির যে তরজমা করেছেন তা, এবং একজন বিখ্যাত আলিম সেটির যে ব্যাখ্যা করেছেন তা হুবহু উদ্ধৃত করে দিলাম। এ ছাড়াও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাসের (রাঃ) মুখে বর্ণিত এ সম্পর্কে হযরত উমরের (রাঃ) বক্তব্য শব্দে শব্দে উল্লেখ করে দিলাম। এখন এ সম্পর্কে যদি কারো অভিযোগ থাকে, তবে তার চিন্তা করে দেখা উচিত তার অভিযোগ কি আমার বিরুদ্ধে? না কি আল্লাহ এবং তাঁর কালামের যারা তাফসীর করেছেন সেইসব বুযুর্গের বিরুদ্ধে।

বিনীত

আবুল আলা মওদূদী।

২৭২. ভালমন্দের শক্তি

প্রশ্নঃ মাওলানা! ভালমন্দের শক্তি কি বাইরে থেকেই মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে, না কি মানুষের ভিতরেই তা বর্তমান থাকে?

জবাবঃ এ শক্তি মানুষের ভিতরেও বর্তমান থাকে এবং বাইরেও। মানুষের ভিতরে যদি এগুলোর শক্তি বর্তমান না থাকে, তাহলে বাইরের শক্তি কি করে তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে? মানুষের ভিতরে এসব শক্তি বর্তমান থাকলেই তো বাইরের শক্তিকে এরা RESPONSE করতে পারে।

২৭৩. শয়তানের প্রভাব

প্রশ্নঃ শয়তানের প্রভাব কিভাবে অনুভব করা যেতে পারে?

জবাবঃ মানুষ যখন তার ভিতরে মন্দ এবং অন্যায় কাজের প্ররোচনা অনুভব করবে, তখন বুঝতে হতে শয়তান তাকে মন্দের প্রতি উস্কানি দিচ্ছে। এরূপ অনুভব হওয়ার সাথে সাথে তার সতর্ক হয়ে যাওয়া উচিত।

২৭৪. রোগের পুরস্কার

প্রশ্নঃ মাওলানা! কোনো ব্যক্তি রোগের কারণে যে কষ্ট পায়, এর বিনিময়ে সে আল্লাহর কাছে কোনো পুরস্কার পাবে কি?

জবাবঃ হ্যাঁ। মুমিনের সাথে আল্লাহ তাআলা এরূপ অনুগ্রহ ও সহানুভূতির আচরণই করেন। এমন কি মুমিনের পায়ে কাঁটা ফুটলেও তার বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তার কোনো ত্রুটি ক্ষমা করে দেন।

২৭৫.ইমাম মালিকের মুয়াত্তা

প্রশ্নঃ হাদীসের গ্রন্থাবলীর মধ্যে মুয়াত্তায়ে ইমাম মালকের মর্যাদা কি?

জবাবঃ মুয়াত্তা যতোটা না হাদীস গ্রন্থ তার চাইতে বড় ফিকাহর গ্রন্থ।

২৭৬. তাকদীর

প্রশ্নঃ মাওলানা! কোনা কোনো হাদীস থেকে জানা যায়, মানুষের তাকদীর পূর্ব লিখিত। মানুষের মৃত্যু, গোটা জীবন এবং জীবনের সার্বিক অবস্থা পূর্বেই নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু আবার অপর কিছু হাদীসে বলা হয়েছেঃ 'তোমরা যদি দীর্ঘ জীবন এবং জীবিকার প্রাচুর্য চাও, তবে আত্মীয়দের সাথে

সুসম্পর্ক রাখো। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষের বয়স যদি লিখেই দেয়া হয়ে থাকে, তবে আত্মীয়দের সাথে ভাল ব্যবহার দ্বারা তা কি করে বৃদ্ধি হতে পারে?

জবাবঃ এই দুইটি কথাই সঠিক। কারণ মানুষের সম্পর্কে যা কিছু লেখা আছে, তার বিবরণ তো আপনার জানা নেই। যা কিছু লেখা আছে, তার মধ্যে তো এটাও লেখা থাকতে পারে যে, যারা রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক রাখবে তাদের বয়স বাড়িয়ে দেয়া হবে এবং জীবিকায় প্রাচুর্য দেয়া হবে। কিন্তু কী যে লেখা আছে তা যেহেতু কারো জানা নেই, তাই আপনি একথা বলতে পারেননা যে, বয়স এবং জীবিকা তো নির্ধারিতই রয়েছে সুতরাং আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক রেখে লাভ কি?

২৭৭. আল্লাহর সুন্নাত

প্রশ্নঃ মাওলানা! কুরআনে বলা হয়েছে, 'আল্লাহর সুন্নাত কখনো পরিবর্তন হয়না।'

একথার অর্থ যদি এই হয় যে, আল্লাহর আইন কখনো পরিবর্তন হয়না এবং তাঁর আইনে কোনো EXCEPTION নেই। যেমন আগুনের ধর্ম যেহেতু জ্বালিয়ে দেয়া তাই সে প্রত্যেককে জ্বালিয়ে দেয়। কিন্তু আমরা কখনো কখনো দেখি এমনটি হয়না। হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) ঘটনা এর প্রমাণ। অন্যান্য মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনাও এর উদাহরণ। মু'জিযা বা অলৌকিকতা এ আয়াতটির বিপক্ষে যায়না কি?

জবাবঃ আসলে CONTEXT থেকে কথাকে পৃথক করে তার তাৎপর্য খোঁজার চেষ্টা করা ঠিক নয়। উল্লেখিত আয়াতে যা কিছু বলা হয়েছে তা হলো, 'যে জাতি আল্লাহর নবীকে চূড়ান্তভাবে (FINALLY) অস্বীকার করে, আল্লাহ তাআলা সেই জাতিকে অবশ্যি ধ্বংস করে দেন। এখন এই বিশেষ কথাটি থেকে পৃথক করে আয়াতটির অর্থ খোঁজার চেষ্টা করা হলে তাতে বিকৃতি ঘটবে।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আল্লাহর সুন্নত কি আর কি নয়, তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউই নিরূপন করতে পারেনা। আপনি কি করে এটা আল্লাহর ফায়সালা বলে জানতে পারলেন যে, আগুন সব সময় এবং সর্বত্র কেবল জ্বালিয়ে দেয়ারই কাজ করে। আল্লাহর সীমাহীন সৃষ্টি জগতের একটি ক্ষুদ্র অংশ হচ্ছে এই পৃথিবী। এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছন, আগুন জ্বালানোর কাজ করছে। এটা দেখেই

আপনি সিদ্ধান্ত নিলেন আগুন কেবল জ্বালিয়ে দেয় এবং এই জ্বালানোর কাজে কোনো EXCEPTION নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আগুনের জ্বালানোটাই আল্লাহর বিধান একথা আপনি কোন্ সূত্রে জানতে পারলেন?

প্রশ্নকর্তাঃ আগুনের জ্বালানোটা একটা প্রাকৃতিক বিধান (PHYSICAL LAW)।

মাওলানার জবাবঃ বিরাট সৃষ্টি জগতের সীমাহীন নিগূঢ় তত্ত্বসমূহের তুলনায় আপনার এই 'ফিজিক্যাল ল'র গুরুত্ব ঠিক ততোটুক, মহাসমুদ্রের তুলনায় কয়েক ফোঁটা পানির গুরুত্ব যতোটুকু। যেসব তত্ত্ব আপনারা অবগত হয়েছেন, সেগুলোকে আপনারা 'ফিজিক্যাল ল' আখ্যায়িত করছেন। কিন্তু এসব তত্ত্ব যতোদিন আপনাদের জানা ছিলনা, ততোদিন আপনাদের সেই 'ফিজিক্যাল' ল'রও কোনো গুরুত্ব ছিলোনা। এমন বহু জিনিস আছে যা আগে মানুষ জানতোনা। তখন সেগুলো 'ফিজিক্যাল ল'ও ছিলোনা। একশ' বছর আগে যদি কেউ বলতো এমন একটি যানবাহন আছে যা আকাশে উড়তে পারে। তখন একথা শুনলে লোকেরা বলতো, তুমি রসিকতা করছো। কারণ তখন পর্যন্ত এটা তাদের নিকট জানা তত্ত্বসমূহ অনুযায়ী 'ফিজিক্যাল ল'র বিপরীত কথা ছিলো। তখন তাদের নিকট 'ফিজিক্যাল ল' ছিলো এটা যে, যে জিনিস বাতাসের চাইতে ভারী তা বাতাসের জগতে অবস্থান করতে পারেনা। কিন্তু এখন সেই ধারণার বিপরীত তত্ত্ব যখন মানুষ জানতে পারলো, তখন সেটাই 'ফিজিক্যাল ল' হয়ে গেল। একথাটি ভালভাবে বুঝে নেয়া দরকার, যিনি মালিক এবং সম্রাট তিনি যদি কোনো নিয়ম বিধিবদ্ধ করে দেন অতপর তা পরিবর্তন করার কোনো ক্ষমতা না রাখেন, তবে তো এটা তার সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হবার যে ধারণা, তারই বিপরীত হয়ে যায়।[১]

২৭৮. ভালমন্দের প্রবণতা

প্রশ্নঃ মাওলানা! আল্লাহ তাআলার প্রেরিত নবীগণের অবিচ্ছিন্ন শিক্ষা দীক্ষা সত্ত্বেও গোটা মানব ইতিহাসে ঐসব লোকদেরই প্রাধান্য ছিলো, যারা হয়তো সত্য পথকে গ্রহণ করেনি, নয়তো দ্রুত সত্যপথ থেকে বিপথগামী হয়েছে। এমনটি হবার কারণ কি? এথেকে কি একথা অনুমান করা যায়না যে,

---

১. আইন ২৮ জুলাই ১৯৬৮।

প্রকৃতিগতভাবে মানুষ ভাল ও ন্যায়ের পরিবর্তে মন্দ ও অন্যায়ের প্রতি অধিক প্রবণতা রাখে?

জবাবঃ প্রকৃতিগতভাবে মানুষ নেকীর চাইতে বদির দিকে অধিক প্রবণতা রাখে আপনার একথা ঠিক নয়। একইভাবে এই ধারণা করাও ঠিক নয়, সত্যপথ যারা গ্রহণ করেনি তাদর সংখ্যাধিক্য হওয়াটা প্রকৃতিগতভাবে মানুষের মন্দ হবার প্রমাণ।

প্রকৃতপক্ষে, মানুষের ভেতরে এবং বাইরে ভালমন্দের শক্তি সমভাবে বিদ্যমান। মানুষের ভেতরে ভালমন্দ উভয়টির প্রভাবই গ্রহণ করার যোগ্যতা দেয়া হয়েছে। অতপর অহী এবং রিসালাতের মাধ্যমে ভালপথ অবলম্বন করলে কি ফায়দা হবে আর মন্দপথ অবলম্বন করলে কি পরিণতি ভোগ করতে হবে তা তাকে পরিষ্কার করে বলে দেয়া হয়েছে। একদিকে তাকে ন্যায় অন্যায় ও ভাল মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার যোগ্যতা দান করা হয়েছে। অপরদিকে এগুলোর যেকোনোটি গ্রহণ করার স্বাধীনতা (FREEDOM OF CHOICE) তাকে দেয়া হয়েছে, যাতে করে সে তার বিচার শক্তি দ্বারা যেপথ ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারে এবং যেপথ ইচ্ছা ত্যাগ করতে পারে। কুরআনের বিভিন্নস্থানে একথাটি বলা হয়েছে। ।একস্থানে বলা হয়েছে "আমরা মানুষকে ভাল মন্দ উভয় পথই বাতলে দিয়েছি।" [১]

অন্যত্র বলা হয়েছে, "আল্লাহ মানবাত্মার মধ্যে ফুজূর এবং তাকওয়া ইলহাম করে দিয়েছেন।" [২]

এভাবে অন্য একস্তানে বলা হয়েছে, "অতপর যার ইচ্ছা সে ঈমান গ্রহণ করবে এবং যার ইচ্ছা কুফরী অবলম্বন করবে।" [৩]

সুতরাং ভালমন্দ উভয় শক্তিই মানুষের ভেতর সমভাবে বিদ্যমান। মানুষ এদুটির যে কোনোটি গ্রহণ করার ব্যাপারে স্বাধীন। এখন এটা মানুষের জন্যে বড়ই দূর্ভাগ্য যে, সে তার স্বাধীনতাকে সঠিক পথে ব্যবহৃত করার পরিবর্তে

---

১. আল বালাদ, আয়াত ১০।

২. সূরা শামস আয়াত ৮।

৩. সূরা আল কাহাফ আয়াত ২৯।

সাধারনভাবে ভ্রান্ত পথে ব্যবহার করার প্রবণতা দেখাচ্ছে। আর এর ফলে নিজের জন্যে অশুভ পরিণতি নির্ধারিত করছে। কিন্তু নিজের স্বাধীনতাকে ভ্রান্ত পথে ব্যবহার করার জন্যে সর্বাবস্থায় সে নিজেই দায়ী। কারণ কোনো বহিঃশক্তি তাকে একাজে বাধ্য করতে পারেনা। শয়তান তো কেবল তাকে উস্কানী দেয়, বাধ্য করার ক্ষমতা রাখেনা।

এছাড়াও একজন লোক যখন ভ্রান্ত পথে পা বাড়ায়, তখন তার বিবেক তাকে নাড়া দেয়, দংশন করে। বিবেকের আওয়ায শুনে সে যদি থেমে যায় তবে সে বেঁচে গেল। কিন্তু বিবেকের ডাকে যদি সে সাড়া না দেয়, থমকে না দাঁড়ায়, তবে বিবেক দমে যায়, পরাজিত হয়ে পড়ে। আর সে নির্বিঘ্নে ভ্রান্তপথে অগ্রসর হয়ে চলে। পৃথিবীতে মানুষের পরীক্ষাই তো এটা যে, সে হয়তো নিজের বিবেক ও বিচার বুদ্ধি এবং ইচ্ছা ও স্বাধীনতাকে অভ্রান্ত পথে ব্যবহার করে স্বীয় স্রষ্টার সন্তোষ লাভ করে, নয়তো ভ্রান্ত পথে ব্যবহার করে তাঁর কোপানলে নিমজ্জিত হয়। এপৃথিবী মূলত একটা পরীক্ষাগার। বুঝ জ্ঞান হবার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের বিভিন্ন কর্মকান্ড মানুষের জন্যে সেই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র। স্বীয় আমল দ্বারা মানুষ তার জবাব দিয়ে থাকে। এই উত্তরমালার উপরই তার সফলতা কিংবা ব্যর্থতা নির্ভর করে। এখন কোনো ব্যক্তি যদি এই পরীক্ষার ব্যাপারে সিরিয়াসই না হয়, কিংবা অধিকাংশ প্রশ্নের জবাবই না দেয়, অথবা সঠিক জবাবের পরিবর্তে ভুল জবাব লিখে দেয় তবে তার সাফল্যের কোনো প্রশ্নই উঠেনা। পরীক্ষা পরীক্ষাই আর মানুষের জীবন এক কঠিন পরীক্ষা। এতে সাফল্য অর্জনকারীদের সংখ্যা কমই হয়ে থাকে।

২৭৯. মানুষের পরীক্ষা

প্রশ্নঃ প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষকে কেন এই পরীক্ষায় ফেলা হলো? আর তাতে সাফল্য লাভ করার জন্যে এতো কড়া শর্তই বা কেন আরোপ করা হলো?

জবাবঃ 'মানুষকে কেন পরীক্ষায় ফেলা হলো?' আসলে এ প্রশ্ন উত্থাপনের কোনো সুযোগ নেই। কারণ এটা একটা বাস্তব ও অনিবার্য ব্যাপার। কারো চাওয়া না চাওয়াতে এর মধ্যে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি হবার অবকাশ নেই। আমাদেরকে পরীক্ষায় কেন ফেলা হলো, এটা আসল প্রশ্ন নয়। বরং আসল জিজ্ঞাসা হলো, এ অনিবার্য পরীক্ষায় কামিয়াব হবার পথ কি? কারণ স্রষ্টাকে নয় বরং সৃষ্টিকেই জিজ্ঞাসা করা হবে। আর স্রষ্টার সম্মুখে সৃষ্টির এমন কোনো মর্যাদা নেই যে, সে

তাঁকে জিজ্ঞেস করতে পারে। আমরাই জিজ্ঞাসিত হবো, আল্লাহ তাআলা ননঃ "তিনি যা কিছু করেন সেসম্পর্কে প্রশ্ন করা যেতে পারে না। অবশ্য মানুষকে তাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।" ১.

আপনার প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ হলো, 'এই পরীক্ষায় কামিয়াব হবার জন্যে এতো কড়া শর্ত কেন আরোপ করা হলো? আসলে আল্লাহ তাআলার জান্নাত এমন কোনো মামুলি জিনিস নয় যে, পায়চারী করতে করতে অনায়াসে আপনি তাতে ঢুকে পড়বেন। এটা হচ্ছে আল্লাহ তাআলার এক মহান অনুগ্রহ। কঠিন পরীক্ষার পথ অতিক্রম করা ছাড়া আপনি কেমন করে তার অধিকারী হতে পারেন?

২৮০. ক্বলবে সলীম

প্রশ্নঃ কুরআন মজীদে সূরা শোয়ারায় বলা হয়েছেঃ "সেদিন অর্থসম্পদ এবং সন্তানাদি কোনো উপকারে আসবেনা, তবে সেই ব্যক্তি (উপযুক্ত সাব্যস্ত হবে) যে ক্বলবে সলীম নিয়ে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে।"২ এখানে ক্বলবে সলীমের অর্থ কি?

জবাবঃ 'সলীম' অর্থ আপদ থেকে সুরক্ষিত। 'ক্বলবে সলীম' অর্থ সে আত্মা, যা আত্মার আপদ থেকে সুরক্ষিত, যে আপদ আত্মার উপর আপতিত হয়। যেমন, শিরক, আল্লাহ তাআলা থেকে গাফিল হয়ে যাওয়া এবং গায়রুল্লাহকে ভালবাসা ইত্যাদি।

প্রশ্নঃ অর্থ সম্পদ এবং সন্তানাদির মহববত কি আত্মার আপদ?

জবাবঃ অর্থ সম্পদ এবং সন্তানাদির মহববত যদি ব্যক্তিকে আল্লাহর মহববত থেকে গাফিল করে দেয়, কিংবা তার নাফরমানীর দিকে নিয়ে যায়, তা হলে অবশ্যি এরূপ মহববত আত্মার আপদ। কিন্তু এরূপ মহববত যদি স্বীয় স্বভাব প্রকৃতির মধ্যে অবস্থান করে, তবে তা আত্মার আপদ নয়। বরং তা প্রকৃতির উপযোগী।

---

১. সূরা আম্বিয়াঃ আয়াত ২২।

২. সূরা শোয়ারাঃ আয়াত ৮৯।

আসলে আয়াতটির তরজমা দু'ভাবে করা যেতে পারেঃ

যেমন (ক) "এটা হবে সেইদিন যেদিন অর্থ সম্পদ এবং সন্তানাদি কোনো উপকার দেবেনা, তবে ঐ ব্যক্তিকে, যে কলবে সলীম নিয়ে হাযির হবে।"

(খ) "সেদিন অর্থ সম্পদ এবং সন্তানাদি কিছুমাত্র উপকৃত করবেনা। সেদিন যদি কোনো জিনিস কল্যাণকর হয়, তবে তা হবে 'কলবে সলীম।'

অর্থাৎ প্রকৃত উপকারী ও কল্যাণকর জিনিস হচ্ছে, 'কলবে সলীম।' এটাই যদি না হয় তবে সেদিন কোনো জিনিসই উপকারে আসবেনা। অর্থ সম্পদও নয়, সন্তানাদিও নয়। কিন্তু কেউ যদি 'কলবে সলীমের' অধিকারী হয়, তবে তার অর্থ সম্পদ উপকারে আসতে পারে এবং সন্তান সন্ততিও। কেউ যদি 'কলবে সলীমের' অধিকারী হয়ে আল্লাহর পথে অর্থ সম্পদ ব্যয় করে তবে এর দ্বারা কিয়ামতের দিন সে অবশ্যি উপকারী হবে। এভাবে সে যদি সন্তানদেরকে সুশিক্ষাদান করে থাকে এবং নেকপথে চালিয়ে থাকে তবে তারা দুনিয়াতেও তার উত্তম উত্তরাধীকারী হবে আর পরকালেও সর্বোত্তম সম্পদ হবে।

প্রশ্নঃ 'কলবে সলীম' দ্বারা কি আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ মহববত বুঝায়?

জবাবঃ না তা নয়। 'কলবে সলীম' হবার জন্যে যদি পরিপূর্ণ মহববত শর্ত হতো, তবে আমাদের আপনাদের ক্ষমা পাবার তো কোনো সুযোগই ছিলোনা। কেবল নবীই (সাঃ) এবং আল্লাহর মনোনীত সালেহ বান্দারা ছাড়া কিয়ামতের দিন এই মানদন্ডে সম্ভবত আর কেউ অকৃত্রিম হতে পারতোনা। তাই 'কলবে সলীম' অর্থ কেবল সেই 'কলব' যা আত্মার আপদ থেকে নিরাপদ।

তবে একথা স্পষ্ট যে, এরূপ আত্মা অবশ্যি গায়রুল্লাহর মহববত থেকে পবিত্র হবে। আর যার অন্তরে যতো বেশী আল্লাহর মহববত হবে তার জীবন হবে ততো বেশী আদর্শিক এবং আল্লাহর নিকটও হবে সে ততো বেশী প্রিয়।[১]

১. আইন ৩১ মার্চ ১৯৬৯।

শতাব্দী প্রকাশনী

৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৮৩১৭৪১০, ০১৭৫৩৪২২২৯৬
E-mail: shotabdipro@yahoo.com